কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চতুর্থ খণ্ড

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৬০

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

পি. কে. পাল

শ্রীসারদা প্রেস

৬৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

ভূমিকা

কিরীটীর জন্মের বহু পূর্বে তার জন্মদাতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল 'চোখের জলে'। কাব্য-কাব্য শোনালেও কথাটা সত্য। আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, প্রসঙ্গসূত্রে নীহারবাবুই সেদিন মনে করিয়ে দিলেন। বছর চল্লিশেক আগে একবার 'বার্ষিক শিশু-সাথী'র সম্পাদনার ভার পড়েছিল আমার হাতে। অনেক খ্যাতনামা লেখকের লেখা বেরিয়েছিল সেদিনকার এই শারদীয়া কিশোর পত্রিকায়, অচেনা অজানা লেখকের লেখাও কিছু কিছু ছিল। যৌবনের উৎসাহবশে গল্প কবিতা প্রবন্ধ যতগুলি এসেছিল সব নিজে পড়ে বাছাই করেছিলাম, লেখকের নাম বা মুখ দেখে নয় রচনার গুণ বিচার করে। 'চোখের জল' গল্পটি যে কিশোর বয়সী একটি ছাত্রের রচনা তা নির্বাচনের সময়ে নয়, পরে জেনেছিলাম।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত নামক মেডিকেল কলেজের প্রথম না দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সেই ছাত্রটিকে কে চিনত? কিন্তু আজ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত। জনপ্রিয়তার দিক থেকে কোনও সমকালীন ঔপন্যাসিক তাঁকে অতিক্রম করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

বন্ধুবরের অনুরোধ তাঁর 'কিরীটী অমনিবাসে'র একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে। তিনি আমাকে অগ্রজতুল্য ভালবাসেন, তাই না বলতে পারিনি। কিন্তু এ কথাও তাঁকে বলেছি, তাঁর রচনাবলীর পক্ষে অন্য কারও ভূমিকা নিতান্তই অবান্তর ও অর্থহীন। বাংলা সাহিত্যের একটি অনতিপুষ্ট লেখাকে তিনি বিচিত্র পুষ্পপল্লবে সাজিয়েছেন। পাঠক তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যশোলাভ করেছেন জনসমাজের কাছে। তাঁর গ্রন্থের পক্ষে সেই কারণে ভূমিকা মাত্রকেই বাহুল্য মনে করি। তা ছাড়া আরও একটি কথা বলি। ভূমিকা অনেক সময় পৃষ্ঠপোষণের রূপ ধরে। তাতে কি গ্রন্থ কি গ্রন্থকার কারও মান বাড়ে না।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত পেশায় ডাক্তার, সাহিত্য তাঁর নেশা, ইংরেজীতে যাকে বলে hobby। ডাক্তার হিসেবে তিনি কত বড় তা জানার প্রয়োজন আমার হয় নি, সে বিচারের যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু পেশার ক্ষেত্রে তিনি যে অপরিমেয় কীর্তি অর্জন করেছেন সে বিষয়ে কারও মনে সংশয় থাকবার কথা নয়। লোকমুখে শুনেছি প্রকাশকরা নাকি কোনও গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর বাড়িতে এলে আগে একটি গিনি নজরানা স্বরূপ তাঁর সামনে রাখেন তারপর তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এতটা সত্য কিনা জানি না। কিন্তু এই জনপ্রবাদ থেকে লেখকের জনপ্রিয়তার মাত্রাটা সহজেই নিরূপণ করা যায়। সরকারী ও বেসরকারী নানা গোষ্ঠীর অনতিপ্রচ্ছন্ন কৃপা এবং অতিপ্রকট বিজ্ঞাপন-মিশ্রিত

যে সকল সাহিত্য-পুরস্কার একালে বিতরিত হয়ে থাকে, পাঠকের হাত থেকে পাওয়া এই স্বর্ণকিরীটের কাছে তাদের মহিমা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। রসিক ব্যক্তিরা সাহিত্যিক সাফল্যের একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন, ঈর্ষান্বিত সমব্যবসায়ী বন্ধুর সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে পাঠকের কাছে লেখকের জনপ্রিয়তা সেই অনুপাতে বাড়ছে বলে বুঝে নিতে হবে। নীহারবাবুর বন্ধুভাগ্য কেমন সেকথা জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বিব্রত করব না।

গোয়েন্দা কাহিনী সম্বন্ধে উন্নাসিকতার দিন গিয়েছে। বিদেশী সাহিত্যে তার প্রমাণ নিত্য পাচ্ছি। শক্তিমান লেখকের হাতে রহস্য-রোমাঞ্চও উচ্চকোটির সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ হতে পারে নীহারবাবুর রচনায় তার অবিরল পরিচয় পাই। 'বৌরাণীর বিল' গ্রন্থ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি।

"সবিতা সকলের নিকট হতে দূরে এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল। পূব আকাশকে রাঙা করে সূর্যোদয় হচ্ছে। দিগন্তপ্রসারী বৌরাণীর বিলের জলে কে যেন মুঠো মুঠো রাঙা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। চৌধুরী বংশের সমস্ত পাপ ক্ষালিত করে সর্বপাপঘ্ন দিবাকর যেন উদয়াচল থেকে শান্তির মন্ত্র আকাশের মাটিতে জলে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছেন দিক হতে দিগন্তে।

সবিতার দু চোখের কোলে জল।

মৃত পিতাকে স্মরণ করে দুটি হাত একত্র করে সে প্রণাম জানায়: তার পিতার আত্মা যেন শান্তি পায়। হে সর্বপাপঘ্ন সবিতা—সবিতাকেও ক্ষমা কর।"

'বৌরাণীর বিল' প্রথম খণ্ড, কি. অ.

অনুরূপ আর একটি প্রশান্ত সুন্দর চিত্র বর্তমান খণ্ডেই পাবেন। ৫৬ পৃষ্ঠায়।—

"প্রত্যূষের প্রসন্ন আলোয় সমস্ত অন্তর জুড়ে তার তখন যেন ভৈরো রাগের রঙ লেগেছে। জেগেছে সুর।

মেঝেতে বিস্তৃত পুরু গালিচার একপাশে রক্ষিত নিজের তানপুরাটা টেনে নিয়ে কোলের কাছে মেঝেতে গালিচার ওপরই বসে মুন্না বাঈজী।

তানপুরার তারে মৃদুমন্দ অঙ্গুলি চালনা করতে করতে সে গুনগুনিয়ে ওঠে—

ধন ধন সুরত কৃষ্ণ মুরারে
সুলছানা গিরিধারী
সব সুন্দর লাগে
অত পিয়ারী।"

নীহারবাবুকে আগে গোয়েন্দা কাহিনী লেখক পরে সাহিত্যিক বলে যাঁরা ভাবেন তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেন। তিনি মূলতঃ সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্য-বোদ্ধা।

আমরা ভুলে যাই যে গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়াও তিনি অনেক গল্প উপন্যাস নাটক লিখেছেন। সে-সব গ্রন্থ সমাদৃত হয়েছে। তাঁর উল্কা নামক নাটকটি শতাধিক রাত্রি ধরে অভিনীত হয়েছিল, সেকথা অনেকেরই মনে থাকে না।

জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নাটক অভিনয়ের সূত্রে স্টেজের এবং সাজঘরের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল, 'সুভদ্রা হরণে' তার সুন্দর পরিচয় পাই। হরিদাস সামন্তের সাজপোশাক পরা অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে এবং সে-মৃত্যুও এই সাজঘরে। গল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই 'নাটকীয়'। নামটির নির্বাচনও বিষয়োপযোগী। এই সামঞ্জস্য বিধানের কৃতিত্বই কাহিনীটিকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে পটভূমি মিলে গেছে অঙ্গাঙ্গী ভাবে।

'তাতল সৈকতে'র অবিনাশবাবুর চরিত্র-চিত্রণেও লেখক নাটকের সাহায্য নিয়েছেন। বাংলা নাটকের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তার অনেক সাক্ষ্য এখানে মিলবে :—

"অবিনাশ পায়চারি করছেন আর মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন—

নির্মম নিয়তি। অন্তিম সময়ে
একি মহা বিস্মরণ! গুরুদেব!
গুরুদেব!—ক্ষমা কর। ক্ষমা
কর প্রভু। অস্ত্র আবাহন মন্ত্র
দাও প্রভু ফিরাইয়া মোরে।
... ...
অভিশাপ—বুঝলি মা এ সুরমার অভিশাপ!
সতী নারী দেছে অভিশাপ!" ইত্যাদি

তাতল সৈকতে, পৃঃ ৯৬

অভিনেতা রূপে দেখানোর জন্যে তাঁর মুখ দিয়ে আমাদের অতি পরিচিত নাটকের কথাগুলি বারংবার শোনানোর তাৎপর্যটি লক্ষণীয়।

গোয়েন্দা উপন্যাসে অল্প জায়গায় অনেকগুলি চরিত্রের ভিড় হয়, গল্পের প্রয়োজনেই হয়। কে কখন কোথায় গেল কি করল কি বলল তা পাঠকের মনে রাখা কঠিন। অনেক লেখক পাঠকের স্মৃতিকে সাহায্য করেন চরিত্রের নামগুলির মধ্যে বিশেষত্ব আরোপ করে। 'তাতল সৈকতে' গ্রন্থে মহাভারতের দুঃশাসন দুর্যোধন শকুনি গান্ধারী ইত্যাদি নামগুলির প্রয়োগ যে নিরর্থক নয় বুদ্ধিমান পাঠক সেটা বুঝতে পারবেন।

লেখক নীহার গুপ্ত সম্বন্ধে একটা অভিযোগ—তিনি যাঁর ..ছে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছেন তাঁর নাম একবারও উল্লেখ করেন নি। অথচ এই ব্যক্তিটি অলক্ষ্যে থেকে তাঁর নানা গ্রন্থ অধ্যয়নলব্ধ বিদ্যা, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি এবং দেশবিদেশ পরিভ্রমণের

ফলস্বরূপ অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে আছেন। তাঁর নাম ডাক্তার এন. আর. গুপ্ত। কিরীটীর রংটা দিয়ে তাঁকে ঠিক চেনা যাবে না। কিন্তু কিরীটীর মুখে এবং চরিত্রে ডাক্তার গুপ্তের আদলটা তাঁদের চোখে সহজেই ধরা পড়বে যাঁরা উভয়কে অন্তরঙ্গ ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

(ভূমিকা)	শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য	৵৹
তাম্রল সৈকতে		১
বনমরালী		১২৫
সুভদ্রা হরণ		২৩৯
বিদ্যুৎ-বহ্নি		৩২৯

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

তাতল সৈকতে

এক

মানুষের জীবনে এমন এক একটা ঘটনা দৈবাৎ ঘটে যায় যা একটা দুঃস্বপ্নের মতই যেন বাকি জীবনে কখনই সে ভুলতে পারে না। ডাঃ সমর সেনও তার জীবনের এক মধ্যরাত্রির অনুরূপ একটি ঘটনা আজ পর্যন্ত ভুলতে তো পারেইনি, এমন কি আজও যেন মধ্যে মধ্যে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে তার মনের মধ্যে অদ্ভুত এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। মধ্যে মধ্যে আজও নিদ্রার ঘোরে যেন ডাঃ সমর সেনকে সেই দুঃস্বপ্নটা আতঙ্কিত করে তোলে।

মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে যেন কে তার দিকে চেয়ে আছে।

পলকহীন, স্থির নিষ্কম্প, বিভীষিকাময় দুই চক্ষুর কঠিন মৌন দৃষ্টি যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে। এ দৃষ্টি যেন এ জগতের নয়, কোন প্রেতলোকের বায়বীয় দেহের।

হাড় জাগানো বলিরেখাঙ্কিত মুখ: ফ্যাকাশে রক্তহীন লোল চর্ম। বিস্রস্ত কাঁচাপাকা চুলগুলি বলিরেখাঙ্কিত কপালের উপরে নেমে এসেছে।

আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই লোকটির বক্ষে সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে একখানি কালো বাঁটওয়ালা ছোরা।

ডাঃ সমর সেনের ঘুমটা আজও আবার ভেঙে গেল।

নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রি। ঘরের মধ্যে ও বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। নিশ্ছিদ্র জমাট কালো কালির মত নিবিড় অন্ধকার।

তারপরই ডাঃ সমর সেন স্পষ্ট শুনতে পায় বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত করতে করতে কে যেন মৃদু কণ্ঠে ডাকছে, ডাক্তার সাব্, ডাক্তার সাব্—

কে?

সে রাত্রেও ঠিক অমনি শয়নঘরের বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট করাঘাতের শব্দে আচমকা ডাক্তারের ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল।

একটা জটিল অপারেশনের ব্যাপারে সমস্তটা দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত থেকে পরিশ্রান্ত ডাক্তার তাড়াতাড়িই গিয়ে শয্যা গ্রহণ করেছিল এবং ঘুমিয়েও পড়েছিল।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ ও সেই সঙ্গে কে যেন ডাকছে, সাব্, ডাক্তার সাব্—

একটা বিশ্রী অস্বস্তির সঙ্গে ডাঃ সেন শয্যার উপর উঠে বসে, কে?

সাব্ আমি শিবু। একটা জরুরী কল এসেছে।

কল! এত রাত্রে জরুরী কল!

একান্ত বিরক্তচিত্তেই ডাঃ সেন শয্যা থেকে মেঝের উপরে নেমে দাঁড়ায়। মাঘের শেষ,

তবে বিহার অঞ্চল বলেই শীতের প্রকোপটা যেন একটু বেশীই দাঁত বসায়। খাটের বাজু থেকে গরম ড্রেসিং গাউনটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপাতে চাপাতে বিরক্তির সঙ্গেই ঘরের দ্বার অর্গল-মুক্ত করে বাইরে এসে দাঁড়াল, কে? কোথা থেকে কল এসেছে?

একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছে সাহেব। আমি বাইরের ঘরে বসতে দিয়েছি।—বিনীত ভাবে ভৃত্য শিবদাস বলে।

শিবদাস ডাক্তারের কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।

ডাঃ সেন বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

একতলা বাংলো প্যাটার্নের ছোটখাটো বাড়িটা। সামনে ও পিছনের দিকে নাতি-প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দা অতিক্রম করে ডাক্তার ঘরের সামনে এসে ভারী পর্দাটা তুলে ভিতরে ঢুকল।

ঘরের অত্যুজ্জ্বল আলোয় ডাঃ সেন আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

গলাবন্ধ কালো রঙের একটা কোট গায়ে, মাথায় উলের মাঙ্কি ক্যাপ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে একটা সোফার উপর পা তুলে দিয়ে শীতে জবুথবু ভাবে বসে।

ডাঃ সেনের পদশব্দে লোকটি উঠে দাঁড়ায় : নমস্কার। আপনিই বোধ হয় ডাঃ সেন।

হ্যাঁ।

বলছিলাম কি, এখুনি আজ্ঞে, আপনাকে একটিবার শ্রীনিলয়ে যেতে হবে।

শ্রীনিলয়! কার বাড়ি? ভ্রূকুঞ্চিত করে ডাক্তার প্রশ্ন করে।

বলছিলাম কি সাত-সাতটা কোল মাইনসের প্রোপাইটার রায় বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরীর নাম শোনেননি আজ্ঞে?

না। শোনবার সৌভাগ্য হয়নি। একটু ব্যঙ্গভরেই যেন জবাবটা দেয় ডাঃ সেন। তা কেস্‌টা কি, কারই বা অসুখ?

বলছিলাম কি অধীন সামান্য তশীলদার। সংবাদ তো জানি না আজ্ঞে, তবে রায়-বাহাদুরেরই অসুখ—তিনিই আজ্ঞে রোগী।

হুঁ। এখান থেকে আপনার শ্রীনিলয় কতদূর?

তা মাইল দশেক পথ হবে।

ফিস্‌ কিন্তু আড়াই শো টাকা নেব।

তাই পাবেন। বলছিলাম কি একটু তাড়াতাড়ি করলে—

বসুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি।

ডাক্তার ঘর হতে বের হয়ে গেল।

লোকটিকে বাইরের ঘরে বসতে বলে শয়নঘরে ঢুকে বেশ বদলাতে বদলাতে ডাক্তার কলটির কথাই ভাবছিল।

সত্যি কথা বলতে কি ডাক্তার একটু যেন বিস্মিতই হয়। এ তল্লাটে আড়াই শো টাকা ফিস এক কথায় দিতে রাজী হয়! তাছাড়া ডাঃ সেন বৎসরখানেক হয় এখানে এসে প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করেছে, কিন্তু কই রায়বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরী বা শ্রীনিলয়ের নাম ইতিপূর্বে কখনও শুনেছে বলে তো মনে পড়ে না। তাই যেন কিছুটা কৌতূহল জাগে মনের মধ্যে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে ডাক্তার পুনরায় বসবার ঘরে ফিরে এসে বলে, চলুন।

আগে সেই বৃদ্ধ ও পশ্চাতে ডাঃ সেন তাকে অনুসরণ করে ওরা বাইরে এসে দাঁড়ায়। আকাশে স্বল্প জ্যোৎস্না পাতলা একটা কুয়াশার আবরণের তলায় যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে ডাক্তার দেখতে পায় গেটের অনতিদূরে কালো রঙের একখানা সুবৃহৎ প্যাকার্ড-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্তূপীকৃত একটা ছায়ার মতই।

বৃদ্ধই এগিয়ে গিয়ে গাড়ির সামনে উপবিষ্ট ড্রাইভারকে সম্বোধন করে বলে, রামনরেশ, দরজাটা খুলে দাও।

ডাক শুনেই ড্রাইভার নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিল।

উঠুন ডাক্তারবাবু।

আগে ডাক্তার ও পশ্চাতে বৃদ্ধ গাড়ির মধ্যে উঠে বসে অতঃপর।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে রামনরেশও গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

গাড়ি নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে মেটাল রোডের উপর পড়তেই স্পীড্ নেয় প্রায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি।

নিস্তব্ধ মৃদু কুয়াশা ঘেরা, স্বল্প চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রি।

মেটালে বাঁধানো মসৃণ উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ।

সুতীব্র হেড্‌লাইটের আলো ফেলে গাড়ি ছুটছে হু হু করে গন্তব্য পথে।

ডাক্তার পকেট থেকে চামড়ার সিগার কেসটা বের করে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগ করল।

জলন্ত সিগারে গোটা দুই টান দিয়ে পাশে উপবিষ্ট বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

বিলক্ষণ। শ্রীকুণ্ডলেশ্বর শর্মা। ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র শ্রেণী—কাশ্যপ গোত্র—

ভদ্রলোকের নামের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের পরিচয়টা পর্যন্ত পেয়ে ডাক্তার যে একটু বিস্মিত হয়নি তা নয়। তাই কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করেই থাকে। তারপর আবার প্রশ্ন করে, হুঁ, আচ্ছা কুণ্ডলেশ্বরবাবু, রায়বাহাদুরের অসুখটা কি কিছুই জানেন না আপনি?

বলছিলাম কি আজ্ঞে, জানিও বটে আবার জানি নাও বটে।

কুণ্ডলেশ্বরের কথায় ডাক্তার এবার যেন একটু বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং অন্তরের কৌতূহলটা চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করে, কি রকম? জানেন অথচ আবার

জানেনও না।

আজ্ঞে তাই।

হুঁ, তা কতদিন রায়বাহাদুরের ওখানে কাজ করছেন?

তা বিশ বৎসর। হ্যাঁ, তা বলছিলাম কি, তাই হবে বইকি।

ওঃ, তবে তো অনেক দিন আছেন। অনেক দিনকার পুরনো লোক আপনি।

তা তো বটেই। তবে বলছিলাম কি আজ্ঞে নিজে যখন যাচ্ছেন সবই তো আজ্ঞে স্বচক্ষে দেখবেন আর জানতেও পারবেন আজ্ঞে।

ডাঃ সেন বুঝতে পারে যে কোন কারণেই হোক কুণ্ডলেশ্বর রায়বাহাদুরের রোগের সংবাদটি তাকে দিতে ইচ্ছুক নয় আপাততঃ।

এরপর আর পীড়াপীড়ি করাটা শোভন দেখায় না, অতএব নিঃশব্দে সে ধূমপানই করতে থাকে।

ইউরোপ থেকে বহু কষ্টে নিজের চেষ্টায় এফ. আর. সি. এস. হয়ে এসে কলকাতা শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হয় ডাঃ সমর সেন নবীন উদ্যমে ও আশায়, কিন্তু দু বছর ধৈর্য ধরে থেকেও যখন প্র্যাকটিসের ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধাই করতে পারল না ডাঃ সমর সেন—এবং প্রায় উপবাসের সামিল—অর্থাৎ যে বস্তুটি হলে স্থূলভাবে এ জগতে বেঁচে থাকা চলে সেই অর্থের অনটনটা ক্রমশঃ এমন জটিল হয়ে উঠতে লাগল যে উপবাসও বটে সেই সঙ্গে অস্তিত্বটুকুও যাবার যোগাড় তখন বিলাতী খেতাবটা পকেটস্থ করে এক-প্রকার বাধ্য হয়েই মহানগরীর মায়া ত্যাগ করেছিল সে। তারপর কিছুদিন ধরে অনেক ভেবে সে কোন এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে হাজার দুই টাকা ধার করে বিহারের এই খনিপ্রধান অঞ্চলে এসে ডেরা বেঁধে প্র্যাকটিস্ শুরু করল।

এবারে বোধ হয় ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ছিলেন। বৎসরখানেকের মধ্যেই সুচিকিৎসক হিসাবে সমর সেনের নামটা আশপাশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এবং ইতিমধ্যে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে যত ধনী কোল মাইনসের প্রোপাইটার সকলের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত রায়বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরীর নাম তো সে শোনেনি।

বিচিত্র কৌতূহলকে কেন্দ্র করে সমরের মনের মধ্যে নানাবিধ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কুণ্ডলেশ্বর শর্মা নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে তার পাশেই বসে আছে।

অন্ধকারে আর একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকাল সমর কুণ্ডলেশ্বরের দিকে কিন্তু দেখা গেল না লোকটার মুখ।

ভদ্রলোকের নামটিও অদ্ভুত।

নিঃশব্দ গতিতে দামী গাড়ি মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে যেন হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে।

আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ।

একটানা গাড়ির ইঞ্জিনের একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ ও হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দের সংমিশ্রণ।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে তোলায় চোখের পাতায় ঘুম যেন তখনও জড়িয়ে আছে।

এবং গাড়ির দোলায় কখন একসময় বুঝি ঘুমিয়েও পড়েছিল সমর—হঠাৎ একটা মৃদু ঝাঁকুনি ও একটা দীর্ঘ বিশ্রী চিৎকারে তন্দ্রা ছুটে গেল।

উঃ! উঃ!

কুয়াশাচ্ছন্ন সামান্য যেটুকু চন্দ্রকিরণ প্রকৃতি জুড়ে এতক্ষণ স্বপ্নের মতই বিরাজ করছিল ইতিমধ্যে সেটুকুও যেন কখন নিভে গিয়েছে।

থমথমে অন্ধকারে বিশ্রী চিৎকারের শব্দটা যেন ভৌতিক এক বিভীষিকার মত রাত্রির অন্ধকারকে চিরে দিয়ে গেল।

সমর চমকে চোখ মেলে তাকায়। ড্রাইভার রামনরেশ ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে।

বলছিলাম কি আজ্ঞে শ্রীনিলয়ে এসে গেছি ডাক্তারবাবু—নামুন আজ্ঞে।

কুণ্ডলেশ্বরের কথায় সমর গাড়ি থেকে নামে।

পোর্টিকোর নীচে গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

সামনেই টানা দীর্ঘ বারান্দা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা।

স্বল্প-শক্তির একটা প্রজ্বলিত বৈদ্যুতিক বাতি পোর্টিকোর সিলিং থেকে ঝুলছে, তারই মৃদু আলোয় বারান্দার কিয়দংশ ও সম্মুখের পোর্টিকো আলো-আঁধারিতে যেন অদ্ভুত একটা রহস্যে নিবিড় হয়ে উঠেছে।

সমর গাড়ির ভেতর থেকে তার ডাক্তারী ব্যাগটা নামাতে যেতেই কুণ্ডলেশ্বর বাধা দিল, থাক। বলছিলাম কি আজ্ঞে কৈরালাপ্রসাদই নামিয়ে আনবে'খন। চলুন।

কুণ্ডলেশ্বরের ইঙ্গিতে সমর সিঁড়ি অতিক্রম করে বারান্দা-পথে অগ্রসর হয়।

আগে কুণ্ডলেশ্বর, পেছনে সমর।

দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করে কুণ্ডলেশ্বরকে অনুসরণ করে একসময় উভয়ে প্রকাণ্ড একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

দরজার গায়ে কলিং বেল টিপতেই অল্পক্ষণ পরে নিঃশব্দে বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত হল।

চলুন—

প্রকাণ্ড একটা হলঘর।

একটি মাত্র স্বল্প-শক্তির নীলাভ বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় ঘরটা স্বল্পালোকিত।

বারেকের জন্য চোখ তুলে সমর ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল।

ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে সমগ্র ঘরখানি যেন একেবারে ঠাসা, তবে রুচি বা শৃঙ্খলার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। মেঝেতে পুরু গালিচা বিস্তৃত : বড় বড় কারুকার্যমণ্ডিত মেহগনি কাঠের আলমারি গোটাচারেক। একপাশে খানপাঁচেক সোফা। একপাশে প্রকাণ্ড একটি শ্বেতপাথরের টেবিল—টেবিলের দুদিকে খান আষ্টেক চেয়ার।

এক কোণে একটি ট্যান করা বৃহৎ ব্যাঘ্রমূর্তি জিঘাংসায় ধারাল দন্ত বিকশিত করে আছে। কাচের চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে নীলাভ দ্যুতিতে।

দেওয়ালের সর্বত্র বড় বড় সব বিদেশী নরনারীর তৈলচিত্র।

বেশীর ভাগই ইংরাজ অধীশ্বর ও অধীশ্বরীদের।

এক কোণে সুবৃহৎ পাথরের স্ট্যাণ্ডে একটি সুদৃশ্য দামী জার্মান ক্লক দণ্ডায়মান।

ঐ সময় হঠাৎ ঢং ঢং করে রাত দুটো ঘোষণা করল ক্লকটা।

ক্লকের সঙ্কেতধ্বনি যেমন গম্ভীর তেমনি মিষ্টি।

ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিটা প্রায় মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত বামন আকৃতির এক নেপালী ভৃত্য ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করতেই কুণ্ডলেশ্বর তাকে সম্বোধন করে বলে, সিক্রিটারী বাবুকে সংবাদ দে কৈরালা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ডাক্তার সাব্‌কা উপরমে লে যানে কো হুকুম হায়, কৈরালা বলে।

ও, বলছিলাম কি তাহলে আজ্ঞে যান ওর সঙ্গেই। আমি আপনার ব্যাগটি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সহসা এমন সময় আবার সেই পূর্বের বিশ্রী চিৎকারটা রাত্রির অন্ধকারে শোনা গেল।

ও কিসের চিৎকার কুণ্ডলেশ্বরবাবু? সমর প্রশ্ন না করে আর পারে না।

আজ্ঞে, নাইট কীপার হুম্ সিং পাহারা দিচ্ছে। আচ্ছা তাহলে বলছিলাম কি আপনি যান—

নাইট কীপার?

হ্যাঁ নাইট কীপার হুম্ সিং সারারাত জেগে অমনি করে শ্রীনিলয় পাহারা দেয়।

চলিয়ে ডাক্তার সাব্—

কৈরালাপ্রসাদের ডাকে সমরের সম্বিৎ যেন আবার ফিরে আসে। আত্মগত চিন্তায় সে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

চল—

কৈরালাপ্রসাদকে অনুসরণ করে সমর।

হলঘরটি অতিক্রম করে উভয়ে আর একটি স্বল্পালোকিত দীর্ঘ লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এত বড় বারান্দায় কেবলমাত্র একটি সিলিং থেকে ঝুলন্ত স্বল্প-শক্তির বৈদ্যুতিক

বাতি জ্বলছে, সে আলোয় অন্ধকার তো দূরীভূত হয়ইনি বরং অন্ধকার আরও যেন ঘন ও রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সমরের কেমন বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। এত বড় জাঁকজমকপূর্ণ ধনীর প্রাসাদতুল্য বাড়ি অথচ আলোর ব্যবস্থা এত কম কেন!

আর আলোর ব্যবস্থায় অহেতুক এই কার্পণ্যই বা কেন! এর কারণই বা কি!

শুধু আলোর ব্যবস্থাই যে কম তাই নয়, সমস্ত বাড়িটা জুড়ে অদ্ভুত একটা স্তব্ধতাও যেন থম থম করছে।

মনে হয় যেন এ কারও কোন বাড়ি বা বাসস্থান নয়, কোলাহলমুখরিত নগরীর দূর প্রান্তে পরিত্যক্ত ভয়াবহ এক নিঃশব্দ বিরাট কোন এক কবরখানা।

রাত্রির অন্ধকারে সেখানে কালো বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে পড়ে নিঃসীম কালো শূন্যতা। অশরীরী প্রেতের নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ও দীর্ঘশ্বাসে সেখানকার বায়ুতরঙ্গ হিমানীর মত ঠাণ্ডা, সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগায়, প্রতি রোমকূপে রোমকূপে ভীতির অনুভূতি তোলে।

বলাই বাহুল্য সিঁড়িপথেও তেমন আলোর ব্যবস্থা নেই।

মৃদু আলোছায়াচ্ছন্ন প্রশস্ত সিঁড়িপথ অতিক্রম করে বামন আকৃতির কৈরালাপ্রসাদকে অনুসরণ করে দ্বিতলে অনুরূপ একটি দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তে এসে সমর দাঁড়ায় এবং সেখানে পৌঁছেই বামন কৈরালাপ্রসাদ ঘুরে দাঁড়ায় এবং চাপা কণ্ঠে বলে, চলে যান, সামনেই ঘর।

কথা কটি বলে এবং দ্বিতীয় কোন বাক্যোচ্চারণে সমরকে অবকাশ মাত্রও না দিয়ে নিমেষে অত্যন্ত দ্রুতপদে কৈরালাপ্রসাদ সিঁড়িপথ দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনার অত্যন্ত দ্রুত আকস্মিকতায় সমর যেন কতকটা হতবুদ্ধি ও বিহ্বল হয়ে আলো-ছায়াচ্ছন্ন বারান্দার প্রান্তে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

সম্মুখে পর পর অনেকগুলি ঘরের দরজা। কৈরালাপ্রসাদ বলে গেল সামনের ঘরে যেতে কিন্তু কোন্ ঘরে সে যাবে।

হতবুদ্ধি সমর যন্ত্রচালিতের মতই কতকটা অগ্রসর হয়ে প্রথম বন্ধ দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে ঈষৎ ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুর বীণাযন্ত্রসহযোগে অপূর্ব সুমিষ্ট নারীকণ্ঠসঙ্গীতের একটা ঝাপটা কানে এসে প্রবেশ করে: খুল্ খুল্ যায় বাজুবন্দ্।

সঙ্গীত ও সেই সুরের আকর্ষণেই বোধ হয় মন্ত্রমুগ্ধের মত অত্যুজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত সেই কক্ষের উন্মুক্ত দ্বারপথেই ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায় সমর।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর প্রভায় সমগ্র কক্ষখানি যেন ঝলমল করছিল।

বাড়ির সর্বত্র অন্ধকার অথচ ঐ কক্ষটি আলোয় ঝলমল। তাছাড়া রোগী দেখতে এই মধ্যরাত্রে যে বাড়িতে সে এসেছে—সেই বাড়িরই কোন ঘরে ঐ রকম সঙ্গীতের আনন্দ বসবে—ব্যাপারটা সহসা যেন কেমন সমর সেনের বোধগম্য হয় না। তাই কতকটা বিস্ময়-

বিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে যায়।

সমস্ত মেঝে জুড়ে দামী গালিচা বিস্তৃত এবং মাঝখানে ফরাস বিছানো। সেই ফরাসের উপর অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী কোলের কাছে বীণা নিয়ে বীণে সুরঝঙ্কারের সঙ্গে নিজের মধুস্রাবী কণ্ঠস্বরকে গঙ্গা-যমুনার ধারার মতই মিলিয়ে দিয়েছে।

অদূরে উপবিষ্ট পঞ্চাশের উর্ধ্বে'ই হবে, এক অতীব সুশ্রী ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত শ্যামকান্তি প্রৌঢ় ব্যক্তি।

প্রৌঢ়ের কাঁধের উপর দামী একখানা কাশ্মীরী শাল কাঁধ থেকে মাটিতে নেমেছে। প্রৌঢ়ের হাতে একটি কাচের রঙীন সুরা-ভর্তি পাত্র, পেগ্ গ্লাস।

যন্ত্র ও কণ্ঠের মিলিত সুরধারা যেন সুধাক্ষরণ করছিল কক্ষমধ্যে।

গায়িকার সুরেলা কণ্ঠ তখনও মিনতি করছে বারংবার: খুল্ খুল্ যায় বাজুবন্দ্। সুরের ধারায় সম্মোহিত সমর যেন সব কিছু ভুলে যায়।

সে যেন ভুলে যায় কেন সে এখানে এসেছে। সে যে একজন ডাক্তার এবং বিশেষ একটি রোগীর সঙ্কটময় পরিস্থিতির দরুন তাকে এই মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে আনা হয়েছে, কিছুই যেন মনে পড়ে না।

কতক্ষণ ঐ ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে ছিল সমর তার নিজেরও মনে নেই—হঠাৎ চমকে ওঠে পিঠের ওপর যেন কার অলক্ষিত মৃদু করস্পর্শে।

চমকে তাকায় সমর সেন, তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রোগা ডিগডিগে এক ব্যক্তি, দৈর্ঘ্য প্রায় ছ ফুটেরও ইঞ্চিখানেক বোধ হয় বেশী হবে। যেমন দৈর্ঘ্যে সেই অনুপাতে প্রস্থে একেবারে শূন্যের কোঠায় বললেও চলে।

মাথার চুল ছোট ছোট করে কদম ছাঁট করা। শকুনের মত দীর্ঘ বাঁকানো নাসিকা ও ক্ষুদ্র গোলাকার চোখ। চোখের দৃষ্টি স্থির ঘষা কাচের ন্যায় ফ্যাকাসে প্রাণহীন। সহসা দেখলে প্রেতের চাউনি বলেই মনে হয়।

মুখের দু পাশের হনু দুটি বিশ্রীভাবে সজাগ হয়ে আছে।

দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো।

ডান হাতের হাড় বের করা শিরাবহুল তর্জনীটি ওষ্ঠের ওপর স্থাপন করে ইশারায় লোকটি সমরকে কথা বলতে নিষেধ জানাল এবং স্থির ঘষা কাচের মত ফ্যাকাসে দৃষ্টি দিয়ে যেন বলে—আমার সঙ্গে আসুন।

কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সমর দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে লোকটিকে অনুসরণ করে বাইরের স্বল্পালোকিত বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

স্প্রিং অ্যাকশনে ঘরের দরজাটা পুনরায় ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুই

ও ঘরে নয়। মামাকে দেখতে এসেছেন তো আপনি ?

সময় কতকটা বোকার মতই যেন ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়, হ্যাঁ—

চলুন ঐ ঘরে।

কোন মানুষের কণ্ঠস্বর এতখানি কর্কশ, চাপা ও অস্বাভাবিক হতে পারে সময়ের যেন ধারণারও অতীত ছিল।

অবাক বিস্ময়ে তখনও সময় লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

লোকটার পরিধানে পায়জামা ও গায়ে একটা কালো রঙের ভারী গ্রেট কোট।

আশ্চর্য! অমন রোগা লোকটা অতবড় একটা ভারী গ্রেট কোট কেমন করে গায়ে দিয়ে আছে!

আপনি—কি যেন বলবার চেষ্টা করে সময়।

লোকটি পূর্ববৎ কর্কশ গলায় বলে, আমি রায়বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরীর ভাগ্নে। আমার নাম শকুনি ঘোষ।

শকুনি ঘোষ! বিস্মিত হতভম্ব সময় পাল্টা প্রশ্নটা যেন নিজের অজ্ঞাতেই উচ্চারণ করে ফেলে।

হা হা করে লোকটা বিশ্রী কুৎসিত ভাবে একটা চাপা হাসি হেসে ওঠে। মনে হয় যেন করাত দিয়ে কেউ কাঠ চিরছে ঘ্যাস ঘ্যাস্ শব্দে।

আজ্ঞে, মাতুল দুর্যোধনের ভাগিনেয় শকুনি। কেন, মহাভারত পড়েননি? নামটা আবার আমার ঐ মামারই দেওয়া। চলুন—

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে এবারে সময় অগ্রসর হয় শকুনিকে অনুসরণ করে, একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের বন্ধ দরজাটা ঠেলে খুলতে কতকটা জড়িত চাপা কণ্ঠের একটা চিৎকার সময়ের কানে এসে প্রবেশ করল, সম্পত্তি ভোগ করবে! আমার এত কষ্টের সম্পত্তি শালারা বারো ভূতে লুটে খাবে! একটি আধলা পয়সাও নয়। কোন শালাকে একটা কানকড়িও দেব না।

সময় তখন শকুনির নীরব চোখের ইঙ্গিতে কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

বড় আকারের হলঘরের মত বেশ প্রশস্ত একখানা ঘর।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি কালো রঙের একটা ভারী পর্দা ঝুলছিল অনেকটা পার্টিশনের মত।

পর্দার ওপাশ থেকে নীলাভ আলোর একটা দ্যুতির চাপা ইশারা পাওয়া যায়।

পর্দার ওপাশ থেকেই কণ্ঠস্বরটা শোনা যায় বেশ স্পষ্ট এতক্ষণে।

আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ সেন ঘরের চারদিকে তাকায়।

পর্দার ওপাশে একটি বেশ বড় সাইজের গোলাকার টেবিলের চারপাশে খানপাঁচেক চেয়ার ও গোটা দুই সোফা, একটা সেল্‌ফ—সেল্‌ফের তিনটি তাকে নানাবিধ ওষুধপত্রের ছোট-বড় নানা আকারের শিশি, রোগীর খাবার ও ফিডিং কাপ, স্প্রে, ডুস—কেনিউলা প্রভৃতি সাজানো রয়েছে।

এবং ডাঃ সেনের নজরে পড়ে ঘরের দুটি সোফা অধিকার করে পাশাপাশি দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন নিঃশব্দে। আর তাঁদের সামনে একজন দাঁড়িয়ে।

তাঁদের মধ্যে একজন মনে হয় মধ্যবয়সীই হবেন, প্যান্ট ও সার্ট পরিধানে, গলায় স্টেথোটি জড়ানো, উনি যে একজন চিকিৎসক বোঝা গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পবয়সী, তেইশ-চব্বিশের মধ্যে, পরিধানে তার ধুতি ও গায়ে একটি শাল জড়ানো।

তৃতীয় যে দাঁড়িয়ে, তার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। মাথার চুল ব্যাক-ব্রাশ করা সযত্নে।

বেশ উঁচু লম্বা চেহারা এবং অতি সুশ্রী। চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোকের পরিধানে ধুতি ও শেরওয়ানী।

শেরওয়ানীর বোতামগুলি খোলা।

দণ্ডায়মান ব্যক্তির নজরই ঘরে প্রবেশ করবার পর সর্বপ্রথম সমর ও শকুনির উপরে পড়ল।

এবং কেউ কিছু বলবার আগে শকুনিই বলে তার সেই বিশ্রী গলায়, ডক্টর সেন।

উপবিষ্ট দুজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান বোধ হয় ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানাতেই।

আর ঠিক ঐ সময় পর্দার ওপাশ থেকে আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর : শালারা ভাবছে আমি কিছু বুঝি না! আমায় slow poison করছে, টের পাচ্ছি না, না? সব—সব জানি। সব বুঝতে পারছি, পুলিস সাহেব মিঃ দালালকে চিঠি দিয়েছি। Conspiracy—বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে—সব জানিয়েছি তাকে।

কতকটা স্তম্ভিত হয়েই যেন ডাঃ সেন সেই কথাগুলো শুনছিল, হঠাৎ অন্য একটি কণ্ঠস্বরে ডাঃ সেন সামনের দিকে তাকায়। প্যান্ট-কোট পরিহিত ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন এবং মৃদু মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, আসুন ডাঃ সেন। এবং পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত প্রথম ভদ্রলোকটির দিকে নির্দেশ করে বললেন, ইনি ডাঃ সানিয়াল, দাদার attending physician.

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানায়।

ওপাশে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তখন আবার নীরব হয়ে গিয়েছে।

আপনি attending physician, অন্য কোন বড় ডাক্তার রায়বাহাদুরকে দেখেছেন কি?

সময়ের কথায় মৃদু হাসির ক্ষীণ একটা আভাস ডাঃ সানিয়ালের ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়েই আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

তারপর বলেন, বলুন বরং কে রায়বাহাদুরকে আজ পর্যন্ত দেখেননি! কলকাতার হেন বড় ডাক্তার নেই ওঁকে একাধিকবার এসে দেখে যাননি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। রায়বাহাদুরের একটা ডাক্তার ফোবিয়া আছে বলতে পারেন, এক বছর ধরে এক প্রকার শয্যাগত হয়ে আছেন। আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত অ্যানজাইনার সাতটা অ্যাটাক্ হয়েছে—

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে তাকাল সমর ডাঃ সানিয়ালের মুখের দিকে এবং বলে, বলেন কি?

হ্যাঁ, ডাঃ সানিয়াল বলেন রায়বাহাদুরের একটা নয়, দশটা নাকি হার্ট আছে। শুধু কি তাই ডাঃ সেন, ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কোঠায়। আটবার ডবল নিউমনিয়ার অ্যাটাক্, সাতবার অ্যাকিউট ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি, তিনবার পারনিসাস্ ম্যালেরিয়া ও দুবার টাইফয়েডে ভুগেছেন। এবারের অ্যাটাকটা হার্ট অ্যাটাক থেকে শুরু হয়, বর্তমানে এক বৎসর শয্যাশায়ী। এখন জেনারেল অ্যানাসারকা উইথ কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর।

হুঁ। তা আমি ওঁকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি—

বেড সোর থেকে গ্যাংগ্রিন হতে চলেছে তাই আপনাকে ডাকা হয়েছে—

ও—কথাটা উচ্চারণ করে সমর চুপ করে যায়।

বুঝতে পারে না ঐ জন্য এত রাত্রে এই ভাবে তাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আনবার এমন কি জরুরী প্রয়োজন ছিল।

সমর ভাবছিল, শুধু এই বাড়িটা, তার আবহাওয়া ও এখানকার বাসিন্দারাই বিচিত্র নয়, এ-বাড়ির সব কিছুই যেন কেমন বিচিত্র। কোথাও স্বাভাবিকতার যেন লেশমাত্র নেই। শুধু বিচিত্র হলেও বুঝি কথা ছিল, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যেন একটা রহস্যের ইঙ্গিত।

ঢং করে রাত্রি আড়াইটে ঘোষণা করে ঘরের দেওয়ালে বসানো একটি ওয়াল-ক্লক ঐ সময়।

এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার পর্দার ওপাশ থেকে শোনা গেল সেই পূর্ব কণ্ঠস্বর—ডাক এল, ডাক্তার!

কণ্ঠস্বরে পূর্বের মতই বিরক্তি।

ডাঃ সানিয়াল হন্তদন্ত হয়ে যেন পর্দার ওপাশে চলে গেলেন।

ওপাশের কথাবার্তা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। ডাঃ সেন কান পেতে

...র সামনের ...টা থান তো। ...স্পষ্টই স্পষ্ট বোধ

কি বললেন, দুঃস্বপ্ন—আমি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছি ? হুঁ, দুঃস্বপ্নই বটে। দেখছি গত এক বৎসর ধরে। But it is as true as anything. একটু পরেই আপনার জানতে পারবেন গত এক বৎসর ধরে যে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথাটা আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠছে সেটা সত্য—it is coming.—আসছে মৃত্যু, আসছে, ঘুম হবে না জানি আমি—কোন ওষুধেই আর ঘুম হবে না, তবু যখন বলছেন দিন কি ওষুধ খেতে হবে সত্যিই আমি ঘুমোতে চাই। Deep, sound sleep—

সমর রায়বাহাদুরকে ওষুধটা খাইয়ে দিল।

নার্সের সঙ্গে সঙ্গে এমন সময় কিরীটী রায় এসে পর্দার পাশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

কে ?

আমি কিরীটী, রায়বাহাদুর।

সমর চোখ তুলে আগন্তুকের দিকে তাকায়।

কিরীটীর পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও কিমোনো। দেখলেই বোঝা যায় সদ্য সে শয্যা থেকে বোধ করি উঠে এসেছে।

কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

এই ঘরেই তো ছিলাম।

ঘুমোচ্ছিলেন, না ? এমনি করে ঘুমোলেই আপনি আমার হত্যা-রহস্যের কিনারা করেছেন আর কি ! সময় যে ঘনিয়ে এল সেদিকে খেয়াল আছে ?

কিরীটী মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়, সে তো আপনার হিসেব মত রাত চারটের। এখনও এক ঘণ্টার ওপরে সময় আছে।

আর সময় আছে !

তাছাড়া আপনাকে তো বলেছি, আমি একবার এসে যখন উপস্থিত হয়েছি প্রাণ থাকতে আপনার আর কোন বিপদ যাতে না ঘটে সেই চেষ্টাই করব।

করুন। যত পারেন চেষ্টা করুন কিন্তু বাধা দিতে পারবেন না এও আমি জানি।

ঢং ঢং ঢং !···

রাত্রি তিনটে ঘোষিত হয় ওয়াল-ক্লকে।

রায়বাহাদুর আবার বলেন, আর এক ঘণ্টা—

আপনি এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন দেখি রায়বাহাদুর !

কথাটা বলে কিরীটী।

রায়বাহাদুর চোখ বুজে ছিলেন, কিরীটীর কথার কোন জবাব দিলেন না।

ঘুমোবেন না বললে কি হবে—দু-চার মিনিটের মধ্যেই রায়বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছেন ওষুধের প্রভাবে, বোঝা গেল তাঁর মৃদু নাসিকাধ্বনিতে।

রায়বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝতে পেরে, কিরীটী সকলকে চোখের ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে।

একমাত্র নার্স বাদে বাকি তিনজনে বাইরে চলে আসে।

পর্দার এদিকে এসে ওরা দেখে একমাত্র দুঃশাসন চৌধুরী ভিন্ন বাকি দুজন—শকুনি ঘোষ ও অন্য ভদ্রলোকটি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত নেই।

ডাঃ সানিয়াল কিরীটী ও ডাঃ সমর সেনকে লক্ষ্য করে বলেন, চলুন আমার ঘরে, আপনাদের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

সকলে রোগীর ঘর থেকে বের হয়ে একেবারে লাগোয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষের দ্বার ঠেলে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে।

ছোট্ট একখানি ঘর, রোগীর ঘরের সঙ্গে মধ্যবর্তী একটি দ্বারপথে যোগাযোগ আছে।

একটি লোহার খাটে সাধারণ একটি শয্যা বিস্তৃত।

ঘরের কোণে একটি আলনায় কয়েকটি জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে ঝুলনো। একটি ছোট্ট টেবিল। একধারে ছোট একটি নেয়ারের খাটে শয্যা বিছানো। খানকতক বই ও খাতাপত্র টেবিলের উপরে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। খাটের নীচে একটি চামড়ার সুটকেস্।

ইলেকট্রিক স্টোভে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেত্‌লীতে জল ফুটছিল।

খান তিনেক চেয়ারও ঘরে ছিল।

বসুন। কফি তৈরি করি একটু, কারও আপত্তি নেই তো—সানিয়াল বলেন।

ডাক্তার সেন বা কিরীটী কারোরই আপত্তি ছিল না। দুজনেই তাই জবাব দেয়, বেশ তো।

কেত্‌লীর জল ফুটে গিয়েছিল।

ডাঃ সমর সেন কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই আমার কিরীটীবাবু।

কেত্‌লী থেকে গরম জল একটা কাচের টি-পটে ঢেলে কফির গুঁড়া মেশালেন ডাঃ সানিয়াল। সমর সেনের প্রশ্নে তার দিকে চেয়ে বললেন, বলেন কি মশাই, অমন একটা লোকের সঙ্গে আজও পরিচয় হয়নি আপনার?

না। মৃদু হেসে সেন বলেন।

রহস্যভেদী কিরীটী রায়। ডাঃ সানিয়াল জবাব দিলেন।

আপনাকেও উনি বুঝি ডেকে এনেছেন? সমর প্রশ্ন করেন।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, হ্যাঁ। শুনলেন না, রায়বাহাদুরের বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে যে তাঁকে হত্যা করবার জন্য তাঁর চারপাশে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এবং আজ

রাত্রেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত!

হঠাৎ এমন ধারণা হল কেন তাঁর?

ঠিক যে হঠাৎ হয়েছে বললে ভুলই বলা হবে ডাঃ সেন, কিরীটী বলে, তবে—

ইতিমধ্যে ডাক্তার সানিয়াল কফি তৈরী করে কিরীটী ও ডাঃ সেনকে দু'কাপ দিয়ে, নিজেও এক কাপ কফি নিয়ে বসলেন।

ডাঃ সানিয়াল কফিতে এক চুমুক দিয়ে ডাঃ সেনের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, রায়বাহাদুরকে দেখে আপনার কি মনে হল ডাঃ সেন?

মনে হল যেন একটা illusion-এ ভুগছেন, কিন্তু কতদিন থেকে এরকম হয়েছে? ডাঃ সেন বললেন।

দিন সাতেক হবে। দিন সাতেক আগে থেকেই ঐ কথাটা প্রায় বলছেন, আজকের তারিখে রাত চারটের সময় নাকি উনি নিহত হবেন!

এর আগে কখনও ঐ ধরনের কথা বলেননি?

না। আমি তো প্রায় মাস আষ্টেক হল এখানে আছি attending physician হয়ে—

I see—তা, আর ঐ যে সব ষড়যন্ত্রের কথা কি বলছিলেন? এবারে প্রশ্নটা করেন আবার সময় সেনই।

আপনি তো অনেকদিন এখানে আছেন, হঠাৎ এরকম ধারণা ওঁর হল কেন কিছু বলতে পারেন ডাঃ সানিয়াল?

কিরীটী এবার প্রশ্ন করল।

না। বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি রায়বাহাদুরের আত্মীয়স্বজনেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সর্বদা কি ভাবে ওঁকে একটু সুস্থ ও নিশ্চিন্ত রাখতে পারবেন। এ ধরনের সন্দেহ যে কি করে আসে—

ডাঃ সেন এবারে বলেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, অভিশাপ—এটা একটা অর্থের অভিশাপ ডাঃ সানিয়াল। অর্থ জিনিসটাই এমন যে না থাকলেও শান্তি নেই, আবার থাকলেও শান্তি নেই। শাঁখের করাত, এগুতেও কাটে পিছুতেও কাটে।

কিরীটী কথাটা শুনে মৃদু হাসে।

নিঃশেষিত কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে কিমোনোর পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দেশলাই সহযোগে অগ্নি সংযোগ করল কিরীটী।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করবার পর কিরীটী বলে, গত দশ বৎসর থেকে রায়বাহাদুরকে চিনি। A self-made man. প্রথম জীবনে কুলি রিক্রুটিং থেকে শুরু করে ক্রমে নিজের অসাধারণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। সাত-

লাতটা কোন মাইনস্রের প্রোপাইটর হয়েছেন।

বলেন কি! ডাঃ সেন বলেন।

হ্যাঁ সত্যিই বিচিত্র মানুষটা, শুধু যে উপায়ই করেছেন তা নয়—রায়বাহাদুর শুনেছি জীবনে দানধ্যানও করেছেন প্রচুর। কথাটা বললেন ডাঃ সানিয়াল।

হ্যাঁ আমিও শুনেছি, বহু প্রতিষ্ঠানে ওঁর বহু দান আছে। জবাব দিল কিরীটী।

ডাঃ সমর সেন ও আসরে যেন নির্বাক শ্রোতা। অবাক বিস্ময়ে বিচিত্র অদ্ভুত রায়-বাহাদুরের কাহিনী শুনছিল।

দরজার গায়ে এমন সময় সহসা মৃদু করাঘাত শুনতে পাওয়া গেল।

কে? ডাঃ সানিয়ালই প্রশ্ন করলেন এবং এগিয়ে গিয়ে দ্বার খুলে দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করলেন রায়বাহাদুরের ভাই দুঃশাসন চৌধুরী।

এবং কক্ষের মধ্যে উপবিষ্ট কিরীটী ও ডাঃ সমর সেনকে লক্ষ্য না করেই ডাঃ সানিয়ালকে বলেন, ডাক্তার, আমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিতে পার? কিছুতেই ঘুমোতে পারছি না। ঘুম আসছে না। এ আর তো পারি না—এক মাস হল, আর কত না ঘুমিয়ে কাটাব—

এখানে তো আমি কোন ওষুধ রাখি না মিঃ চৌধুরী। ও-ঘরে অনেক রকমের ঘুমের ওষুধ আছে। আমার নাম করে নার্সের কাছে চান গিয়ে, সে দেবে'খন।

ওসব সাধারণ বারবিউটন গ্রুপ অফ্ ড্রাগস্যে আমার কিছু হবে না। সব খেয়ে দেখেছি। বরং যদি আমাকে একটু মরফিয়া injection করে দাও হাফ্ গ্রেন—

মরফিয়া! বিস্মিত ডাক্তার সানিয়াল যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেন।

হ্যাঁ, মরফিয়া। আচ্ছা থাক, আজও যা-হোক একটা কিছু খেয়েই দেখি—বলতে বলতে দুঃশাসন চৌধুরী প্রস্থান করলেন।

ওঁরা আবার গল্প শুরু করলেন।

আরও আধ ঘন্টাটাক পরে।

সহসা কতকটা যেন ঝড়ের বেগেই বৃদ্ধগোছের একটি ভৃত্য ঘরের দরজার সামনে এসে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে, ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! শীগগিরি আসুন! কর্তাবাবু—কর্তাবাবু—

কিরীটী ততক্ষণে চেয়ার থেকে কতকটা যেন লাফিয়েই উঠে ছুটে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

কি—কি হয়েছে কর্তাবাবুর?

খুন—খুন হয়েছেন কর্তাবাবু !

সে কি ! বিস্মিত একটা চিৎকারের মতই যেন কথাটা ডাঃ স্যানিয়ালের কণ্ঠ হতে নির্গত হয় ।

হ্যাঁ, শীগগিরি আসুন ।

সকলের আগে কিরীটী যেন ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং তার পশ্চাতে ডাঃ সেন, ডাঃ সানিয়ালও বের হয়ে গেলেন :

রায়বাহাদুরের ঘরের দরজা খোলাই ছিল ।

কিরীটী সর্বপ্রথম ঘরের মধ্যে গিয়ে পা দিল এবং ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ওয়াল-ক্লকটা রাত্রি চারটে ঘোষণা করল :

ঢং ঢং ঢং ঢং…

রাত চারটে ।

কিরীটীর বুকের ভেতরটা যেন ধক্ করে ওঠে । তাহলে সত্যিসত্যিই রায়বাহাদুরের নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে নিজের ভবিষ্যৎবাণীটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল !

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর কিরীটী কেমন যেন বিহ্বল বিভ্রান্ত ভাবে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয় না ।

তিন

ঘরের মধ্যে ঐ সময় ওরা তিনজন ছাড়াও দুঃশাসন ও বৃহন্নলা চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন । উভয়ের চোখেমুখেই একটা অসহায় ভীতিবিহ্বল ভাব । নির্বাক এবং কেমন যেন বিস্ময়া-বিভূত সকলে ।

ওয়াল-ক্লকের গম্ভীর সংকেতধ্বনিটা যেন নিষ্ঠুর হত্যার কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেল ।

মৃত্যু আছেই । কে কবে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে—এবং আসে যখন অমোঘ পরোয়ানা হাতেই এসে হাজির হয় । তবু রায়বাহাদুরের মৃত্যুটা যেন অকস্মাৎ একটা ধাক্কা দিয়েছে সবার মনেই । কোন কথা না বলে কিরীটী অতঃপর ঘরের মধ্যের পর্দাটা তুলে রায়বাহাদুর যেখানে শায়িত সেখানে এসে দাঁড়াল । অন্যান্য সকলেও তাকে অনুসরণ করে ওর আশেপাশে এসে দাঁড়ায় ।

অদূরে সর্বপ্রথম সকলেরই দৃষ্টি পড়ে রোগীর শিয়রের কাছে, চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট নার্সের মাথাটা চেয়ারের উপরে একপাশে হেলে রয়েছে ।

আর—আর শায়িত মুদ্রিত চক্ষু রায়বাহাদুরের বুকের ঠিক মাঝখানে সুদৃশ্য কালো বাঁটওয়ালা একটা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে—যেন নিষ্ঠুর মৃত্যুর ভয়াবহ প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিচ্ছে ।

রায়বাহাদুরের গায়ের উপরে যে সাদা চাদরটি ছিল সেই চাদর সমেতই ছোরাটা ভেদ করে গিয়েছে। কিন্তু ছোরাটার কালো বাঁটের চার পাশে লাল রক্তচিহ্ন শুভ্র চাদরের উপরে যেন ভয়াবহ একটা বিভীষিকার মত মনে হয়।

কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি ডাঃ সানিয়াল প্রথমেই রায়বাহাদুরের পালসটা দেখলেন, সব শেষ। অনেকক্ষণ মারা গেছেন।

কিরীটী প্রথমে নার্সের নাম ধরে ডাকে, কিন্তু সাড়া না পেয়ে এগিয়ে উপবিষ্ট ও নিদ্রিত নার্সকে ঠেলে জাগাতে গিয়ে দেখে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন নার্স।

কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয় না যে স্বাভাবিক ঘুম নয়। কোন তীব্র ঘুমের ওষুধের সাহায্যেই নার্সকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করা হয়েছে, সম্ভবতঃ ইচ্ছে করেই।

ডাক্তার দুজনও ইতিমধ্যে নার্সের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ সানিয়াল ঘুমন্ত নার্সকে পরীক্ষা করতে উদ্যত হন, কিরীটী সরে দাঁড়ায়।

অপলক দৃষ্টিতে কিরীটী নিহত, মুদ্রিত চক্ষু রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সমস্ত মুখখানা জুড়ে যেন রায়বাহাদুরের ফুটে উঠেছে একটা নিষ্ঠুর অবজ্ঞার চিহ্ন।

অদূরে টেবিলের উপরস্থিত নীলাভ আলোতে মুখখানার মধ্যে যেন কেমন এক নিদারুণ বিভীষিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঘরের মধ্যে সকলেই নিস্তব্ধ. কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

কেবল পর্দার ওপাশের ওয়াল-ক্লকটা একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে। মন্থর বিশ্রী টক্ টক্ টক্ শব্দ সেই নিশ্চলতার মধ্যে।

উঃ, কি ভয়ানক।

সকলেই যুগপৎ ঐ কথাগুলি সহসা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে তাকান।

কথাটা বলেছিলেন দুঃশাসন চৌধুরী। কথাটা বলেই তিনি দু'হাতে নিজের মুখখানা ঢাকেন।

ডাঃ সানিয়াল যেন কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না, ঠিক ঐ সময় একটা ভারী জুতোর মচমচ শব্দ সকলের কানে প্রবেশ করে।

মচমচ শব্দে জুতো পায়ে কে যেন এই কক্ষের দিকেই এগিয়ে আসছে।

মচ-মচ-মচ। জুতোর শব্দ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিরীটীই সর্বাগ্রে পর্দার ওদিকে পা বাড়িয়েছিল এবং পর্দার এদিকে আসতেই দেখতে পেল পুলিসের ইউনিফর্ম পরিধানে হৃষ্টপুষ্ট ভারিক্কী চেহারা এক অফিসার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। বারেক কিরীটী ও পুলিস অফিসারটি দুজনে দুজনের দিকে অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। কিরীটী প্রথমে কথা বলে, আপনিই বোধ হয় এখানকার এস. পি. মিঃ দালাল?

হ্যাঁ। আপনি?

আমি! আমার নাম কিরীটী রায়। আসুন, এইমাত্র আমরা জানতে পেরেছি রায়বাহাদুর নিহত হয়েছেন।

কি বললেন! রায়বাহাদুর—উৎকণ্ঠা মিশ্রিত উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পুলিস সুপার মিঃ দালাল।

হ্যাঁ। চলুন, এই ঘরের পর্দার ওপাশে মৃতদেহ।

স্তম্ভিত নির্বাক এস. পি. দালাল যন্ত্রচালিতের ন্যায় কিরীটীকে অনুসরণ করলেন।

পর্দার এপাশে এসে পা দিতেই এবং মৃতের বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ রায়বাহাদুরের প্রতি নজর পড়তেই অস্ফুট কণ্ঠে আবার দালাল সাহেব বলে ওঠেন, উঃ, What a horrible sight! কি ভয়ানক! Then really he has been killed!

সত্যিই ভয়ানক! যেন পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চরমতম বিস্ময়। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেও যে লোকটি জীবিত ছিলেন, প্রাণস্পন্দনের মধ্যে দিয়ে নিজের সত্তাটাকে ঘোষণা করছিলেন, এই মুহূর্তে অসহায় মৃত্যুর মধ্যে যেন নিঃশেষে লোপ পেয়েছেন। নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছেন জীবনসমুদ্রের বুক থেকে। এবং এই ঘটনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত রহস্য হচ্ছে এই যে, ঐ ছুরিকাবিদ্ধ মৃত লোকটি কেমন করে না-জানি অবধারিত অবশ্যম্ভাবী তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি পূর্বাহ্ণেই জানতে পেরেছিলেন কোন এক আশ্চর্য উপায়ে। কিন্তু সত্যিই কি জানতে পেরেছিলেন, না সেটা ডাক্তারের ভাষায় একটা সত্যিই ইলিউশান মাত্র! না, ব্যাপারটা তাঁর অসুস্থ মস্তিষ্কের উত্তেজনা-প্রসূত একটা কল্পনা মাত্র!

নার্স সুলতা করের জ্ঞান আরও আধ ঘণ্টা পরে ফিরে আসে একটু একটু করে।

ওষুধের প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারে না। চোখের ঘুম ও মনের নিষ্ক্রিয়তাটুকু যেন কেটেও কাটতে চায় না। একটা নেশার ঘোরের মত সমস্ত চেতনাকে তার এখনও আচ্ছন্ন করে আছে যেন। কিরীটীর পরামর্শে এক কাপ স্ট্রং কফি পান করার পর সুলতা যেন কতকটা ধাতস্থ হয়।

কিন্তু তাকে নানা ভাবে প্রশ্ন করেও তার বক্তব্য হতে এমন কিছুই পাওয়া গেল না যা রায়বাহাদুরের মৃত্যু-রহস্যের উপরে আলোকসম্পাত করতে পারে।

সুলতা কর বললে, রাত্রি দুটো নাগাদ ডাক্তার সানিয়ালের কফি তৈরী হয়েছিল। সেই কফি পান করবার পর হতেই তার বিশ্রীরকম ঘুম পায় এবং সে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিরীটী তখন প্রশ্ন করে, রায়বাহাদুর কি তখন জেগে ছিলেন?

না—সুলতা বলে। রায়বাহাদুরকে ডাঃ সেন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আসবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে রায়বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েন।

সাধারণতঃ দীর্ঘকাল ধরে, বলতে গেলে প্রায় নিয়মিতই ঘুমের ওষুধ সেবন করবার ফলে ইদানীং কোন ঘুমের ওষুধেই সহজে রায়বাহাদুরের নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছিল না।

অথচ আশ্চর্য, আজ ঘুমের ওষুধ পান করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই রায়বাহাদুরের নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং শীঘ্রই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

রায়বাহাদুরকে নিদ্রিত দেখে সুলতা করেরও দু চোখের পাতায় ঘুমের ঢুলুনি নেমে আসতে চায়। এবং কখন একসময় সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুই তার মনে নেই।

সুলতা কর কথা বলছিল বটে কিন্তু কিরীটীর মনে হয় তার কথাবার্তায় একটা ভীতির ভাব যেন সুস্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রথমতঃ ডিউটি দিতে দিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয়তঃ সেই ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যেই নিষ্ঠুর আততায়ীর হস্তে রায়বাহাদুর নিহত হয়েছেন—নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা তার গাফিলতি, তাই কি তার ঐ ভীতি?

কিন্তু কিরীটী নার্স সুলতা করের ঐ ভীতির ব্যাপারটা যেন বুঝেও ইচ্ছে করেই বিশেষ আমল দেয় না।

দালাল সাহেব যখন বারংবার নানাবিধ প্রশ্নবাণে ভীত সুলতা করকে নানা ভাবে জেরার পর জেরা করে চলেছেন, কিরীটীর মনের মধ্যে তখন সম্পূর্ণ অন্য একটি চিন্তা আবর্ত রচনা করে ফিরছিল যেন।

সত্যি কথা বলতে কি, রায়বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে তাঁর গৃহে এলেও ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়নি এতক্ষণ পর্যন্ত। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, রায়বাহাদুর যেমন করেই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থাকুন না কেন—ব্যাপারটা একটা নিষ্ঠুর পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না এখন আর।

বেচারী সুলতা করের কোন দোষ বা অপরাধ নেই বুঝতে পারে কিরীটী। এবং হত্যাকারী যে ধূর্ত ও অত্যন্ত ক্ষিপ্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্রও নেই।

কারণ প্রথমতঃ সে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করে ও প্ল্যান এঁটে রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ঠিক হত্যার সময়টিতে বা পূর্বে এ বাড়ির সকলের মধ্যে যার রোগীর সর্বাপেক্ষা নিকট উপস্থিত থাকবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সুলতা করকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কৌশলে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার দিক থেকে কোন বাধা না আসে।

তৃতীয়তঃ যাকে হত্যা করবে বলে হত্যাকারী স্থির করেছিল তাকে পর্যন্ত তীব্র ঘুমের ওষুধ পান করিয়ে আগেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই তো গেল হত্যাকারীর দিকটা।

নিহত রায়বাহাদুরের দিকটাও রীতিমত যাকে বলে জটিল। পূর্বাহ্ণে তিনি তো নিজের হত্যার কথা জানতে পেরেছিলেনই, তা সে যেমন করেই হোক এবং যেজন্য তিনি কলকাতা থেকে কিরীটীকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন ও এস. পি. দালাল সাহেবকেও কথাটা আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছিলেন। সেদিক দিয়ে হত্যাকারীকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে হত্যাকারী প্রচুর রিস্ক নিয়েছে, যেহেতু আগে থাকতে আটঘাট বেঁধে কাজ করে থাকলেও সে শুধু চতুর নয়, দুঃসাহসীও বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে সে কেমন করে এতগুলো লোকের উপস্থিতির মধ্যে ধোঁকা দিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিল।

কিরীটী আরও ভাবছিল, ছোরার সাহায্যে যখন রায়বাহাদুরকে হত্যা করা হয়েছে তখন এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে হত্যাকারী এই কক্ষে সশরীরে প্রবেশ করেছিলই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ঠিক ঐ সময়টিতে এই কক্ষের মধ্যে নিদ্রিতা নার্স সুলতা কর ও ঘুমন্ত রায়বাহাদুর ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রাণী উপস্থিত ছিল কিনা। এবং উপস্থিত থাকলে কে উপস্থিত ছিল—এই বাড়ির মধ্যে আর কারই বা উপস্থিত থাকা সম্ভব!

মনে মনে অত্যন্ত দ্রুত কিরীটী চিন্তা করে নেয় এই বাড়ির সমস্ত লোকগুলিকে।

মৃত রায়বাহাদুর ছাড়া ঐ সময় বাড়ির মধ্যে উপস্থিত ছিল তার সহোদর ভাই দুঃশাসন চৌধুরী, রায়বাহাদুরের খুল্লতাত অবিনাশ চৌধুরী, ভাগ্নে শকুনি ঘোষ, রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্র বৃহন্নলা চৌধুরী, বৃহন্নলার স্ত্রী নমিতা চৌধুরী, বৃহন্নলার একমাত্র একাদশ-বর্ষীয় বালকপুত্র বিকর্ণ ও রায়বাহাদুরের বোনের মেয়ে রুচিরা দেবী, রায়বাহাদুরের বিধবা বোন ও রুচিরার মা গান্ধারী দেবী। এই আটজন বাড়ির ভেতরের লোক।

বাইরের কর্মচারীদের মধ্যে অন্দরে যাদের অবাধ যাতায়াত ছিল, ম্যানেজার নিতাধন সাহা, তশীলদার বৃদ্ধ কুণ্ডলেশ্বর শর্মা ও পুরাতন নেপালী ভৃত্য কৈরালাপ্রসাদ ও ডাক্তার সানিয়াল এবং কিছুক্ষণ আগে এসেছেন ডাঃ সমর সেন, বৃন্দাবন, ঝি ভৈরভী ও ননীর মা। এবং যাদের ছিল না তারা হচ্ছে ড্রাইভার রামনরেশ ও ভৈরব, নাইটকিপার হুম্ সিং, দারোয়ান বলদেব ও দুখনাথ। এদের মধ্যে অর্থাৎ যাদের অন্দরে যাতায়াত ছিল না তাদের বাদ দিয়ে ঐ বারোজনের মধ্যে কেউ যদি হত্যাকারীকে সাহায্য করে থাকে তাহলে হয়ত তাকে খুঁজে বের করতে পারলে রহস্যের ব্যাপারে কিছুটা কিনারা হতে পারে। এখন কাকে কাকে ঐ বারোজনের মধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে! সেদিক দিয়ে একমাত্র আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে রায়বাহাদুরের পুত্র বৃহন্নলা চৌধুরীর একাদশ-বর্ষীয় বালক পুত্রকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাকি সকলকে সন্দেহের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে, কারণ বাকি সকলের প্রত্যেকেরই মৃত রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে লাভবান হবার সম্ভাবনা।

কাজেই প্রত্যেকের পক্ষেই রায়বাহাদুরকে হত্যা করা এমন কিছুই অসম্ভব নয় বা

ছিল না।

কিরীটীর চিন্তাজাল হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল।

ঐ সময় সুপার দালাল সাহেব সুলতা করের জবানবন্দি শেষ করে দুঃশাসন চৌধুরীকে জেরা করতে শুরু করেছেন।

আপনি বলেছেন দীর্ঘ পাঁচ বছর আপনি বাড়িছাড়া থাকবার পর মাত্র দিন দশেক আগে এখানে ফিরে এসেছেন, কেমন কিনা?

হ্যাঁ। দালাল সাহেবের প্রশ্নের জবাবে জানান দুঃশাসন চৌধুরী।

এই পাঁচ বছর আপনি কোথায় ছিলেন?

বর্মামুলুকে মৌচিতে—

মৌচি—কেন?

মৌচিতে আমার মাইকার বিজনেস ছিল—

মাঝখান থেকে কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে, কয়েকটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মিঃ দালাল মিঃ চৌধুরীকে, যদি অবশ্য আপনি অনুমতি দেন।

একটু যেন বিরক্তি ও অনিচ্ছার সঙ্গেই দালাল সাহেব বলেন, বেশ তো, করুন।

মিঃ চৌধুরীর কি মাইকার সেই বিজনেস এখনও আছে? কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে দুঃশাসন চৌধুরীকে।

না। দাদার অনুরোধে সমস্ত বিজনেস তুলে দিয়েই একেবারে চলে এসেছি।

বিজনেস কেমন চলছিল আপনার?

খুব ভালই চলছিল। তাই আমারও বিজনেস তুলে দেবার কোন ইচ্ছেই ছিল না। গত বছর দেড়েক ধরে দাদা অনবরত আমাকে ওখানকার বিজনেস তুলে দিয়ে দেশে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করছিলেন চিঠির পর চিঠি দিয়ে। তাছাড়া এখানকার এত বড় কলিয়ারী বিজনেস বহমুনা একা একা ম্যানেজ করে উঠতে পারছিল না—

কেন, আমি তো যতদূর জানি ইদানীং অসুস্থ অবস্থাতেও ডু'মাস আগে পর্যন্ত বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই রায়বাহাদুর নিজে বিজনেস দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া আপনার ছোটকাকা অবিনাশবাবুও তো বিজনেস দেখাশুনা করতেন বলেই শুনেছি—কিরীটী এবারে বলে।

কিরীটীর কথায় দুঃশাসন চৌধুরী বিশেষ অর্থপূর্ণ একটু হাসি হেসে বলেন, কে দেখাশুনা করতেন বললেন, আমাদের কাকা সাহেব?

হ্যাঁ।

হুঁ, তা দেখতেন বটে। তবে এতই যখন আপনার জানা আছে—এও নিশ্চয়ই আপনি জানেন, কাকা সাহেবের আসল বিজনেসের চাইতে গান বাজনার ব্যাপারেই বরাবর বেশী

ঝোঁক এবং সেই কারণেই বরাবর দাদাকে না হোক মাসে হাজার দেড় হাজার করে অর্থ আত্মীয়তার আক্কেলসেলামী বাবদ জলে ফেলতে হত। বলতে বলতে কণ্ঠের মধ্যে আরও তাচ্ছিল্য ও অবহেলার ভাব এনে বললেন, হুঁ, তিনি দেখবেন বিজনেস! এই যে বাড়ির মধ্যে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে দেখুন গিয়ে কাকা সাহেব দিব্যি খোস মেজাজে বাইজীর গান শুনছেন এখনও তাঁর ঘরে আসর জমিয়ে।

কিরীটী দুঃশাসন চৌধুরীর কথায় কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে অত্যন্ত ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, দেখুন দুঃশাসনবাবু, আজ গত সাত বছর ধরে রায়বাহাদুরের সঙ্গে এবং আপনাদের এই ফ্যামিলির সঙ্গে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচয়। আপনাদের কাকা সাহেব অবিনাশবাবুর সমস্ত কিছুই আমার জানা, তিনি আমার আদৌ অপরিচিত নন। এমটা কথা আপনি হয়ত ভুলে যাচ্ছেন দুঃশাসনবাবু, রায়বাহাদুরের বর্তমান সুবিপুল সম্পত্তি অর্জনের মূলে আপনাদের কাকা সাহেবের দীর্ঘ বারো বৎসরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আছে। সেদিক দিয়ে আমি যতদূর জানি, রায়বাহাদুরই ইদানীং বৎসর তিনেক হল আপনাদের কাকা সাহেবের জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা মাসোহারার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইচ্ছে করেই—

শ্লেষাত্মক কণ্ঠে এবারে দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দিলেন, আপনি দেখছি অনেক কিছুই জানেন মিঃ রায়, তাই একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার লোভটা দমন করতে পারছি না। এতই যথন আপনি জানেন, এও আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে কোথাও কোন কাগজপত্রে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ আছে, না এটা একটা উভয়ের মধ্যে তাদের মৌখিক ব্যবস্থাই হয়েছিল!

বৎসর দুই আগে রায়বাহাদুরের সঙ্গে যখন একবার আমার কলকাতায় দেখা হয়, কথায় কথায় সেই সময়েই রায়বাহাদুর আমাকে বলেছিলেন—লিখিত ভাবে তাঁর উইলের মধ্যেও—

উইল! দাদার উইল! পরম বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন দুঃশাসন চৌধুরী কথা কটা উচ্চারণ করেন কিরীটীকে বাধা দিয়ে।

হ্যাঁ। উইলেই সে রকম লিখে দিয়েছেন তিনি, তাই আমাকে বলেছিলেন—

এবারে সত্যিই আমাকে হাসালেন মিঃ রায়। দাদার উইল। যতদূর আমার জানা আছে তাঁর তো কোন উইলই নেই।

পাকাপোক্ত রেজিস্টার্ড উইল একটা না থাকলেও—উইল তাঁর একটা ছিল আমি জানি —বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিল এবার কিরীটী।

ভুল শুনেছেন। কাঁচা পাকা কোন উইলই তাঁর নেই।

ইতিমধ্যে একসময় রায়বাহাদুরের পুত্র বৃহন্নলা চৌধুরীকেও দারোগা সাহেব ঐ কক্ষের

মধ্যে ডেকে এনেছিলেন।

পিতার আকস্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুতে বৃহন্নলা চৌধুরী যেন শোকে মুহ্যমান হয়ে পাথরের মতই একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল।

তার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, বৃহন্নলাবাবু, আপনার বাবার কোন উইল বা ঐ জাতীয় কোন কিছু লেখা কি নেই?

না। আমি যতদূর জানি—বাবার কোন উইল ছিল বলে আমি শুনিনি অন্ততঃ—

আছে। কে বললে নেই! আছে, আলবৎ হ্যায়।

অকস্মাৎ অন্য একটি পুরুষের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কটি প্রাণীই যুগপৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় বক্তার দিকে।

কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর এমন মধুস্রাবী হতে পারে এ যেন ধারণাও করা যায় না—ডাঃ সেনের মনে হল।

সত্যি অপূর্ব মিষ্টি কণ্ঠস্বর বক্তার।

এ তো কণ্ঠস্বর নয়, সঙ্গীতের সুর বুঝি।

সঙ্গীতের জন্যই যেন ভগবান ঐ কণ্ঠস্বরটি সৃষ্টি করেছেন

চার

সত্যি গানের মতই মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

উঁচু বলিষ্ঠ পুরুষোচিত গঠন।

কালো গায়ের রঙ হলেও, মুখ-চোখের গঠন ও দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কিছু নিয়ে যেন অপূর্ব একটা শ্রী ও সৌন্দর্যের সমন্বয় যা সাধারণতঃ বড় একটা চোখে পড়ে না।

পরিধানে মিহি কালোপেড়ে ফরাসডাঙার গিলে-করা কোঁচানো ধুতি। ধুতির কোঁচা পায়ের পাতার উপরে লুটুচ্ছে।

গায়ে একটা হাফ-হাতা গরম পাঞ্জাবি।

কাঁধের উপরে দামী কল্কার কাজ করা কমলালেবুর রঙের কাশ্মীরী শাল।

পায়ে ঘাসের চটি।

কাকা সাহেব! যেন কতকটা আত্মগতভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেন দুঃশাসন চৌধুরী।

এ বাড়ির কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী।

কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী সত্যিই ঐ বাড়ির একটি বিশেষ ব্যতিক্রম যেন। শুধু মাত্র চেহারা ও বেশভূষাতেই নয়, চালচলনে আদবকায়দায় কথায়বার্তায় এ বাড়ির কারও সঙ্গে যেন অবিনাশ চৌধুরীর কোন মিল নেই। শুধু আজ বলেই নয়, কোন কালেই বুঝি ছিল না।

প্রথম যৌবনে ছিলেন কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী লোকটি উগ্র সাহেব। তারপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই উগ্র সাহেবিয়ানার বদলে তাঁর সব কিছুর মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটা বাদশাহী আভিজাত্য। যেমন দিলদরিয়া তেমনি স্ফূর্তিবাজ। বিয়ে করেননি, তাই বলে ব্রহ্মচারীর চরিত্রও নয়।

সুরা নারী সঙ্গীত অভিনয় ও শিকার এই ছিল লোকটির জীবনের সব কিছু। রায়-বাহাদুরের মুখেই কিরীটী শুনেছিল, এককালে ঐ সব খেয়ালে দু'হাতে লোকটি অর্থ উড়িয়েছেন! এখন অবশিষ্ট সঙ্গীতসাধনা নিয়েই ঘরের মধ্যে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখেন।

প্রথম যৌবনের সাহেবী আচরণের জন্যই সকলে তাঁকে কাকা সাহেব বলে সম্বোধন করত। এখনও সেই সম্বোধনেই তিনি পরিচিত।

অবিনাশ চৌধুরীর বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে এবং বয়স তাঁর যতই হোক না কেন অতি পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন দেহের মধ্যে এতটুকুও তার ছাপ যেন দেখা যায় না।

আছে! আছে—আলবৎ আছে—দু'বছর আগে দুর্যোধন উইল করে রেখেছিল।

কথা কটি বলে এবারে অবিনাশ চৌধুরী বারেকের জন্য সকলের দিকে একবার চেয়ে বৃহন্নলার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন, সত্যিই কি দুর্যোধন মারা গেছে নাকি, বিনু? এরা গিয়ে এইমাত্র আমাকে সংবাদ দিল!

কিরীটী অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

সে যেন ঠিক বুঝতে পারে না—কে এইমাত্র অবিনাশ চৌধুরীকে গিয়ে দুর্যোধন চৌধুরীর মৃত্যু-সংবাদটা দিল!

কিন্তু অবিনাশ চৌধুরীর কথার কেউই কোন জবাব দেয় না।

ব্যাপার কি, তোমরা যে সবাই মুখে ছিপি এঁটে দিয়েছ বলে মনে হচ্ছে! কথা বলছ না কেন—বলতে বলতে প্রৌঢ় অবিনাশ চৌধুরীর পাশেই দণ্ডায়মান পুলিস-সুপার দালাল সাহেবের প্রতি নজর পড়তেই মুহূর্তে কি একটা বিরক্তিতে যেন মুখটা তাঁর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এবং সকলকে যেন কতকটা বিস্মিত ও বিব্রত করেই দালাল সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে এবারে রুক্ষ কণ্ঠে অবিনাশ বললেন, এ সময় দালাল সাহেব আপনি এখানে কেন? আপনি কেন এসেছেন?

রায়বাহাদুর নিজে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কি বললেন, দুর্যোধন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল? কেন? নিশ্চয়ই এ বাড়িতে কোন চুরি-ডাকাতির কিনারা করতে নয়?

গম্ভীর কণ্ঠে দালাল সাহেব বললেন, তার চাইতেও গুরুতর ব্যাপারে চিঠি লিখে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে আসতে বলেছিলেন।

গুরুতর ব্যাপারে! গুরুতর ব্যাপারটা কি শুনি?

তিনি—রায়বাহাদুর যে আজ রাত্রে নিহত হবেন, যে করেই হোক ব্যাপারটা তিনি পূর্বাহ্ণে বুঝতে পেরে আমাকে সাহায্য করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং এখন দেখতে পাচ্ছি তাঁর সে অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যি-সত্যিই তিনি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছেন।

হুঁ, সত্যি-সত্যিই তাহলে দুর্যোধন নিহত হয়েছে! ব্যাপারটার মধ্যে যেন এতটুকু গুরুত্বও নেই এইভাবে কথা কটি উচ্চারণ করে ধীরে শান্ত ও মৃদু পদবিক্ষেপে ঘরের অন্যাংশে পর্দার ওপাশে এগিয়ে গেলেন অবিনাশ চৌধুরী।

কিরীটী ও দালাল সাহেব নিঃশব্দে অবিনাশ চৌধুরীকে অনুসরণ করে।

শয্যার উপর রায়বাহাদুরের মৃতদেহ ঠিক পূর্বের মতই পড়ে আছে দেখা যায়।

অবিনাশ একেবারে মৃতদেহের সামনে শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে চেয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বললেন, দুর্যোধন! Poor boy! সত্যি-সত্যিই তুই তাহলে মরলি! আশ্চর্য, তুই যে মরবি এ কথা তুই জেনেছিলি কি করে!

সহসা এমন সময় কিরীটীর প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী ফিরে তীব্র দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকায়।

কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনিও তাহলে সে কথা জানতেন অবিনাশবাবু?

Who are you? অবিনাশ চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

চিনতে পারছেন না আমাকে, আমার নাম কিরীটী রায়।

কিরীটী রায়! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমাদের সেই দলিল জালের একটা ব্যাপারে বছর দুই আগে তুমিই না সব ধরে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

হুঁ, তা কি বলছিলে, আমি সে কথা জানলাম কি করে, না? নতুন কথা তো নয়, দুনিয়াসুদ্ধ লোকেই তো শুনলাম জানতো। দুর্যোধনই তো কথাটা বলে বেড়িয়েছে সকলকে শুনেছি।

আপনাকেও তাহলে তিনি বলেছিলেন?

হুঁ।

কবে?

দিন পনের আগে ও একবার বলেছিল—

এর মধ্যে আর বলেননি?

না। বলবে কখন—দেখাই তো হয়নি।

দেখাই হয়নি!

না।

কত দিন দেখা হয়নি?

তা দিন পনেরো হবে।

এই দিন পনেরোর মধ্যে একবারও ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি?

না।

উনি যে অসুস্থ তা আপনি জানতেন?

জানব না কেন!

তবে?

তবে আবার কি! ওসব বড়লোকের রোগফোবিয়া আমার দু-চক্ষের বিষ, I can't stand them.

রায়বাহাদুরের এই দীর্ঘদিনের রোগটা তাহলে আপনার মতে একটা ফোবিয়া ছাড়া কিছু নয়? কিরীটী বলে।

নিশ্চয়ই না।

কি বলছেন আপনি! এত বড় রোগ, এত ডাক্তার, সব ছিল তাঁর একটা ফোবিয়া? প্রশ্ন করলেন এবারে দালাল সাহেব।

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি! সাত-সাতটা হার্ট অ্যাটাক হলে কোন ভদ্রলোক উঠতে পারে বলে তো কখনও শুনিনি। আসলে ও হার্ট অ্যাটাক নয়।

অবাক বিস্ময়ে কিরীটী অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবিনাশ চৌধুরী তখনও বলে চলেছেন, বুঝলেন, আসলে ওসব কিছু নয়, ওকে পেয়েছিল মেলানকোলিয়ায়, বেটসা অর্থাৎ সুরমার মৃত্যুর পর হতেই ও মেলানকোলিয়ায় ভুগছিল। ইদানীং আবার গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছিল, মেলানকোলিয়াই গিয়ে শেষ সিজোফ্রেনিয়াতে দাঁড়িয়েছিল। ভারি তো দু'ছটাক সম্পত্তি আর সামান্য কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাং ব্যালেন্স, তার জন্যে লোকে ওকে হত্যা করবে! যত সব—

বড় বড় রোগের নাম উচ্চারিত হতে শুনেই ডাঃ সমর সেন ও ডাঃ সানিয়াল উভয়েই কৌতূহলী হয়ে অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকান।

উভয়েরই বাক্যস্ফূর্তি হয় না অবিনাশ চৌধুরীর কথা শুনে।

অবিনাশ চৌধুরী বললেন, অপঘাতে মৃত্যু! এইবার সব ধসে পড়বে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে দুর্যোধন আর আমি সব গড়ে তুলেছিলাম, এইবারে সব যাবে। অভিশাপ—সতীসাধ্বীর অভিশাপ!

বলতে বলতে অবিনাশ চৌধুরী বোধ হয় ফিরে যাওয়ার জন্যই পা বাড়িয়েছিলেন।

দালাল সাহেব সহসা বাধা দিলেন, অবিনাশবাবু!

তুমি আবার কে ?

আমি এখানকার এস. পি.।

I see—তা তোমার কিছু বক্তব্য আছে নাকি ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তীব্র দৃষ্টিতে তাকান অবিনাশ চৌধুরী দালাল সাহেবের মুখের দিকে।

পাল্টা প্রশ্নে দালাল সাহেব কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকিয়ে থাকেন।

এই সময় কিরীটী কথা বলে আবার।

সে অবিনাশ চৌধুরীকে প্রশ্ন করে, একটা কথা অবিনাশবাবু—

বলুন !

একটু আগে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আপনি যে বলছিলেন দু বৎসর আগেই রায়বাহাদুর উইল করেছিলেন—

হ্যাঁ। করেছিলই তো।

সেটা অবিশ্যি আমিও শুনেছিলাম, কিন্তু সেটা কি রেজিস্টার্ড উইল ?

রেজিস্ট্রি করেছিল কিনা উইলটা তা জানি না তবে একটা উইল তার আছে। আগে যে ঘরে দুর্যোধন শুত সেই ঘরের আয়রন চেস্টেই বোধ হয় তার সে উইল আছে, যতদূর আমি জানি। তবে সে উইল শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে আর আমার এখন মনে হচ্ছে না।

কেন ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

কেন ! এমনি অপঘাত মৃত্যু, তার ওপরেও সে উইল পাওয়া যাবে বলে আপনি মনে করেন মিঃ রায় ? তাছাড়া আমি তো জানি সে উইলে এই যারা সব পরমাত্মীয়ের দল বরের মধ্যে এসে ভিড় করেছে তারা কেউই কিছু পায়নি।

কি বলছেন আপনি ? কিরীটীই আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, উইলটা যদি খুঁজে পান তো সেটা খুললেই আমার কথার সত্যি-মিথ্যে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

অতঃপর দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে অবিনাশ চৌধুরী কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন নিঃশব্দে।

অবিনাশ চৌধুরীর শেষের কথায় ও তাঁর কক্ষ হতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমগ্র কক্ষের মধ্যে একটা বিশ্রী থমথমে ভাব জমাট বেঁধে ওঠে।

অভাবনীয় পরিস্থিতি।

কারও মুখেই কোন শব্দটি পর্যন্ত নেই।

নিশ্চুপ সকলেই।

অবিনাশ চৌধুরীই যেন সকলকে অকস্মাৎ মূক করে দিয়ে গিয়েছেন।

ওদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল।

আকাশের বুকে শেষ অন্ধকারের পাতলা পর্দাটা আসন্ন আলোর ছোঁয়ায় যেন থির থির করে কাঁপছিল।

নাইট-কীপার হুম্‌ সিংহের খবরদারির চিৎকার সে রাত্রির মত থেমে গিয়েছিল বোধ হয়।

সারারাত্রির জাগরণক্লান্ত হুম্‌ সিং বাগানের মধ্যে ছোট্ট টালির শেড্‌টার মধ্যে এতক্ষণ গিয়ে হয়ত ঢুকেছে।

এখন টানা ঘণ্টা চারেক ঘুমোবে।

বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ একবার জেগে নিজ হাতে উনুন ধরিয়ে এক মগ কড়া চা তৈরী করে পান করে আবার বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমোবে।

তারপর কিছু রুটি ও ডাল আহার এবং আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা নিদ্রা।

জাগবে সে ঠিক সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার যখন প্রকৃতির বুকে একটু একটু করে ঘন হয়ে উঠবে।

কিরীটীই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

দালাল সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, আপনার জবানবন্দি নেওয়া শেষ হল দালাল সাহেব?

না, এই যে শুরু করি—

দালাল সাহেব আবার তাঁর জবানবন্দি নিতে শুরু করেন।

রায়বাহাদুরের ভাই দুঃশাসন চৌধুরীর জবানবন্দি নেওয়া তখনও শেষ হয়নি, আকস্মিকভাবে ঘরের মধ্যে অবিনাশ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটে।

কিরীটীর নির্দেশে বোধ হয় তারই পূর্ব প্রশ্নের জের টেনে দালাল সাহেব দুঃশাসন চৌধুরীর দিকে চেয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি এই তো বলতে চান যে রায়বাহাদুরের কোন প্রকার উইলই ছিল না?

আমি তো মশাই সেই রকমই জানি।

তবে আপনার কাকা সাহেব যে সব কথা বলছিলেন—

ছেড়ে দিন না মশাই। একটা অর্ধ-উন্মাদ লোক—ওঁর কথা কেউ বিশ্বাস করবে নাকি? তাছাড়া দিবারাত্রি গান আর বাইজী নিয়েই তো পড়ে আছেন।

কিরীটীই এবার প্রশ্ন করে, অর্ধ-উন্মাদ নাকি অবিনাশবাবু?

তাছাড়া আর কি! আর এখানে সকলেই তো সে কথা জানে। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন বছর পাঁচেক আগেই প্রথম ওঁর মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময় অনেক চিকিৎসা করা হয়, এমন কি কিছুদিন কাঁকে মেণ্টাল হসপিটালেও ওঁকে রাখা হয়েছিল।

আপনি তো দীর্ঘকাল ধরে বিদেশে ছিলেন এবং রায়বাহাদুরের মুখেই আমি শুনেছি আপনার সঙ্গে এ বাড়ির কখনও পত্র বিনিময়ও ছিল না। এসব কথা তবে আপনি জানলেন কি করে ?

এখানে এসেই শুনেছি।

হুঁ। বলতে বলতে হঠাৎ বৃহন্নলা চৌধুরীর দিকে ফিরে চেয়ে কিরীটী প্রশ্ন করে, বৃহন্নলাবাবু, সত্যিই কি আপনার দাদুর মাথার গোলমাল ঘটেছিল ?

হ্যাঁ, দাদুকে কিছুদিন রাঁচীতে তাঁকে মেন্টাল হস্‌পিটালে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল।

কতদিন হাসপাতালে তিনি ছিলেন ?

তা বছর দেড়েক তো হবেই।

সেখান থেকে কি পরে তাঁকে তারাই ডিসচার্জ করে দেয়, না আপনারাই ওঁকে ছাড়িয়ে আনেন ?

ভাল হয়ে যাওয়ায় আমরাই ওঁকে ছাড়িয়ে আনি।

অসুখটা কি হয়েছিল ওঁর জানেন কিছু ?

না।

দালাল সাহেব আবার প্রশ্ন শুরু করেন দুঃশাসন চৌধুরীকে।

রাত্রি ঠিক সাড়ে তিনটে থেকে রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এ ঘরে আসবার পূর্ব পর্যন্ত সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন দুঃশাসনবাবু ?

মাস তিনেক ধরে রাত্রে আমার একেবারেই বলতে গেলে ঘুম হয় না। তবে আজ নার্স আমাকে একটা স্ট্রং ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল তাতেই বোধ হয় একটু ঝিম্ মত এসেছিল। বোধ হয় তো কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিলাম।

হুঁ। তা রায়বাহাদুর যে মারা গেছেন টের পেলেন কি করে ?

সত্যি কথা বলতে কি—দাদার আজ কদিনকার কথা শুনে আজকের রাত্রে ঐ সময়ে যে একটা বিপদ ঘটতে পারে আর কেউ বিশ্বাস না করলেও যেন কেন আমার মন বলেছিল, একেবারে অবিশ্বাস করে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার নয়। তাছাড়া আমি তো এই পাশের ঘরেই থাকি, তাই চারটে বাজবার মিনিট চার-পাঁচ আগেই হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে এ ঘরে এসেছি—

এসে কি দেখলেন ?

দেখলাম ঘরের মধ্যে একা দাদার চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে-মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে,

বাবু নেই। পর্দার ওপাশে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই—

তারপর?

তখন আমিই ওকে আপনাদের ডাকতে বলি ডাক্তারের ঘর থেকে।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী নার্স সুলতা করের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, দুঃশাসনবাবুকে কি ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন সুলতা দেবী?

ডাঃ সানিয়ালের ইনস্ট্রাকসন ছিল একটা লুমিনল ট্যাবলেট দিতে, তাই দিয়েছিলাম।

মৃদু কোমল কণ্ঠে সুলতা কর জবাব দিল।

কিরীটী লক্ষ্য করে, সুলতা কর ঐ বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ সমর সেন ও ডাঃ সানিয়াল যুগপৎ যেন নার্স সুলতা করের মুখের দিকে তাকাল।

ডাঃ সানিয়াল কি যেন বলবারও চেষ্টা করেন কিন্তু বলার সময় পান না—দালাল সাহেব তাড়াতাড়ি বলেন, আচ্ছা এবারে আপনি আপনার ঘরে যেতে পারেন দুঃশাসনবাবু। তবে একটা কথা—আমার জবানবন্দি না শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং আমার পারমিশন ব্যতীত এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেন যাবেন না।

দুঃশাসন চৌধুরী দালাল সাহেবের নির্দেশ শুনে ফিরে তাকায়, তার মানে আমাকে কি নজরবন্দী রাখা হচ্ছে?

না, নজরবন্দী নয়। শুধু একা আপনি নন, এ বাড়িতে যাঁরা যাঁরা এখন আছেন প্রত্যেকের প্রতি আমার ঐ আদেশ।

বেশ।

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন এবং স্পষ্টই বোঝা গেল দালাল সাহেবের কঠোর নির্দেশে তিনি আদপেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

এবং শুধু দুঃশাসন চৌধুরীই নয়, সকলেই যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, সকলের মুখেই যেন তার আভাস পাওয়া গেল।

কিন্তু দালাল সাহেব কোন ভ্রূক্ষেপই করলেন না।

তিনি এবার বৃহন্নলা চৌধুরীর দিকে চেয়ে বললেন, বৃহন্নলাবাবু, এবারে আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

পাঁচ

বৃহন্নলা চৌধুরী কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে দালাল সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বলে, বলুন!

আশা করি আপনাকে যা যা জিজ্ঞাসা করব তার সঠিক জবাব পাব।

নিশ্চয়ই।

গলার স্বরটা মৃদু।

রাত তিনটে থেকে এ ঘরে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপনি কি আপনার ঘরেই ছিলেন?

হ্যাঁ। সন্ধ্যে থেকেই শরীরটা আমার আজ ভাল ছিল না। তাছাড়া ডাঃ সানিয়াল বলেছিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই, তাই নিজের ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলাম।

সে ঘরে আর কেউ ছিল?

না। আমি একাই এক ঘরে শুই বছরখানেক যাবৎ।

আপনার স্ত্রী ও ছেলে?

পাশের ঘরে তারা শোয়।

কার কাছে এ দুঃসংবাদ প্রথমে পেয়ে তাহলে আপনি এঘরে আসেন?

কাকাই গিয়ে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সব কথা বলেন।

কাকা মানে দুঃশাসনবাবু?

হ্যাঁ।

এবারে কিরীটী প্রশ্ন করে, হুঁ, আচ্ছা বৃহন্নলাবাবু, আপনার বাবা যে রাত্রে মারা যাবেন এ কথা আপনাকে বলেছিলেন কি কখনও?

বলেছিলেন। কিছুদিন থেকে প্রত্যেকের কাছেই তো ও কথা বলেছেন তিনি।

আচ্ছা হঠাৎ ঐ ধরনের কথা বলবার তাঁর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি বৃহন্নলাবাবু? দালাল সাহেব প্রশ্ন করেন।

কি জানি, আমি তো দেখতে পাই না।

এমন সময় ঘরের মধ্যে সকলকে বিস্মিত ও সচকিত করে অপূর্ব একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

বৃহন্নলা। দাদাকে নাকি সত্যিসত্যিই কে খুন করেছে?

যুগপৎ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কটি প্রাণীই সেই নারীকণ্ঠ শুনে ফিরে তাকায়।

মধ্যবয়সী অপূর্ব সুন্দরী এক নারী ও তার পাশে এক অপূর্ব সুন্দরী কুড়ি-একুশ বৎসর বয়স্কা যুবতী।

শুধু অপূর্ব সুন্দরীই নয় সেই যুবতী, রূপের যেন তার সত্যিই তুলনা নেই।

কি রূপ।

চিত্রকরের আঁকা যেন একখানা ছবি।

চোখের দৃষ্টি যেন ফেরানো যায় না।

দুটি অসমবয়েসী নারীমূর্তিকে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে একে অন্যের প্রতিচ্ছায়া। অর্থাৎ মা ও মেয়ে।

সকলেই বর্ষীয়সী নারীর প্রশ্নে স্তম্ভিত, নির্বাক।

বৃহন্নলা চৌধুরীই কথা বলে প্রথমে, পিসিমা!

কিরীটী এতক্ষণে চিনতে পারে, ইনিই দুর্যোধন চৌধুরীর বিধবা ভগিনী গান্ধারী দেবী, বৃহন্নলার পিসিমা এবং তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গান্ধারী দেবীর একমাত্র কন্যা রুচিরা দেবী।

রুচিরার অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা কিরীটী রায়বাহাদুরের মুখে ইতিপূর্বে শুনেছিল বটে তবে ভাবতে পারেনি যে রুচিরা সত্যিসত্যিই অমনি রূপবতী।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কিরীটী রুচিরার দিকে এবং শুধু কিরীটীই নয়, ডাঃ সমর সেনও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে রুচিরার দিকে চেয়ে ছিল পলকহীন দৃষ্টিতে।

আপনিই রায়বাহাদুরের বোন? সহসা কিরীটী গান্ধারী দেবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে গান্ধারী দেবী প্রত্যুত্তর দেয়।

আপনার দাদা রায়বাহাদুর যে নিহত হয়েছেন কার মুখে শুনলেন?

রুচি আমাকে একটু আগে গিয়ে বলল।

কে? রুচিরা দেবী, মানে আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ।

এবারে কিরীটী রুচিরার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, আপনি বলেছেন আপনার মাকে যে আপনার মামা নিহত হয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি করে জানলেন সে কথা?

আমি—রুচিরা একবার মার মুখের দিকে চেয়ে কিরীটীর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে কেমন যেন ইতস্তত করে।

হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে? আমি তো জানি আপনারা দক্ষিণের মহলে থাকেন, তাই না?

হ্যাঁ।

তবে?

আমাকে ছোটমামাবাবুই তো গিয়ে বলে এসেছেন।

কি বললি, আমি বলে এসেছি? বিশ্বাস করবেন না, মিথ্যে কথা—দুঃশাসন চৌধুরী হঠাৎ রূঢ়-কঠিন প্রতিবাদে চিৎকার করে ওঠেন এবং যুগপৎ সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকায়।

মিথ্যে কথা বলছি? কি বলছ ছোটমামাবাবু? একটু আগে গিয়ে তুমি আমাকে বলে আসোনি যে বড়মামাবাবুকে ছোরা দিয়ে কে যেন খুন করেছে! সেই কথা শুনেই তো আমি মাকে গিয়ে খবর দিয়েছি।

I'ts a damn lie! ডাহা মিথ্যে কথা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশাসন চৌধুরী আবার প্রতিবাদ জানায়, কখন তোর ঘরে আমি গিয়েছিলাম রে মিথ্যুক? আমি তো বৃহন্নলাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। তার ঘরেই ছিলাম।

ছোটমামা, মিথ্যে কথা বলে কোন লাভ নেই। তোমার কীর্তির কথা জানতে তো আর কারও বাকি নেই।

রুচিরা!

বিশ্রী কণ্ঠে দুঃশাসন চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন। সামান্য একটা কথাকে কেন্দ্র করে বাদ-প্রতিবাদে মুহূর্তে কক্ষের মধ্যে যেন একটা বিষের হাওয়া জমাট বেঁধে ওঠে।

কিরীটী দেখল তিক্ত ব্যাপারকে আর বেশীদূর গড়াতে দেওয়া উচিত হবে না।

সে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, দুঃশাসনবাবু, বাদানুবাদের কোন প্রয়োজন নেই। সত্যকে কেউই আপনারা গোপন করে রাখতে পারবেন না, সময়ে সবই জানা যাবে। তারপর দুঃশাসন চৌধুরীর দিকে ফিরে বলে, দুঃশাসনবাবু, আপনি কিছুক্ষণের জন্য যদি একটু স্থির হয়ে ওই চেয়ারটায় বসেন—আমি রুচিরা দেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কিন্তু রুচিরাকে দুঃশাসন চৌধুরী কি যেন প্রতিবাদ জানাতে শুরু করতেই কিরীটী তাঁকে পুনরায় বাধা দিল, না, এখন আর একটি কথাও নয়। আপনাকে যখন আমি প্রশ্ন করব আপনার যা বলবার বলবেন।

বেশ। তাই হবে। গজগজ করতে করতে দুঃশাসন চৌধুরী অনতিদূরে রক্ষিত চেয়ারটার উপরে গিয়ে উপবেশন করলেন।

রুচিরাকে প্রশ্ন করবার আগে একটা ব্যাপার কিরীটীর চোখে পড়েছিল। রুচিরা ঘরে ঢোকার পর হতেই ডাঃ সমর সেনের দিকে মধ্যে মধ্যে আড়চোখে সে তাকাচ্ছিল। এবং শুধু সে নয়, ডাক্তার সেনও।

কিন্তু কিরীটী যেন ব্যাপারটা আদৌ লক্ষ্য করেনি এইভাবে রুচিরাকে অতঃপর প্রশ্ন শুরু করে।

রুচিরা দেবী, বলুন তো এবারে, ঠিক কতক্ষণ আগে আপনার ছোটমামা দুঃশাসন চৌধুরী আপনাকে গিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন?

তা ঘণ্টাখানেক!

বলতে বলতে কিরীটী একটিবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, বেশ, এখন বলুন exactly দুঃশাসনবাবু আপনাকে গিয়ে কি বলেছিলেন?

ছোটমামাবাবু আমার ঘরে গিয়ে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে, বড়মামাবাবুকে নাকি ছোরা মেরে কে খুন করেছে!

ঐ কথা বলেই তিনি চলে আসেন, না তারপরেও ঘরে ছিলেন?

চলে আসেন।

হুঁ। এক ঘণ্টা আগে যদি দুঃশাসনবাবু আপনাকে খবরটা দিয়ে থাকেন, চারটে বাজবার কয়েক মিনিট আগেই বলুন খবরটা উনি আপনাকে দিয়েছেন, তাই নয় কি?

হ্যাঁ, তাই হবে।

বেশ। আচ্ছা একটা কথা রুচিরা দেবী, দুঃশাসনবাবু যখন আপনার ঘরে যান আপনার ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?

হঠাৎ কিরীটীর শেষ প্রশ্নে রুচিরা দেবী কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে যায়।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।

ঘরের আলো জ্বালা ছিল, না নেভানো ছিল?

আর একবার চমকে ওঠে রুচিরা, মৃদু কণ্ঠে বলে, জ্বালানোই ছিল।

আপনি জেগে, না ঘুমিয়ে ছিলেন?

ঘুমিয়ে ছিলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটী রুচিরা দেবীর মুখের দিকে তাকায়।

ঠিক আছে রুচিরা দেবী, আপনি আপাততঃ আপনার ঘরে যেতে পারেন। পরে প্রয়োজন হলে আপনাকে আমরা খবর দেব।

নিঃশব্দে রুচিরা কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

এবং ঘর ছেড়ে যাবার আগে কিরীটী লক্ষ্য করে আর একবার ডাঃ সেনের দিকে নিমেষের জন্যে তাকাল।

কিরীটী একবার মৃত রায়বাহাদুরের বোনের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, গান্ধারী দেবী!

কিরীটীর ডাকে রুচিরার মা একটু যেন চমকে উঠেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

এখানে আপনি কতদিন আছেন?

বছর ষোল হবে। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই দাদা এখানে আমাকে নিয়ে এসে রেখেছেন—বলতে বলতে গান্ধারী দেবীর চোখের পাতা দুটো যেন অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে।

আপনারা কয় বোন?

আমি আর কুন্তী।

কুন্তী দেবীও কি এখানে আছেন?

না, সে বহুদিন আগে মারা গেছে, তার একমাত্র ছেলে ঐ শকুনি।

শকুনি! ঠিক তো, শকুনিবাবুকে দেখছি না! তা তিনি কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দালাল সাহেব বলে ওঠেন।

ডাঃ সমর সেনেরও শকুনির কথা সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তার সেই কথা, আজ্ঞে। মাতুল দুর্যোধনের ভাগিনেয় শকুনি।

দুঃশাসন চৌধুরী হঠাৎ বলে ওঠেন, ডেকে আনব সে হতভাগাটাকে দালাল সাহেব?

না, আপনি বসুন। ডাকা যাবে'খন। কিরীটী শান্ত স্বরে জবাব দিল এবং গান্ধারী দেবীর দিকে অতঃপর আবার তাকিয়ে বললে, আচ্ছা গান্ধারী দেবী, আপনার মেয়ে রুচিরার বিয়ের কোন চেষ্টা চরিত্র করছেন না?

রুচির বিয়ের সব কিছু তো একপ্রকার ঠিকই হয়ে আছে।

ঠিক হয়ে গেছে তাহলে?

হ্যাঁ।

কোথায়? কার সঙ্গে?

সমীরের সঙ্গে, আর সমীর তো এখন এই বাড়িতেই আছে।

সমীর! বিস্মিত কিরীটী যেন গান্ধারী দেবীকে পালটা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—সমীর বোস। ওদের কয়লার ব্যবসা আছে, অবস্থা খুব ভাল। দাদাই এ বিয়ের সব ঠিকঠাক করেছিলেন নিজে পছন্দ করে।

কিরীটী এবারে দুঃশাসন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, কাউকে পাঠিয়ে দুঃশাসনবাবু সমীরবাবুকে একবার ডেকে আনুন না দয়া করে এখানে।

নিশ্চয়ই। বলে দুঃশাসন চৌধুরী একজন ভৃত্যকে তখুনি সমীরকে ডেকে দিতে বললেন।

কিরীটী আবার গান্ধারী দেবীর দিকে ফিরে প্রশ্ন শুরু করে, আচ্ছা গান্ধারী দেবী, আপনি আর রুচিরা দেবী কি একই ঘরে শোন?

না। পাশাপাশি দুটো ঘরে দুজনে শুই, তবে দু'ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য মাঝখানে একটা দরজা আছে।

রুচিরা দেবী যখন আপনাকে গিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ দেন আপনি জানেন কিছু? আপনি কি ঐ সময় জেগে ছিলেন?

না। ঘুমিয়ে ছিলাম। তাছাড়া ঘুম আমার চিরদিনই একটু বেশী গাঢ়। ডাকাডাকি না করলে বড় আমার একটা ঘুম ভাঙে না।

তাহলে রুচিরা দেবীই—মানে আপনার মেয়েই আপনাকে ডেকে তুলেছেন ঘুম থেকে?

হ্যাঁ।

আপনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আপনাকে তিনি ঠিক কি কথা বলেছিলেন আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ, রুচি বললে দাদাকে নাকি কে ছোরা মেরে খুন করেছে।

তা নয়, আমি জানতে চাই, ঠিক রুচিরা দেবী আপনাকে কি কথা বলেছিলেন? মনে করে বলুন।

রুচি বলেছিল—

হ্যাঁ বলুন—ঠিক তিনি কি কথাগুলো আপনাকে বলেছিলেন?

ও বলেছিল, মা শীগগিরী এস। বড় মামাবাবু নাকি খুন—

আর কিছু তিনি বলেননি ?

না।

আচ্ছা আর একটা কথা, ইদানীং কিছুদিন ধরে যে রায়বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল আজ রাত চারটের সময় কেউ তাঁকে হত্যা করবে, এ কথাটা কি আপনি জানতেন ? মানে আপনি কি শুনেছেন তাঁর মুখ থেকে কখনও ?

হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি।

হুঁ, আচ্ছা আর দুটি প্রশ্ন কেবল আপনাকে আমি করতে চাই গান্ধারী দেবী। তারপর একটু থেমে বলে, বলতে পারেন রায়বাহাদুরের কেন ইদানীং ধারণা হয়ে গিয়েছিল ঐ রকমের একটা যে তাঁকে সকলে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে ?

না। বলতে পারি না, আমার তো মনে হয় এমন কোন কারণই থাকতে পারে না। তাছাড়া তাঁকে এ বাড়ির মধ্যে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা কেউ কেনই বা হত্যা করতে যাবে ! দাদাও যেমন সকলকে ভালবাসতেন, সকলেও তেমনি দাদাকে ভালবাসত।

হুঁ। আচ্ছা আপনার দাদা রায়বাহাদুরের কোন উইল ছিল বলে জানেন বা কিছু কখনও শুনেছেন ?

হ্যাঁ, যতদূর জানি দাদার বোধ হয় একটা উইল আছে।

সে উইল সম্পর্কে অর্থাৎ সে উইলের মধ্যে কি লেখা আছে বা না আছে, সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন ?

না।

আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন।

গান্ধারী দেবী নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অতঃপর কিরীটী পুলিস-সুপার দালাল সাহেবের সঙ্গে অন্যের অশ্রুতভাবে কিছুক্ষণ যেন কি মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করে।

এবং মধ্যে মধ্যে দালাল সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

বাইরে আবার পদশব্দ শোনা গেল।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আটাশ-উনত্রিশ বৎসরের একজন সুশ্রী যুবক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। যুবকের পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও গায়ে জড়ানো একটা পাতলা কমলা-লেবু রংয়ের কাশ্মীরী শাল।

মাথায় বিস্রস্ত কেশে ও চোখে-মুখে সুস্পষ্ট একটা নিদ্রাভঙ্গের ছাপ যেন তখনও লেগে আছে।

দুঃশাসন চৌধুরীই তাকে সর্বাগ্রে আহ্বান জানালেন, এস সমীর। তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপার কি? হঠাৎ উদ্বিগ্ন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বারেকের জন্য দুঃশাসন চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে সমীর ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

শোনেননি কিছু?

না তো!

খুবই দুঃসংবাদ, দাদা খুন হয়েছেন।

খুন! যেন একটা আর্ত চিৎকারের মতই শব্দটা সমীরের কণ্ঠ হতে নির্গত হয়।

হ্যাঁ। দাদাকে কে যেন খুন করেছে।

আপনারই নাম সমীর বোস? ঐ সময় কিরীটী বাধা দেয়।

কিরীটীর প্রশ্নে সমীর মুখ তুলে তাকায়।

হ্যাঁ। আপনি?

আমার নাম কিরীটী রায়। এ কদিন আমি এখানে আছি, কিন্তু কই আপনাকে তো আমি দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

আমি তো আজই রাত আটটার গাড়িতে কলকাতা থেকে এসেছি।

ও:!

ডা: সমর সেন সমীর বোসকে চিনতে পেরেছিলেন।

এই ঘরের মধ্যে ঢুকে দুঃশাসন চৌধুরী ও ডা: সানিয়ালের সঙ্গে সমীর বোসকেই তিনি দেখেছিলেন।

কিরীটী আবার বলে, বলুন সমীরবাবু, কতক্ষণ এ ঘরে ছিলেন আপনি আজ রাত্রে?

সমীর চেয়ারের ওপরে উপবেশন করল। এবং মৃদুকণ্ঠে বললে, রাত তিনটে পর্যন্ত তো আমি এই ঘরেই ছিলাম। ডা: সেন আসবার পর আমি শুতে যাই।

আপনারও তো শুনেছি কয়লার খনি আছে, তাই না মি: বোস?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ঝরিয়াতে ও সিঁদুরাতে।

রায়বাহাদুরের ভাগ্নী রুচিরা দেবীর সঙ্গে তো আপনার বিয়ের সব কথাবার্তা হয়ে গেছে, তাই না?

কথাবার্তা হয়েছে বটে একটা, তবে এখনও final কিছুই স্থির হয়নি।

রুচিরা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় নিশ্চয়ই আছে?

হ্যাঁ।

কত দিনের পরিচয় ?

তা অনেক দিনের হবে। কলেজের একটা ফাংশনে বছরখানেক আগে রুচির সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

একটা কথা মিঃ বোস, ঐ বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তার জন্যই কি আপনি এখানে এসেছেন কাল ?

না। রায়বাহাদুরের একটা মাইন আমি কিনব, কয়েক মাস যাবৎ কথাবার্তা চলছিল। সেই সম্পর্কেই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষ করে এবারে আমার এখানে আসা।

কথাবার্তা কিছু হয়েছিল সে সম্পর্কে ?

হ্যাঁ। রাত্রেই সব ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। সইও হয়ে গিয়েছে, এখন কেবল রেজেষ্ট্রী করা বাকি।

আপনি এখান থেকে একেবারে সোজা আপনার ঘরেই গিয়েছিলেন, তাই না মিঃ বোস ?

হ্যাঁ। বড্ড ঘুম পাচ্ছিল তাই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আপনার সঙ্গে রায়বাহাদুরের ব্যবসা ছাড়া আর অন্য কোন কথা হয়েছিল কি মিঃ বোস ?

না।

রায়বাহাদুর যে গত রাত্রে ভোর চারটের সময় নিহত হবেন, সে ধরনের কোন কথাও আপনাকে তিনি বলেননি ?

না।

চাকর কে আপনাকে ডাকতে গিয়েছিল ?

কৈরালাপ্রসাদ।

আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন মিঃ বোস। তবে একটা অনুরোধ, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আপনি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

বেশ।

সমীর বোস অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী এবারে দালাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, মৃতদেহটা তাহলে ময়না তদন্তের জন্য সিভিল সার্জেনের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

হ্যাঁ, সেটা করতে হবে বৈকি। দালাল সাহেব বলেন, নীচে গাড়িতে আমার এ. এস. আই. আছে মিঃ মিত্র, তাকেই ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দালাল সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ছয়

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে।

ঘরের বন্ধ জানলাগুলো খুলে দিতেই প্রথম ভোরের স্নিগ্ধ আলো ঘরের মধ্যে এসে অবারিত প্রসন্নতায় যেন চারিদিক ভরিয়ে দেয়।

পুলিসের গাড়িতে করেই ইতিমধ্যে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়ে গিয়েছে।

দুঃশাসন চৌধুরী, দালাল সাহেব, ডাঃ সানিয়াল ও ডাঃ সমর সেন ব্যতীত সকলকেই কিরীটী বিদায় দিয়েছে।

কিরীটী তার ঘরে বসে কথা বলছিল দুঃশাসন চৌধুরীর সঙ্গে।

রুচিরা দেবীকে তাহলে আপনিই রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদটা দিয়েছিলেন, মিঃ চৌধুরী ?

নিশ্চয়ই না। সত্যি, আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না এত বড় ডাহা মিথ্যে কথাটা মেয়েটা বলে গেল কি করে!

দালাল সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, রুচিরা দেবীর সঙ্গে আপনাদের কোন মনোমালিন্য নেই তো দুঃশাসনবাবু ?

একটা পুঁচকে ফাজিল প্রকৃতির মেয়ের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কি কারণ থাকতে পারে বলুন তো দালাল সাহেব! চিরটাকাল গান্ধারী আর তার স্বামী হৃষিকেশ দাদার ঘাড়ে বসে খেয়েছে। হৃষিকেশের সঙ্গে গান্ধারীর বিয়েতে মোটেই আমার মত ছিল না। এককালে ওরা ধনী ছিল কিন্তু হৃষিকেশের সঙ্গে যখন গান্ধারীর বিয়ে হয় তখন ওদের দুবেলা ভাল করে আহারও জুটত না। থাকবার মধ্যে ছিল পৈতৃক আমলের একটা নড়বড়ে পুরনো বাড়ি আর দেহে ব্যাধি-দুষ্ট রূপ—

ব্যাধি-দুষ্ট রূপ!

তাছাড়া কি! ঐ রূপই ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল অতীত ধনদৌলতের মিথ্যে উগ্র একটা অহঙ্কার। এবারে এসে যখন দেখলাম এখনও ওরা দাদার ঘাড়েই চেপে বসে আছে, দাদাকে বলেছিলাম ওদের একটা ব্যবস্থা করে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে; তা দাদা কি আমার কথা শুনলেন!

আচ্ছা এবারে আপনি তাহলে যেতে পারেন দুঃশাসনবাবু।

দুঃশাসন চৌধুরী ঘর থেকে চলে গেলেন কিরীটীর অনুমতি পেয়ে।

একটু চা পেলে মন্দ হত না—কিরীটী বলে ঐ সময়।

ডাঃ সানিয়াল বললেন, চলুন না আমার ঘরে।

তাই চলুন।

কিরীটী, দালাল সাহেব, ডাঃ সানিয়াল ও ডাঃ সেন অতঃপর সকলে ডাঃ সানিয়ালের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

ডাঃ সানিয়াল ইলেকট্রিক স্টোভে কেতলীতে জল চাপিয়ে দিলেন।

হঠাৎ কিরীটী বলে, আপনারা বসুন, আমি দু'মিনিটের মধ্যে আসছি। চা হতে হতেই আমি এসে পড়ব।

কিরীটী কথাটা বলে ডাঃ সানিয়ালের ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে কি ভেবে যেন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

শকুনি ঘোষ।

একবার শকুনির খোঁজটা নেওয়া দরকার। শকুনির ঘরটা কিরীটীর চেনা।

দোতলারই শেষ প্রান্তের ঘরটায় শকুনি থাকে।

কিরীটী বারান্দা অতিক্রম করে শকুনির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঘরের দরজা বন্ধ। কি ভেবে হাত দিয়ে ঈষৎ ধাক্কা দিতেই দুয়ার খুলে গেল - দরজা ভেজানো ছিল।

মাঝারি আকারের ঘরটি। খোলা জানলাপথে ভোরের পর্যাপ্ত আলো ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে।

সেই আলোয় কিরীটী দেখল, অদূরে শয্যার ওপরে শকুনি অকাতরে তখনও ঘুমোচ্ছে।

সত্যিই শকুনি ঘুমোচ্ছিল। সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা। একটা ছন্নছাড়া শ্রীহীন বিপর্যয়ের মধ্যে যেন পরম নির্বিকার ভাবেই একান্ত নিশ্চিন্তে অঘোরে নিদ্রাভিভূত শকুনি ঘোষ। বাড়ির মধ্যে যে কিছুক্ষণ মাত্র পূর্বে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে—ওর নিদ্রায় তাতে কোন ব্যাঘাতই ঘটেনি।

পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে শকুনি ঘোষ। গায়ের ওপরে একটা কম্বল চাপানো।

ঘরের একধারে একটা চেস্ট-ড্রয়ার, কপাট দুটো তার খোলা।

একরাশ জামাকাপড় এলোমেলোভাবে সেই চেস্ট-ড্রয়ারটার মধ্যে স্তূপীকৃত করা আছে।

একটা বেহালা দেওয়ালের গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে।

ঘরের এক কোণে একটা জলের কুঁজো এবং তার আশপাশের মেঝে জলে যেন থৈ থৈ করছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

হঠাৎ নজরে পড়ে, একটা ব্যবহৃত ধুতি ও একটা মলিন তোয়ালে ঘরের কোণে পড়ে আছে।

কিরীটী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিদ্রিত শকুনির শয্যার একেবারে সামনেটিতে এসে দাঁড়ায়।

আবার কি ভেবে সেখান থেকে এগিয়ে গেল—যেখানে ক্ষণপূর্বে তার নজরে পড়েছিল একটা ব্যবহৃত ধুতি ও মলিন একখানা তোয়ালে।

ঈষৎ নিচু হয়ে কিরীটী মেঝে হতে প্রথমে তোয়ালেটা তুলে নিল হাতে।

স্থানে স্থানে তোয়ালেটা তখনও ভিজে বলে মনে হয় কিরীটীর। বুঝতে কষ্ট হয় না তার, রাতেই কোন একসময় ঐ তোয়ালেটা নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে তোয়ালেটা কিরীটী চোখের সামনে মেলে ধরে পরীক্ষা করতে থাকে।

সহসা কিরীটীর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল চকিতে। তোয়ালের সিক্ত অংশগুলিতে একটা মৃদু লালচে আভা যেন।

সিক্ত অংশের ঈষৎ লালচে আভা যেন কিসের এক ইঙ্গিত দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই সিক্ত অংশগুলি পরীক্ষা করে একসময় আবার কিরীটী তোয়ালেটা ফেলে ধুতিটা হাতে তুলে নিল।

তোয়ালেটার মত অতঃপর ধুতিটাও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

ধুতিরও কোন কোন অংশ তখনও ঈষৎ সিক্ত বলেই মনে হয় এবং সেই সিক্ত অংশগুলিতে অস্পষ্ট একটা রক্তিমাভা যেন পরিষ্কার চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

কিরীটী অতঃপর একটা দুঃসাহসিক কাজ করে, ধুতির ঈষৎ লালিমাযুক্ত ভিজে অংশ হতে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিজের পকেটে রেখে দিল।

আর ঠিক ঐ সময় মৃদু একটা শব্দ ওর কানে প্রবেশ করতেই মুহূর্তে ও ফিরে তাকাল.

শকুনির ঘুম ভেঙেছে।

এবং নিদ্রাভঙ্গে শকুনি ইতিমধ্যে কখন যেন শয্যার ওপরে উঠে বসেছে।

এবং কেমন যেন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে শকুনি।

প্রথমটায় কিরীটীও যে একটু বিব্রত হয়ে পড়েনি তা নয়, কিন্তু অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই তাকে যেন উপস্থিত পরিস্থিতিতে সজাগ ও সক্রিয় করে দেয়।

মৃদু হেসে যেন কিছুই হয়নি এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে কিরীটী শয্যার ওপরে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে উপবিষ্ট শকুনির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, ঘুম ভাঙল মিঃ ঘোষ?

শকুনি মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ। আপনি?

আপনার খোঁজেই এসেছিলাম আপনার ঘরে। দেখলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন তাই—

আমার খোঁজে এসেছিলেন? কেন?

কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

কথা? কি কথা?

গতকাল রাত্রে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে হঠাৎ যে আপনি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন

আপনার আর দেখাই পেলাম না!

হ্যাঁ। বড্ড ঘুম পাচ্ছিল তাই ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কখন শুতে এসেছিলেন? কিরীটী দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে।

তা রাত তখন গোটা তিনেক হবে বোধ করি। আগের রাত্রে মামার ঘরে জেগে ছিলাম। মামার খবর কিছু জানেন—কেমন আছেন তিনি?

কিরীটী শকুনির প্রশ্নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শকুনির মুখের দিকে।

শকুনির মুখ একান্ত নির্বিকার। দু চোখের দৃষ্টি একান্ত সহজ ও সরল।

কোন পাপ দুরভিসন্ধি বা দুষ্কৃতির চিহ্নমাত্রও যেন তার চোখ-মুখের মধ্যে কোথাও নেই।

সহজ সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি।

মামার সেই দুঃস্বপ্নটা নিশ্চয়ই এখন আর অবশিষ্ট নেই—শকুনি বলে।

দুঃস্বপ্ন।

হ্যাঁ। শকুনি মৃদু হেসে বলে, তাঁর সেই দুঃস্বপ্নের কথা আপনি তো জানেন। কাল রাত্রে ঠিক চারটের সময় নাকি তিনি নিহত হবেন, তাঁর সেই ফোরকাস্ট—ভবিষ্যদ্বাণী নিজের মৃত্যু সম্পর্কে! আজ কয়েকদিন ধরে কি যে তাঁর মাথার মধ্যে চেপে বসেছিল আর সেজন্য কিই না এ ক'দিন ধরে তিনি করেছেন। এমন কি আপনাকে পর্যন্ত তিনি তাঁর পরিকল্পিত হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করবার জন্য ডেকে এনেছেন। তা এখন তাঁর সে ভয় কেটেছে তো?

মৃদু কণ্ঠে কিরীটী জবাব দিল, হ্যাঁ।

ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা মিঃ রায়, মামার মত একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁর মাথার মধ্যেও কি সব উদ্ভট কল্পনা।

উদ্ভট কল্পনা? কিরীটী শকুনির মুখের দিকে তাকায়।

তাছাড়া আর কি বলি বলুন। কোন সেইন্ ম্যানের পক্ষে এটা চিন্তা করাও তো যায় না। এমন কথা কস্মিনকালেও শুনেছেন কখনও যে মানুষ তার হত্যার কথা পূর্বাহ্লেই জানতে পেরেছে!

হঠাৎ যেন কিরীটীর কণ্ঠস্বরে প্রত্যুত্তরটা বজ্রের মতই ঘোষিত হল, গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী বলে, শকুনিবাবু, দুঃস্বপ্নই হোক বা অন্য কিছুই হোক নিষ্ঠুর নির্মম সত্য হয়েই ব্যাপারটা গতকাল রাত্রে কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

অ্যাঁ! কি বলছেন আপনি? কতকটা যেন একটা চাপা আর্ত কণ্ঠেই শকুনি ঘোষ কথা উচ্চারণ করে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, সত্যিসত্যিই গতকাল ঠিক রাত্রি চারটের সময়েই আপনার মামা রায়বাহাদুর

নিহত হয়েছেন।

বলেন কি মিঃ রায়! সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। তিনি নিহত হয়েছেন।

আমি—আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়! মামা নিহত হয়েছেন? কে—কে তাঁকে হত্যা করল?

নিহত যখন হয়েছেন নিশ্চয়ই তখন কেউ না কেউ তাঁকে হত্যা করেছে এ অবধারিত।

মামা নেই! সহসা শকুনি ঘোষের দুটি চোখ অশ্রুতে টলমল করে এবং কণ্ঠস্বরটা যেন বুজে আসে।

কিরীটী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শকুনি ঘোষের মুখের দিকে, অশ্রুপ্লাবিত তার দুটি চোখের দিকে।

বেদনাক্লিষ্ট অশ্রুসিক্ত দুটি চোখের দৃষ্টি ও সমগ্র মুখখানি যেন সত্যিই বিষণ্ণ-কাতর একটি অনির্বচনীয় ভাবাবেগে নিবিড় হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুরের হত্যাসংবাদটা যে একান্ত মর্মান্তিক ভাবেই শকুনি ঘোষকে একটা আঘাত দিয়েছে সে বিষয়ে যেন কোন সন্দেহ তার আর থাকে না।

সহসা শকুনি ঘোষ দু'হাতে মুখটা ঢেকে বোধ হয় অদম্য ক্রন্দনের বেগকে রোধ করবার প্রয়াসে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

কিরীটী চেয়ে থাকে কেবল শকুনি ঘোষের মুখের দিকে।

অনেক প্রশ্নই তার মনের মধ্যে ঐ মুহূর্তে আনাগোনা করছিল।

কিন্তু সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকে যেন।

কারণ কিরীটীর ইচ্ছে কিছু প্রশ্ন তার দিক থেকে উচ্চারিত না হয়ে শকুনির দিক থেকেই প্রথমে আসুক।

যা বলবার শকুনিই স্ব-ইচ্ছায় প্রথমে বলুক, তারপর যা বলবার সে বলবে।

ধীরে ধীরে শকুনি নিজেকে যেন কিছুটা সামলে নেয় এক সময়।

তারপর ধীরে ধীরে মুখ থেকে হাত সরিয়ে যখন কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় তখনও তার অশ্রুসিক্ত চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা মর্মঘাতী বেদনাই প্রকাশ পাচ্ছিল।

সত্যি মিঃ রায়, এখনও যেন আমি ভাবতেই পারছি না এত বড় একটা দুর্ঘটনা সত্যি-সত্যিই ঘটে গেছে। উঃ, কি ভয়ানক! মামা নেই? মামাকে হত্যা করা হয়েছে, এ যেন এখনও আমার কল্পনাতেও আসছে না।

কিন্তু যা হবার, যতই মর্মান্তিক বা দুঃখের হোক ঘটে গিয়েছে মিঃ ঘোষ। এখন যদি আমরা সেই হত্যাকারীকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে পারি, তবেই না আমাদের দুঃখের কিছুটা সান্ত্বনা মিলবে!

হত্যাকারীকে ?

হ্যাঁ। হত্যাকারীকে যেমন করে হোক আমাদের ধরতেই হবে।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তুই নেই মিঃ ঘোষ। হত্যাকারীকে আমরা ধরবই, তবে তাকে ধরতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের যে বস্তুটি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে পরস্পর আমরা পরস্পরের সহযোগী না হলে আপনার মামা রায়বাহাদুরের নিষ্ঠুর মৃত্যুরহস্যের কোন কিনারাই করতে পারব না জানবেন।

কিরীটীর কথায় শকুনি কোন জবাবই দেয় না, নিঃশব্দে বসে থাকে সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আবার একসময় কিরীটীই কথা বলে, মিঃ ঘোষ ?

অ্যাঁ! শকুনি যেন চমকে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

এ বাড়ির—মৃত রায়বাহাদুরের সমস্ত আত্মীয়-পরিজন আপনাদের সকলের সাহায্যই আমি চাই শকুনিবাবু।

সাহায্য!

হ্যাঁ, সাহায্য। এ হত্যারহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে আপনারা সকলেই যে যতটুকু জানেন সমস্ত কথা অকপটে বলে আমাকে যদি না সাহায্য করেন, বুঝতেই পারছেন আমার পক্ষে এ রহস্যের কিনারা করা কতখানি কষ্টকর হবে।

কিন্তু কি ভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি মিঃ রায় ? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ?

একটা কথা আপনার জানা দরকার শকুনিবাবু, আপনার মামা রায়বাহাদুরকে বাইরে থেকে কেউ এসে হত্যা করেনি বলেই আমার ধারণা।

কিরীটীর কথায় শকুনি ঘোষ যেন দ্বিতীয়বার চমকে ওঠে।

এবং বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, কি বলছেন আপনি মিঃ রায় !

ঠিকই বলছি। বাইরে থেকে কেউ এসে তাঁকে হত্যা করেনি।

তার মানে আপনি বলতে চান—

তাই বলতে চাই শকুনিবাবু, এ বাড়ির মধ্যেই কেউ-না-কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

সত্যিই আপনি একথা বিশ্বাস করেন মিঃ রায় ?

করি। এবং আমার বিশ্বাস যে মিথ্যা নয় শীঘ্রই তা প্রমাণিতও হবে।

কেউ এ বাড়িরই বলতে ঠিক আপনি কাকে মীন করছেন মিঃ রায়, মানে কে ঐ নিষ্ঠুর হত্যার জন্য দায়ী ?

বলতে দুঃখ ও লজ্জাই হচ্ছে আমার মিঃ ঘোষ। এই বাড়ির মধ্যে যাঁরা রায়বাহাদুরের আত্মীয় বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যেই কেউ-না-কেউ সুনিশ্চিত ভাবে এ কাজ করেছেন।

আমি! কথাটা যেন কতকটা অজ্ঞাতেই নিজের কণ্ঠ হতে শকুনির বের হয়ে আসে।

হ্যাঁ, আপনিও করতে পারেন বইকি।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! শকুনি যেন আর্তকণ্ঠে একটা চিৎকার করে ওঠে।

কিছুই অসম্ভব বলছি না মিঃ ঘোষ। আপনার পক্ষেও রায়বাহাদুরকে হত্যা করা এতটুকুও অসম্ভব বলে আমি মনে করি না। অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এর পর শকুনি ঘোষ কিছুক্ষণ যেন ফ্যালফ্যাল করে একান্ত বোকার মতই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটি কথাও যেন উচ্চারণ করতে পারে না।

একটি শব্দও কিছুক্ষণ যেন তার কণ্ঠ হতে বের হয় না।

কিরীটী বলে, মানুষ স্বার্থের খাতিরে কখন যে কি করতে পারে আর না পারে, সে মানুষও নিজে অনেক সময় বোধ হয় চিন্তাও করতে পারে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না মিঃ ঘোষ। জানেন না তো আপনি, এ পৃথিবীটাই একটা বিচিত্র জায়গা। সময় সময় তুচ্ছ —অতি তুচ্ছ প্রয়োজনের তাগিদে আজও সভ্যজগতের মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিতে পারে আমি বহুবার স্বচক্ষে দেখেছি। যাক সে কথা। এখন আপনি যদি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন তবে সুখী হব। ডাঃ সান্যালের ঘরে আমাকে এখুনি আবার যেতে হবে। তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বলুন কি জানতে চান? নিস্তেজ নিম্নকণ্ঠে শকুনি ঘোষ প্রত্যুত্তর দিল।

সাত

ব্যস্ত হবেন না মিঃ ঘোষ, আপনি বসুন ঐ খাটে।

শকুনি ধীরে ধীরে তার খাটের ওপর বসে। কিরীটী তখন প্রশ্ন শুরু করে।

এবারে বলুন, কাল রাত্রে ঠিক কটার সময় আপনি শুতে আসেন?

রাত তখন গোটা তিনেক হবে সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে বললাম।

আপনি আমার মুখ থেকে আপনার মামার হত্যার সংবাদ শোনবার পূর্ব পর্যন্ত তাহলে সত্যিই কিছুই শোনেননি বা জানতে পারেননি ঐ সম্পর্কে, এই কি সত্যি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আপনি বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কাল রাত্রে?

কিরীটীর প্রশ্নে শকুনি ঘোষ প্রথমটায় কেমন যেন একটু ইতস্তত করে, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম আসেনি। তবে বেশীক্ষণ জেগে যে ছিলাম না এও ঠিক।

হুঁ। সেই সময় কেউ আপনার ঘরে আসেনি ?

শকুনি আবার কিছুক্ষণ যেন চুপ করে থাকে, একটু বিব্রত ও চিন্তিত সে। কিরীটী চেয়ে আছে শকুনির মুখের দিকে।

এবং তারপর যেন কতকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই শকুনি বলে, না।

আবার কিরীটী কথাটার যেন পুনরুক্তি করে, কেউ আসেনি ঠিক বলছেন ?

তাই।

ঠিক আপনার মনে আছে ?

হ্যাঁ।

বাইরে ঠিক ঐ সময় যেন একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন এই ঘরের দিকেই আসছে মনে হল।

কিরীটী ঘরে ঢুকেই ভেতর থেকে ঘরের কপাট দুটো ভেজিয়ে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই প্রায়-বন্ধ কপাটের দিকে চোখ তুলে তাকাল কিরীটী।

সহসা প্রায়-বন্ধ কপাট দুটি খুলে গেল এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দ্বারপথে যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল তার দিকে তাকিয়ে কিরীটী যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়।

কেবল আগন্তুককে দেখেই কিরীটী ততটা বিস্মিত হয়নি, যতটা হয়েছিল আগন্তুকের সমগ্র চোখেমুখে একটা ভীতি ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত চাঞ্চল্য দেখে।

আগন্তুক বোধ হয় কক্ষে প্রবেশ করেই কিরীটীকে দেখতে পায়নি, কারণ কিরীটী ঘরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়।

সেকো, শুনেছিস কি সর্বনাশ হয়ে গেছে !

একরাশ উৎকণ্ঠা আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে যেন ঝরে পড়ে।

কিরীটী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আরও একটু পিছিয়ে গেল।

আগন্তুক কিরীটীকে তখনও দেখতে পায়নি। বলে, তোরা কেউ বিশ্বাস করিসনি বটে তবে এ যে হবে তা কিন্তু আমি প্রথম থেকে দাদার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর এও তো জানা কথা এ কার কাজ—

আগন্তুকের বাকি কথাগুলো শেষ হল না, উপবিষ্ট নির্বাক স্থিরদৃষ্টি শকুনির দিকে চেয়ে এতক্ষণে বোধ হয় কেমন একটু মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে পাশের দিকে তাকাতেই অদূরে দণ্ডায়মান নির্বাক কিরীটীর স্থির দুটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সঙ্গে নিজের চোখের দৃষ্টি মিলিত হয়ে গেল।

মুহূর্তে বক্তার সমগ্র শরীরের স্নায়ু ও উপস্নায়ু দিয়ে একটা তীব্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বুঝি খেলে গেল।

কথাটা যা বলছিলেন গান্ধারী দেবী, হঠাৎ বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন ?

কিরীটী প্রশ্ন করে।

মৃত রায়বাহাদুরের অপরূপ সুন্দরী বিধবা ভগিনী গান্ধারী দেবীই আগন্তুক।

মুহূর্তে যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, প্রচণ্ড একটা বৈদ্যুতিক শক্তি নিমেষে সমগ্র স্নায়ুতে আঘাত দিয়ে গান্ধারী দেবীর সমস্ত বাক্ ও বোধশক্তিকে যেন মুহূর্তে হরণ করেছে।

গান্ধারী দেবী যেন প্রাণহীন একটা পাথরে পরিণত হয়েছেন অকস্মাৎ।

মূক অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গান্ধারী দেবী কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন গান্ধারী দেবী। আপনার যা বলবার বা শকুনিবাবুকে যা বলতে এসেছিলেন নির্ভয়ে বলুন। কোন ভয় নেই আপনার, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে—বিশ্বাস করুন, তৃতীয় কোন ব্যক্তিই এসব কথা জানতে পারবে না।

গান্ধারী দেবী তথাপিও কিন্তু নিরুত্তর।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন গান্ধারী দেবী কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন গান্ধারী দেবী। ঐ চেয়ারটায় বসুন। কিরীটী পুনরায় আহ্বান জানায় গান্ধারী দেবীকে।

অত্যন্ত সহজ ভাবে কিরীটী কথাগুলো উচ্চারণ করলেও কণ্ঠস্বরে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশের সুর যেন প্রকাশ পায়।

এ শুধুমাত্র অনুরোধই নয়, আদেশও।

এবং সে আদেশকে লঙ্ঘন করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

তথাপি কিন্তু গান্ধারী দেবী নিশ্চুপ, পাষাণ-প্রতিমার মতই যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিরীটী আবার বলে স্থির অপলক দৃষ্টিতে গান্ধারী দেবীর চোখের দিকে চেয়ে, বসুন গান্ধারী দেবী!

এবারে সত্যিসত্যিই গান্ধারী দেবী কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন সামনের চেয়ারটার ওপর গিয়ে বসলেন।

হ্যাঁ বলুন এবারে—একটু আগে যা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন!

কি বলব? ক্ষীণ কণ্ঠে এতক্ষণে গান্ধারী দেবী কথা কটি বলেন।

রায়বাহাদুরের হত্যাকারী সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে—আরও সোজা করে বলতে গেলে বলা যায়, নিশ্চয়ই আপনি কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন, তাই নয় কি?

সন্দেহ করেছি!

হ্যাঁ। একটু আগে তো সেই কথাই শকুনিবাবুর কাছে আপনি বলতে বলতে থেমে গেলেন।

আমি—

শুনুন গান্ধারী দেবী, আপনি নিজেই আপনার কথার ফাঁদে আটকে পড়েছেন। এখন আর উপায় নেই। কিন্তু তারও আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কি?

আপনি নিশ্চয়ই চান যে রায়বাহাদুর—আপনার ভাইকে যে অমন নিষ্ঠুরভাবে গতকাল হত্যা করেছে, সেই নৃশংস শয়তান হত্যাকারী ধরা পড়ুক এবং তার সমুচিত শাস্তিবিধান হোক।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই।

এবং এও আপনারা সকলেই জানেন সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারের মীমাংসাই আমি করতে চাই!

হ্যাঁ।

এও নিশ্চয়ই তাহলে স্বীকার করবেন যে, নিষ্ঠুর ঐ হত্যারহস্যের মীমাংসা করতে হলে আমাকে আপনাদের—এ বাড়ির সকলেরই সাহায্যের প্রয়োজন অল্প-বিস্তর? অন্যথায় ব্যাপারটা একটু জটিলই হবে?

কিন্তু—

তাহলে বলুন আপনি যা জানেন। অকপটে সব আমার কাছে খুলে বলুন—কিছু গোপন করবেন না!

কি বলব?

কাকে আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করছেন খুলে বলুন?

আবার গান্ধারী দেবী নিরুত্তর, চোখেমুখে তাঁর যেন সুস্পষ্ট একটা চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে।

বলুন—চুপ করে থাকবেন না!

ক্ষমা করবেন কিরীটীবাবু, আমি—মানে আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। শকুনিকে আমি ঠিক তা বলতে চাইছিলাম না—

বিচিত্র একটা হাসি যেন কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্তে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। এবং কৌতুকে চোখের তারা দুটি ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল।

গান্ধারী দেবী, আমি কিরীটী রায়! আমার সত্যিকারের পরিচয়টা হয়ত আপনার জানা নেই, নচেৎ বুঝতে পারতেন মানুষের মনের গোপন কথাকে টেনে বের করবার একটা শক্তি ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন। আপনার গলার স্বরকে আপনি মূক করে রাখলেও আপনার দুটি চক্ষু, স্থিরনিবদ্ধ দুটি ওষ্ঠ অনেক কিছুই এই মুহূর্তে আমার কাছে সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করছে। আপনি আপনার গত রাত্রের জবানবন্দিতে যে বলেছিলেন—আপনি

ঘুমিয়ে ছিলেন এমন সময় আপনার মেয়ে রুচিরা দেবী এসে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে আপনাকে রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদটা দেন, কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা আর কেউ না জানলেও আমি কিন্তু ঠিকই ধরেছিলাম গতকালই।

মিথ্যে! কথাটা উচ্চারণ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গান্ধারী দেবী কিরীটীর চোখের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মেলান।

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে। কিরীটীর দু চোখের দৃষ্টিতে আবার সেই শানিত ছুরির ফলার মতই তীক্ষ্ণতা ঘনিয়ে ওঠে।

এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়! পুনরায় প্রশ্ন করেন গান্ধারী দেবী।

হ্যাঁ, মিথ্যে। কারণ আমি জানি সে-সময় আপনি জেগেই ছিলেন এবং শুধু তাই নয়, পাশের ঘরে--মানে আপনার মেয়ের ঘরে কিছুক্ষণ পূর্বে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কথাই আপনার কানে গিয়েছিল।

এসব কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

মিথ্যে বা কল্পিত কিছুই বলছি না নিশ্চয়ই। সেটা অবশ্যই আমার চাইতেও আপনি ভালই বুঝতে পারছেন গান্ধারী দেবী।

কিন্তু আমার মেয়ে রুচিরাও কি আপনাকে বলেনি যে সে এসে আমাকে ঘুম হতে উঠিয়ে—

হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে ঘুম তো নয় সেটা আপনার গান্ধারী দেবী—বলতে পারেন ঘুমের ভান মাত্র।

চকিতে শকুনি ঘোষ একবার গান্ধারী দেবী ও একবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় ঐ সময়।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে কিন্তু সেটুকুও ফাঁকি দিতে পারে না।

কিন্তু কিরীটীর চোখে মুখে তার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

ঘুমের ভান! আমি ঘুমোইনি—ঘুমের ভান করে ছিলাম?

ঠিক তাই। কারণ ঐভাবে জেগে ঘুমোনোর হয়ত আপনার বহু সময়েই প্রয়োজন হয়, অবশ্য আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর পক্ষে সেটা না জানাই সম্ভব।

না জানাই সম্ভব!

হ্যাঁ। অন্যথায় নিশ্চয়ই রুচিরা দেবী আপনার সম্পর্কে সজাগ হয়ে থাকতেন এবং যথাবিহিত সতর্কতাও হয়ত অবলম্বন করতেন।

কিরীটীবাবু!

একটা রুক্ষ তীক্ষ্ণতা যেন গান্ধারী দেবীর কণ্ঠস্বরে ঐ মুহূর্তে প্রকাশ পায়।

গান্ধারী দেবী, কিরীটী রায়ের এই দু'জোড়া চোখ ছাড়াও আর এক জোড়া চোখ—

অদৃশ্যও বলতে পারেন, সদা এমন সতর্ক থাকে যে তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই খুব সহজসাধ্য নয়। শুনুন তবে, গতরাত্রে আপনি যখন রায়বাহাদুরের ঘরে উঠে এসেছিলেন সে সময় আপনার চোখের পাতায় কোথাও আপনার ক্ষণপূর্বে কথিত নিদ্রার বিন্দুমাত্রও আমি দেখতে পাইনি। শুধু তাই নয়, আপনার মাথার চুল ও বেশভূষায় এমন একটা নিখুঁত পারিপাট্য ছিল যা অন্ততঃ কোন সদ্য-নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না। বিশেষ করে যাঁকে একটু আগে ঘুম থেকে ডেকে তুলে একটা দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং যার জন্য অন্ততঃ তিনি পূর্বাহ্নে আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। আরও একটা ব্যাপার যেটা হয়ত আপনার ভাববারও প্রয়োজন হয়নি এবং আপনার নজর দেওয়ারও অবকাশ হয়নি, আপনি কাল যখন রায়বাহাদুরের ঘরে এসে প্রবেশ করেছিলেন, আপনার গায়ে একটা ফুলহাতা গরম-জামা ছিল। নিশ্চয়ই গরম-জামা গায়ে দিয়েও যেমন আপনি নিদ্রা যান না তেমনি ও ঘরে আসবার পূর্বেও অত বড় একটা দুঃসবাদ শোনবার পর গরম-জামাটা গায়ে দিয়ে আসবার কথাটাও আপনার মনে আসবার কথা নয় এবং স্বাভাবিকও নয়।

গান্ধারী দেবী কিরীটীর কথায় যেন সত্যিই একেবারে বোবা হয়ে যান।

তাহলেই এখন বুঝতে পারছেন তো কেন আমি আপনার নিদ্রা সম্পর্কে সন্দিহান?

এবারেও গান্ধারী দেবী কিরীটীর কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

গান্ধারী দেবী, মিথ্যে আপনি সব কথা আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করছেন এখনও!

সহসা এবারে গান্ধারী দেবী একটু যেন রূঢ় কণ্ঠেই জবাব দিলেন, আমি কিছুই জানি না কিরীটীবাবু। কেবল এইটুকু বলতে পারি, সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই মিথ্যে আপনি আমাকে জেরা করছেন।

যদি তাই হয়, তবে একটু আগে এই ঘরে ঢোকবার মুহূর্তে শকুনিবাবুকে যে কথাটা বলতে গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে এখানে দেখেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন—সে কথাটা কি? কি কথা ওঁকে বলতে যাচ্ছিলেন—সেটা অন্ততঃ জানতে পারি কি?

না।

যেন একটা রূঢ় কঠিন আঘাতের মতই 'না' শব্দটি কিরীটীর মুখের ওপর এসে পড়ে তাকেও নিশ্চুপ করে দিল।

ক্ষণকাল গভীর অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটী গান্ধারী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে, গান্ধারী দেবী, একটা কথা—সমীরবাবুর সঙ্গে সত্যিসত্যিই কি আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর বিবাহ-ব্যাপারটা স্থির হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ। ধীর কণ্ঠে গান্ধারী দেবী এবারে জবাব দিলেন।

আপনার নিশ্চয়ই এ বিবাহে খুব মত আছে ?

আছে।

আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর ?

কিরীটীবাবু, এটা সম্পূর্ণ আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে দাদার মৃত্যুর কোন সংস্পর্শ আছে বলেই আমি মনে করি না। অতএব একান্তই অবান্তর নয় কি প্রশ্নটা আপনার ?

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হলেও আমি এ প্রশ্নটার জবাব চাই গান্ধারী দেবী !

আর যদি না দিই ?

তাহলে বলব মিথ্যেই আপনি সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে জেদাজেদি করছেন, কারণ আপনি ঢাকবার বা গোপন করবার চেষ্টা করলে কি হবে আমি আগেই জেরা করে রুচিরা দেবীর কাছ থেকে তাঁর কথাতেই জেনেছি।

কি—কি জেনেছেন আপনি ? নিরতিশয় উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা যেন গান্ধারী দেবীর কণ্ঠস্বরে ও চোখেমুখে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বললাম তো, যা জানবার তাই জেনেছি।

কি জেনেছেন আপনি ? কি রুচিরা আপনাকে বলেছে ?

মাপ করবেন গান্ধারী দেবী, সেটা আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় ব্যাপার।

আপনি বলতে চান রুচি আপনাকে বলেছে যে সে সমীরকে পছন্দ করে না, বিবাহ সে করবে না ?

বললাম তো গান্ধারী দেবী, তিনি—রুচিরা দেবী আমাকে কি বলেছেন বা না বলেছেন বা আমি কি বলতে চাই বা না চাই সেটা প্রকাশ করতে আপনার কাছে আমি বাধ্য তো নই-ই, ইচ্ছুকও নই।

আমি বিশ্বাস করি না কিরীটীবাবু, রুচি ঐ ধরনের কোন কথা আপনাকে বলতে পারে আর যদি সে বলে থাকেও এ কথাটা যেন সে ভুলে না যায় যে, এখনও আমি তার মাথার ওপরে বেঁচে আছি। খুশিমত তাকে আমি চলতে দেব না।

হঠাৎ কিরীটী হেসে ফেলে এবং হাসতে হাসতেই বলে, গান্ধারী দেবী, এবারে আপনাদের কাছ থেকে আমি আপাততঃ বিদায় নেব। কারণ আমার কফি বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল সত্যিসত্যিই এতক্ষণে। আচ্ছা আসি—নমস্কার—

বলতে বলতে কিরীটী দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শকুনি ও গান্ধারী দেবী কিরীটীর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল।

আট

বাঈজী সেতারে ভৈরো আলাপ করছিল ও চাপা কণ্ঠে গুনগুন করে সুর ভাঁজছিল।

আর অবিনাশ চৌধুরী সেই ঘরের বিস্তৃত গালিচার ওপরে একটা জাপানী ঘাসের চটি পায়ে ইতস্তত পায়চারি করছিলেন এবং নিম্নস্বরে আপন মনে আবৃত্তি করছিলেন :

নারায়ণ! নারায়ণ বল কত বাকী
আর। শত পুত্রহারা কাঁদিছে গান্ধারী,
শত পুত্রবধূ তার! রক্ত শবে পরিকীর্ণ
কুরুক্ষেত্র ভূমি! অক্ষৌহিণী নারায়ণী
সেনা হয়েছে নিঃশেষ।

মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি পিছনে রেখে অবিনাশ চৌধুরী পায়চারি করছিলেন।

ভোরের প্রসন্ন আলো মুক্ত বাতায়নপথে ঘরের মধ্যে বিস্তৃত রক্তবর্ণ গালিচার উপরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

সহসা একসময় বাঈজীর দিকে ফিরে চেয়ে অবিনাশ চৌধুরী বলেন, মুন্নাবাঈ, এখন গান থাক্! আজকে তোমার বিশ্রাম—তুমি যাও।

ক্ষণেকের জন্য মাত্র অবিনাশ চৌধুরীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মুন্নাবাঈ নিঃশব্দে সেতারটা একপাশে গালিচার ওপরে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

খেয়ালী অবিনাশ চৌধুরীর বিচিত্র মতিগতির সঙ্গে সে বিশেষ পরিচিত।

এবং নিঃশব্দেই সে তার নির্দিষ্ট ঘরে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায়।

পাশেরই সংলগ্ন একটি নাতিপ্রশস্ত ঘর মুন্নাবাঈয়ের জন্য নির্দিষ্ট।

মুন্নাবাঈ তার ঘরে এসে প্রবেশ করল।

আধুনিক রুচিসম্মত ভাবে ঘরটি তার সুসজ্জিত।

মুন্নার সমস্ত অন্তরের মধ্যেই তখনও যেন ভৈরো রাগের একটা স্বর-মন্থন চলেছে।

প্রত্যুষের প্রসন্ন আলোয় সমস্ত অন্তর জুড়ে তার তখন যেন ভৈরো রাগের রঙ লেগেছে। জেগেছে সুর।

মেঝেতে বিস্তৃত পুরু গালিচার একপাশে রক্ষিত নিজের তানপুরাটা টেনে নিয়ে কোলের কাছে মেঝেতে গালিচার ওপরই বসে মুন্না বাঈজী।

তানপুরার তারে মৃদুমন্দ অঙ্গুলি চালনা করতে করতে সে গুনগুনিয়ে ওঠে—

ধন ধন সুরত কৃষ্ণ মুরারে
সুলছানা গিরীধারী
সব সুন্দর লাগে
অত পিয়ারী।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কখন ইতিমধ্যে একসময় যে রুচিরা বাঈজীর ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল তা সে টেরও পায়নি।

রুচিরা এ বাড়িতে বেশী একটা থাকে না।

সে কলকাতায় কলেজে পড়ে। মধ্যে মধ্যে ছুটিছাটায় কেবল কখনও বেড়াতে আসে, আবার ছুটি ফুরোলেই কলকাতায় ফিরে যায়।

এ বাড়ি সম্পর্কে তার এই কারণেই বোধ হয় এতটুকুও কৌতূহল কোনদিন ছিল না।

এ বাড়ির আবহাওয়া হতে শুরু করে এই বাড়ির লোকগুলিও যেন কেমন তার নিকট অদ্ভুত বিচিত্র বলে মনে হয়।

কেমন যেন একটা চাপা গুমোট ভাব, একটা বিকৃত শাসনের নাগপাশ যেন এই বাড়ির প্রাণকে চেপে রেখেছে অষ্টপ্রহর।

এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেক হতে স্বতন্ত্র, কেউই যেন কারও আপনার নয়।

কারও সঙ্গে কারও যেন বিন্দুমাত্রও মনের যোগাযোগ নেই। কারও জন্ম কারও যেন এতটুকু সমবেদনা স্নেহ বা ভালবাসা নেই।

মনে হয় কেমন প্রত্যেকেই যেন একটা কুৎসিত স্বার্থের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে এ বাড়ির আবহাওয়াকে বিষাক্ত ও ঘোলাটে করে রেখেছে।

কেউ কাউকে বিশ্বাস পর্যন্ত যেন করে না।

এবং যতবারই সেই কারণে রুচিরা এখানে এসেছে এবং যে কদিন থেকেছে, নিজেকে যেন এ বাড়ির সকল কিছু থেকে কতকটা ইচ্ছে করেই পৃথক করে রেখেছে, নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দিনগুলো কাটিয়েছে।

আর একটা কথা। এবাড়িতে এসে থাকাকালীন সময়ে তবুও কদাচিৎ কখনও অন্য সকলের ঘরে গেলেও এবং একটা-আধটা কথা কারও সঙ্গে বললেও, কেন যেন আজ পর্যন্ত ছুটিছাটা উপলক্ষে ইতিপূর্বে সে এ বাড়িতে যতবার এসেছে কোনবারই দাদু অবিনাশ চৌধুরীর মহলে সে প্রবেশ করেনি এবং সেই কারণেই বোধ হয় বাঈজীকে দেখেনি বা দেখতে পায়নি। অবিশ্যি বাঈজীর এ বাড়িতে এই প্রথম পদার্পণ নয়।

গতকাল প্রত্যুষে তাই সে যখন অন্দরের বাগানে বেড়াচ্ছিল, এক মুহূর্তের জন্ম দূর থেকে ভ্রমণরতা বাঈজীকে দেখেই সে যেন চমকে উঠেছিল।

চমকাবার অবিশ্যি কারণও ছিল।

মুখটা যেন কেমন দূর থেকেই চেনা-চেনা লেগেছিল।

কোথায় কবে যেন সে ঐ মুখটির সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিতা ছিলও।

কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

অবশেষে আর কৌতূহলকে দমন না করতে পেরে আজ খোঁজ করতে করতে বাঈজীর

ঘরে এসে নিজেই প্রবেশ করেছে।

বাঈজী তানপুরায় ভৈরো রাগ আলাপ করছিল।

আপন মনেই বাঈজী আলাপ করছিল, রুচিরা যে তার ঘরে এসে ঢুকেছে সে টেরও পায়নি।

চেয়েছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুচিরা বাঈজীর দিকে।

কণ্ঠস্বর ও বসবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত তার যেন কতই না পরিচিত!

কে—কে ঐ বাঈজী?

দাদুর গানবাজনার প্রচণ্ড নেশা আছে ও জানত এবং মধ্যে মধ্যে নাকি বাঈজীরা দাদুর কাছে গানের মুজরা নিয়ে আসে এ গৃহে দু-চার-দশ দিনের জন্য।

সে কারণে বাঈজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি সে, হয়েছিল গতকাল সন্ধ্যায় দূর থেকে উদ্যানে ভ্রমণরতা বাঈজীকে দেখে।

আলাপ শেষ হতেই তানপুরাটা কোলের কাছে নামিয়ে রেখে গুনগুন করে তখনও সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সামনের দিকে তাকাতেই বাঈজীর সামনে দর্পণে প্রতিফলিত ঠিক পিছনেই নিঃশব্দ দণ্ডায়মানা রুচিরার প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়তেই চমকে বাঈজী ফিরে তাকায়।

পরস্পরের সঙ্গে চোখোচোখি হল।

কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কথা বলে প্রথমে এবারে রুচিরাই, সাবিত্রী না?

এতক্ষণে রুচিরা চিনতে পেরেছে বাঈজীকে।

বাঈজী আর কেউ নয়, সাবিত্রী। বেথুনে ম্যাট্রিক পড়বার সময় তার সহপাঠিনী তো ছিলই, রুচিরার সঙ্গে হোস্টেলের একই ঘরে বাসও করেছিল সে কয়েক মাস।

অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা একদিন ছিল ওদের পরস্পরের মধ্যে।

রুচি!

এতক্ষণে বাঈজীরও কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

হ্যাঁ। আশ্চর্য! কিন্তু তুই এখানে? রুচিরা প্রশ্ন করে।

মৃদু হাসির একটা আভাস যেন খেলে যায় বাঈজীর ওষ্ঠের ওপরে, হ্যাঁ। আজ আমার পরিচয় আর সাবিত্রী নয়, আজ আমি মুন্না বাঈজী।

মুন্না বাঈজী!

হ্যাঁ। কিন্তু তুই এখানে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না রুচি! সাবিত্রী দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করে।

এটা তো আমার মামার বাড়ি। তুই তো জানিস মামাদের পয়সা ও দয়াতেই আমি মানুষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গিয়েছিলাম—কত দিনকার কথা। প্রায় তিন-চার বছর হবে, তাই না?

তা হবে বৈকি।

রায়বাহাদুর—যিনি গতকাল—

হ্যাঁ, তিনিই আমার মামা। আর অবিনাশ চৌধুরী—ওর কাকা হলেন আমার দাদু।

ও।

সাবিত্রী যেন হঠাৎ চুপ করে গেল।

খোলা বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে অতঃপর নিঃশব্দে বসে রইল কিছুক্ষণ সাবিত্রী।

রুচিরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তখন সাবিত্রী—মুন্না বাঈজীর দিকে।

সাবিত্রী!

তার সহপাঠিনী সাবিত্রী—যার রূপের ও কণ্ঠের খ্যাতি একদিন সমস্ত কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে হিংসার বস্তু ছিল!

লেখাপড়ায় সাবিত্রী কোন দিনই ভাল ছিল না তেমন, অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

কিন্তু তবু সারা কলেজ তাকে চিনত না এমন কেউ ছিল না, তার মধুক্ষরা কণ্ঠের জন্য।

নিঃশব্দে সাবিত্রী বসে আছে।

খুব প্রত্যুষেই বোধ হয় স্নান করেছে। পরিধানে সাদা মিলের নরুণপাড় একটা ধুতি। দু কাঁধের ওপর দিয়ে সিক্ত চুলের গোছা বুকের দু'পাশে বিলম্বিত।

কপালে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটি বোধ হয় শ্বেতচন্দনের টিপ।

সিঁথিতে বা কপালে এয়োতির চিহ্নমাত্রও নেই। অথচ সাবিত্রী তো বিবাহিতাই ছিল ওর যতদূর মনে পড়ে। ওর সমগ্র চোখেমুখে যেন একটা বিষণ্ণ করুণ দুঃখের ও ক্লিষ্ট যাতনার ছায়া।

রুচিরা আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকে, সাবিত্রী!

সাবিত্রী রুচিরার ডাকে যেন হঠাৎ চমকে ওঠে।

এবং অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলে এবারে, সাবিত্রীকে হঠাৎ আজ এই বেশে সামান্য এক বাঈজীর পরিচয়ে এতদিন পরে দেখে খুব চমকে গিয়েছিস, না? আয়, বোস। রুচিরার দিকে তাকিয়ে সাবিত্রী রুচিরাকে আহ্বান জানায়।

না। কিন্তু—

ও, তুই তো শুনেছিলি যে স্বামীর ঘরে যাবার পর সাবিত্রী আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল—

না।

শুনিসনি ? আশ্চর্য !

না, শুনিনি ।

আবার কিছুক্ষণ কতকটা যেন আত্মচিন্তায় বিভোর হয়েই সাবিত্রী নিঃশব্দে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে থাকে ।

হঠাৎ আবার সাবিত্রী কথা বলে, সত্যি ভাই, আমার নিজেরই কি এক এক সময় কম আশ্চর্য লাগে ! বাপ মা নাম রেখেছিল সাবিত্রী । দিদিমার মুখে খুব ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম, যমের গ্রাস থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সাবিত্রী হয়েছিল সতী-সীমন্তিনী, নারীকুলে ধন্যা গরবিনী । আর আমিও সাবিত্রী—স্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করে হয়েছি মুন্না বাঈজী ! আমিও নারীকুলে অনন্যা, কি বলিস ।

একটানা কথাগুলো বলে হাসতে লাগল সাবিত্রী । চোখেমুখে একটা নারকীয় জঘন্য উল্লাস যেন উপচে পড়তে থাকে ।

সাবিত্রীর কথায় রুচিরা যেন সত্যিই একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল ।

কি বলছিস তুই সাবিত্রী । স্বামীকে হত্যা করেছিস ?

হ্যাঁ । কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই হাত, এখনও এতে—ভাল করে চেয়ে দেখ হয়তো হত্যার রক্ত লেগে আছে ।

কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে যেন সাবিত্রী তাকিয়ে আছে রুচিরার দিকে ।

ঘৃণা, বিদ্বেষ, আক্রোশ সব কিছুই যেন সাবিত্রীর দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে ঐ মুহূর্তে একসঙ্গে ফুটে উঠেছে ।

দাঁড়া, দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে আসি—বলতে বলতে হঠাৎই যেন সাবিত্রী উঠে গিয়ে ঘরের দরজার কপাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল । এবং যেখানে বসেছিল সেইখানেই এসে বসল ।

সাবিত্রী আবার বলে, ভাগ্যি সাবিত্রীর রূপ ছিল—বোকা পুরুষগুলোর চোখ-ঝলসানো রূপ ছিল, নচেৎ এত বড় কোনদিন কি হতে পারতাম ! গরীবের ঘরে জন্মেছিলাম, কিন্তু সেই রূপের দৌলতেই তো ধনীর ঘরে বিকিয়ে গেলাম, সে-সব কথা তো তুই জানিসই ।

হ্যাঁ, কিন্তু—মৃদুকণ্ঠে কি বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল রুচিরা ।

রূপের দৌলতে ধনীর ঘরের বধূ হবার সৌভাগ্যটুকুই কেবল সেদিন আমি তোকে বলেছিলাম রুচি, কিন্তু সে ধনীর ঘরের বধূর দৈনন্দিনের পরবর্তী যে দুঃখ ও লাঞ্ছনার কাহিনী সেটা সেদিন তোকে আমি শোনাইনি ।

সাবিত্রী !

তাই । ধনীর পুত্রবধূ সাবিত্রীর কাহিনীই সেদিন তুই শুনেছিলি ভাই কিন্তু শোনানো হয়নি তোকে কেমন করে সেই বধূকে একদিন অনন্যোপায় হয়ে আজকের এই বাঈজীতে

রূপান্তরিত হতে হল।

রুচিরা চেয়ে থাকে সাবিত্রীর মুখের দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সাবিত্রী আবার বলতে শুরু করে :

উঃ! যখন ভাবি না সেদিনকার কথাগুলো, ঘৃণায় লজ্জায় আর ধিক্কারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তখন কি জানি কেন কলেজে পাঠিয়েছিল আমায়! খেয়াল—লম্পট, ধনী স্বামীর খেয়াল! আমায় কলকাতায় পড়তে পাঠালে। ছোট শহরের এক স্কুলে পড়ছিলাম, সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে কলকাতায় ভর্তি করে দিল বেথুনে। ধনীর খেয়াল কিনা তাই হঠাৎ একদিন ডাক এল আবার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার, পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে মধ্যেপথেই।

হ্যাঁ, মনে আছে পরীক্ষার মাত্র দিন কয়েক আগে তুই পরীক্ষা না দিয়েই স্বামীর ঘর করতে চলে গেলি।

স্বামীর ঘরই বটে। তবে ভেতরের ঘর নয়, বাইরের ঘর। স্বামীর বিলাসভবন বাগানবাড়িতে, নাচঘরে।

বলিস কি!

এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এবং সেই বাগানবাড়িতে গিয়েই শুনলাম বিবাহিতা হলেও স্বামীর গৃহের অন্দরমহলে প্রবেশের নাকি আমার কোন অধিকার নেই—আমি সেখানে অহেতুক অনাবশ্যক বোঝা মাত্র।

কেন? প্রশ্নটা না করে চুপ করে থাকতে পারে না রুচিরা, তোকেও তো তিনি বিয়েই করেছিলেন।

তা করেছিলেন বটে তবে ঘরে তাঁর প্রথম বিবাহিতা গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। আমার স্বামীর প্রথমা পত্নী। তাঁর সন্তানের জননী। তাঁর ছাড়পত্রে আগেই শীলমোহর পড়ে গিয়েছিল কিনা।

সে কি! তুই শুনিসনি কিছু বিয়ের সময় যে তাঁর আগের স্ত্রী বর্তমান ছিল!

গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত মা-বাপ আমার, তার ওপরে বিনা পণে এত বড় ঘরে এমন পাত্রে বিয়ে, তাঁরা হয়ত তাই আর কিছু শোনাটা প্রয়োজন মনে করেননি, কারণ জানবার কথা তো তাঁদেরই, আমার তো নয়। আমি তো তখন বাংলা দেশের বিয়ের কনে মাত্র। দেওয়া না-দেওয়ার ক্ষমতাটা তো ছিল তাঁদেরই হাতে। আইনগত জন্মস্বত্ব সেদিন তো তাঁদের হাতেই ছিল।

হুঁ। তারপর?

তারপর আর কি! ঘর যেখানে জলসাঘর, সেখানে গৃহস্থ বধূর পরিণতি কি হতে পারে এ তো সহজেই বুঝতে পারিস।

স্বামী হয়ে তোকে—

মুহূর্তে যেন সাবিত্রীর দুই চক্ষুর তারা রুদ্র তেজে জ্বলে ওঠে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, স্বামী! কাকে তুই স্বামী বলিস! যে তার নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে অনায়াসে লম্পটের ক্ষুধার অনলে সমর্পণ করতে পারে সে কি স্বামী? নাই বা হল সেটা আইনগত সিদ্ধ বিয়ে, তবু তো অগ্নিনারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখেই আমাদের বিয়েটা হয়েছিল। মন্ত্র ও সেই অনুষ্ঠানকে না হয় সে অস্বীকার করলে, কিন্তু দায়িত্ব নীতি বা রুচি বলে কি কিছু নেই? ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতই যেন একটা চাপা আক্রোশে ফুঁসতে থাকে সাবিত্রী।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছে যেন রুচিরা।

সাবিত্রী বলতে থাকে, কিন্তু আমিও তাকে ক্ষমা করিনি। অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছি। কিন্তু বাকি একজনকে এখনও খুঁজে সামনে পাইনি। সঙ্গীতপিপাসু সে, তাই গানের মুজরা নিয়ে বাগানবাড়িতে বাগানবাড়িতে গানের আসরে আসরে হানা আজও দিয়ে বেড়াচ্ছি, কারণ জানি একদিন-না-একদিন তার সন্ধান পাবই। সেই দিন—বলতে বলতে সহসা মুন্না বাঈজী কোমর থেকে একটা তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরি বের করে। ছুরির চকচকে অগ্রভাগটা যেন জিঘাংসায় হিল হিল করে ওঠে।

রুচিরা চমকে উঠে দু পা পিছিয়ে যায়।

সাবিত্রী খিলখিল করে হেসে ওঠে এবং হাসতে হাসতেই আবার ছুরিটা কোমরে গুঁজে রাখতে রাখতে বলে, ভয় পেলি রুচি? সম্মানের সঙ্গে গৃহের আব্রু নিয়ে নারীর মর্যাদায় তোরা প্রতিষ্ঠিত; অপমানিত লাঞ্ছিত নারীত্বের মর্মন্তুদ জ্বালা যে কী—কেমন করে তোরা বুঝবি ভাই। কি যন্ত্রণায় তারা নিশিদিন ছট্‌ফট্‌ করে মাথা খুঁড়ে মরে কেমন করে তোরা বুঝবি।

সাবিত্রীর দু চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে।

আর নির্বাক বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে বসে থাকে রুচিরা যেন পাথরের মত।

নয়

কিরীটী ডাঃ সানিয়ালের ঘরে আবার ফিরে এল।

ডাঃ সমর সেনই প্রথমে কথা বললেন, এই যে মিঃ রায়, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? দালাল সাহেব চলে গেলেন যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে!

কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, বিকেলের দিকে আবার আসবেন বলে গেলেন। কিন্তু আমি তো আর দেরি করতে পারছি না মিঃ রায়। আজ আবার আমার একটা অপারেশন আছে। জবাব দিলেন ডাঃ সেন।

কিরীটী যেন আপন মনে কি ভাবছিল। ডাঃ সমর সেনের প্রশ্নে ওঁর মুখের দিকে

চেয়ে বলে, কি বললেন ডাঃ সেন ?

আমার একটা অপারেশন ছিল! ডাঃ সেন আবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন।

নিশ্চয়ই। আপনি যাবেন বৈকি। আপাততঃ আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

ডাঃ সেন বলেন, কিন্তু দালাল সাহেব যে বলে গেলেন তিনি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে!

না, তার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নেই। তবে যাবার আগে আমার যে কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল ডাঃ সেন।

কিরীটীর শেষের কথায় যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই ডাঃ সমর সেন তার মুখের দিকে তাকান।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, কথাটা অবিশ্যি একটু ব্যক্তিগত।

কি রকম ?

আপনি এই বাড়িতে কি কাল রাত্রেই সর্বপ্রথম এলেন—না আগেও এ বাড়িতে দু-একবার এসেছেন ?

না। কাল রাত্রেই সর্বপ্রথম এ বাড়িতে আমি পা দিয়েছি।

ও। তাহলে এ বাড়ির কাউকেই আপনি পূর্বে চিনতেন না ?

ডাঃ সেন যেন এবারে একটু চমকেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকান।—বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আমার কথাটা ?

আমি—মানে—

বলুন, লজ্জা বা দ্বিধার এতে কিছু নেই।

না, তা ঠিক নয়। রুচিরার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তবে—

জানতেন না বোধ হয় কালকের রাতে এখানে এসে তাকে দেখার আগে পর্যন্ত যে সে এ বাড়িরই একজন! তাই কি ?

হ্যাঁ। বছর দুয়েক আগে কলকাতায় থাকবার সময়ই আলোছায়া সঙ্ঘের একটা চ্যারিটি থিয়েটার পারফরমেন্সের সময় রুচিরার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

তারপর ?

তারপর অবিশ্যি একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

হুঁ। এখন বুঝতে পারছি—

কি, মিঃ রায় ?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, না, বিশেষ কিছু নয়। তারপর একটু থেমে কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আপনি কি কখনও শোনেননি রুচিরা দেবীর মুখে, সমীরবাবুর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা চলেছে ?

না।

আশ্চর্য!

কি বললেন মিঃ রায়?

কিছু না। রুচিরা দেবীর সঙ্গে কতদিন আগে আপনার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল?

দিন পনের আগেও কলকাতায় দেখা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আমি কলকাতায় যাই তো, তখন দেখা হয়।

ক্ষমা করবেন, আর একটা কথা।

বলুন!

আপনি তো অবিবাহিত, তাই না?

হ্যাঁ।

বিয়ে সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন?

না।

কেন?

সত্যি বলব? মৃদু জবাব দেন ডাঃ সেন।

বলুন না।

এখনও জবাব পাইনি।

সে কি! এখনও জবাব পাননি?

না।

তাহলে আমি বলব মা ভৈষী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ডাঃ সেন।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

পরে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এবারে তাহলে আপনি যেতে পারেন।

কিন্তু ডাঃ সেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকেন তবু।

তখন কিরীটী বলে, যা বলবার তাঁকে আমিই বলব'খন। আপনি যান।

ডাঃ সমর সেন উঠে দাঁড়ালেন বোধ হয় ঘর ত্যাগ করবার জন্যই। ডাঃ সানিয়াল ইতিমধ্যে আবার কিরীটীর জন্য এক কাপ চা তৈরী করে চামচের সাহায্যে চিনিটা গুলছিলেন। এবার তাঁর দিকে চেয়ে কিরীটী বলে, আচ্ছা ডাঃ সানিয়াল, রায়বাহাদুরের যে attending nurse সুলতা কর, তার সম্পর্কে আপনার ঠিক কি ধারণা বলুন তো?

ডাঃ সমর সেন ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

চায়ের কাপটা কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ডাঃ সানিয়াল বলেন, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়।

ডাক্তারের হাত হতে চায়ের কাপটা নিয়ে, চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে একটা

আরামসূচক শব্দ করে স্থিরভাবে কিরীটী বলে, বুঝতে পারলেন না?

না।

মানে এই বলছিলাম আর কি, নিজের ডিউটি সম্পর্কে তার সততাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। আপনি তো অনেকদিন থেকেই সুলতা নার্সকে দেখেছেন এ বাড়িতে।

তা তাকে বিশ্বাস করা যায় বৈকি। ডিউটির ব্যাপারে কখনও তার কোন গাফিলতি বড় একটা দেখিনি।

বলেন কি! আমার তো মনে হল বরং ঠিক উল্টো। নার্স হবার আদৌ উপযুক্ত নন তিনি। She has rather chosen the wrong profession!

কেন? এ-কথা বলছেন কেন? বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডাঃ সানিয়াল কিরীটীর মুখের দিকে।

তাছাড়া আর কি বলি বলুন! ডিউটি দিতে এসে না হলে কেউ অমন করে অঘোরে ঘুমোতে পারে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খেয়ে!

ডাঃ সানিয়াল নির্বাক বিস্ময়ে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা একপাশে নামিয়ে রেখে পকেট হতে পাইপটা বের করল কিরীটী এবং অন্য হাতে কিমনোর পকেট হতে টোবাকো পাউচটা বের করে খানিকটা টোবাকো পাউচ থেকে দুই আঙুলের সাহায্যে তুলে পাইপের গহ্বরে ঠাসতে থাকে ধীরে ধীরে। এবং পাইপটা ঠিক করতে করতে কতকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বলে, আমার কি মনে হয় জানেন ডাক্তার?

কি?

নার্স সুলতা কর শুধু যে তার ডিউটিতেই গত রাত্রে মারাত্মক গাফিলতি করেছে তাই নয়, সে আমাদের সব কথা খুলে বলেনি।

সত্যি আপনার তাই মনে হয় নাকি মিঃ রায়?

হ্যাঁ। আরও অনেক কিছু সে জানে, যা ঘুমের দোহাই দিয়ে আমাদের কাছ থেকে চেপে গিয়েছে।

তাহলে আর একবার না হয় সুলতাকে ডাকি!

না। এখন তাকে আবার ডেকে এনে কোন ফল হবে না।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, এ ব্যাপারে ইচ্ছে করে কোন কথা তার পক্ষে গোপন রাখবার কি কারণই বা থাকতে পারে?

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে রহস্যময় হাসি দেখা দেয়। মৃদু হেসে সে বলে, কোথায় কার স্বার্থ—এত সহজেই ঠিক ধরা যায় না। অত সহজে যাচাই করতে গেলে কিন্তু আপনি ঠকবেন ডাক্তার! স্বার্থ ব্যাপারটা এমন সূক্ষ্ম ও ঘোরালো যে, অনেক সময় তার হদিস

পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে। তারপর যেন কতকটা বেখাপ্পা ভাবেই কিরীটী ডাঃ সানিয়ালের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বলতে পারেন ডাক্তার, আপনার ঐ নার্স সুলতা কর ও শকুনি ঘোষের মধ্যে পরস্পরের আলাপ-পরিচয়টা ঠিক কি ধরনের এবং কত দিনের ?

প্রশ্নোত্তরে এবারে একটুখানি মৃদু হেসে ডাঃ সানিয়াল বলেন, কেন বলুন তো ?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

সুলতা কর এখানেই থাকে এবং শুনেছি শকুনিবাবুর সঙ্গে সুলতার এ বাড়িতে ডিউটি দিতে আসবার আগে থেকেই নাকি আলাপ-পরিচয় কিছুটা ছিল।

কথাটা শুনে কিরীটীর চোখের তারা দুটো যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ এ-কথা আপনার মনে হল কেন মিঃ রায় ? প্রশ্ন করেন ডাঃ সানিয়াল।

কারণ অবশ্য একটা আছে, কিন্তু তারও আগে আমাদের জানতে হবে কাল রাতে সুলতা কর তার জবানবন্দিতে কতকটা ইচ্ছে করেই বিশেষ একটা মিথ্যে কথা কেন বলেছিল ?

বিশেষ মিথ্যে কথা! ডাঃ সানিয়াল বিস্মিত ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, বিশেষ একটি মিথ্যে কথা। সে তার জবানবন্দিতে বলেছে, আপনার ঘরের তৈরী কফি খেয়েই নাকি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—কিন্তু কেন ঐ মিথ্যে কথা বললে !

কিরীটীর কথায় ডাঃ সানিয়াল চমকে উঠে বললেন, সে কি ? কাল আবার তাকে আমি কখন কফি দিলাম ?

জানি আপনি দেননি।

কিন্তু অমন একটা মিথ্যে কথা বলবার কি এমন কারণ ?

এটা আর বুঝলেন না ডাক্তার ! অর্থাৎ সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, হয়ত আপনার দেওয়া কফির মধ্যেই কোন তীব্র ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত ছিল। যার ফলে সে ঠিক হত্যার সময়টিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলে, কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন ডাঃ সানিয়াল, সে তাহলে কার দেওয়া কফি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ? কে দিল ঘুমের ওষুধ-মিশ্রিত কফি তাকে কাল রাত্রে ?

আপনার তাহলে ধারণা, কাল রাত্রে কেউ-না-কেউ তাকে কফি দিয়েছিল ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা মিঃ রায়, এমনও তো হতে পারে—কাল রাত্রে মিস কর আদপেই কফি পান করেনি ! স্রেফ মিথ্যে কথা বলেছে !

না। মিস্ কর কাল রাত্রে কফি পান করেছিল এবং কফির সঙ্গে কোন তীব্র ঘুমের ওষুধও যে মিশ্রিত ছিল সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

কে তাহলে দিল তাকে কফি! ডাঃ সানিয়াল আপন মনেই যেন কথাটা উচ্চারণ করেন।

তাই তো আমিও ভাবছি। কিরীটী চিন্তান্বিতভাবেই পুনরায় বলে, কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি, মানে কে সুলতা করকে কাল রাত্রে ঘুম পাড়াবার জন্য ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে কফি তৈরী করে দিয়েছিল এবং কে গিয়ে তাকে আপনার নাম করে কফিটা দিয়ে এসেছিল, সেটাই সর্বাগ্রে আমাদের এখন জানা দরকার।

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় মিঃ রায়, ডাঃ বলেন, মিস্ করকে এ ঘরে আর একবার ডেকে এনে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই তো লেটা চুকে যায়। কে তাকে কফি করে গত রাত্রে দিয়ে এসেছিল!

ডাঃ সানিয়ালের কথায় কিরীটী হেসে ওঠে এবং হাসতে হাসতে বলে, কেন, আপনি দিয়ে এসেছিলেন সে তাই বলবে!

আমি যে তাকে কফি দিইনি আপনি তো তা জানেন, তাছাড়া আপনি তো আমার ঘরেই ছিলেন সে সময়। আমরা তো সব এক জায়গাতেই ছিলাম।

ডাক্তার, এসব ব্যাপারে আপনি দেখছি একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আপনি এটা বুঝছেন না কেন আপনি একজন মধ্যবয়েসী পুরুষ—যে বয়সটা পুরুষের পক্ষে এবং বিপরীত পুরুষের পক্ষে বিশেষ করে একটু আশঙ্কাজনকই। তাই ঐ চাতুরীর সাহায্য সে নিয়েছে। চালাক মেয়ে!

কিন্তু এ কথাটা কি তার বোঝবার বয়স হয়নি যে জেরার মুখে সত্যটা প্রকাশ হবেই? এখন সে ভুল শোনবার দোহাই দিয়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে হয়ত বাঁচবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতেই বা লাভটা কি?

লাভ! লাভ time-factor! কিরীটী হাসতে হাসতে প্রত্যুত্তর দিল।

দশ

কিছুক্ষণ অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হয়ে আত্মগত চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে এবং আবার এক সময় ডাঃ সানিয়ালই প্রশ্ন করেন, তাহলে আপনার ধারণা মিঃ রায় যে গত রাত্রে মিস্ সুলতা করকে নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ কফির সঙ্গে ইচ্ছে করে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেছিল!

বলাই বাহুল্য। অন্যথায় তার উপস্থিতিতে মিঃ চৌধুরীকে ওভাবে হত্যা করা তো সম্ভবপর হত না।

I see! আচ্ছা মিঃ রায়, আপনার কি তাহলে মনে হয় মিস্ সুলতা কর এই হত্যার

ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে ?

ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে কিনা জানি না তবে হত্যার সময়টিতে সে অকুস্থানে উপস্থিত ছিল সেটাই যে সব চাইতে বড় কথা এখন।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই ডাক্তার—তবে হ্যাঁ, She was in deep sleep হত্যার সময়টিতে এটা ঠিকই।

অতঃপর ডাঃ সানিয়াল যেন বলবার মত কোন কথাই আর খুঁজে পান না। এবং কিরীটীও নিঃশব্দে বসেই ধূমপান করতে করতে পীতাভ ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে থাকে।

সহসা একসময় যেন চিন্তাগ্রস্ত মনটাকে একটা নাড়া দিয়ে চুরুটের অগ্রভাগ হতে ভস্মাবশেষ ছাইটা আঙুলের টোকা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে, ডাক্তার, আপনার পরামর্শটা ভেবে দেখলাম মন্দ নয়—আর একবার বাজিয়ে দেখতে ক্ষতি কি ? আপনি গিয়ে একটিবার মিস্ করকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাকে আবার cross করে না হয় দেখা যাক।

নিশ্চয়ই, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাঃ সানিয়াল ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

দশ-পনের মিনিট পরেই বাইরে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল এবং বোঝা গেল পদশব্দ এগিয়ে আসছে এবং পদশব্দ ঘরের বাইরে বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল।

মৃদু কণ্ঠে কিরীটী আহ্বান জানায়, আসুন সুলতা দেবী। দরজা খোলাই আছে।

সত্যি সুলতাই। সুলতা দরজা ঠেলে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী চেয়ারটার উপরে সোজা হয়ে বসে একটু নড়েচড়ে।

সুলতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্য একবার কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং কিরীটীর স্থির নিষ্কম্প দুই চোখের শান্ত দৃষ্টির সঙ্গে বারেকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে মুখখানি অবনত করে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কয়েক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে যেন একটা বিশ্রী স্তব্ধতা থমথম করতে থাকে।

কিরীটীই পুনরায় আড়চোখে সুলতার সর্বাঙ্গে বারেকের জন্য তার দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুলতার সমগ্র মুখখানিতে দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বসুন সুলতা দেবী, ঐ চেয়ারটায় বসুন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কিরীটী সুলতাকে বলে কথাগুলো।

সুলতা কিরীটীর নির্দেশে সামনের শূন্য চেয়ারটা একটু ঠেলে নিয়ে বসল।

কিরীটী লক্ষ্য করে, সামনাসামনি চেয়ারে বসলেও সুলতা যেন তার দিকে চোখ তুলে চাইছে না।

কিরীটী সুলতার দিকেই চেয়ে ছিল।

দু হাত তার চেয়ারের দু'দিককার হাতলের ওপরে ন্যস্ত। দু হাতের দশ আঙুলের সাহায্যে সে চেয়ারের হাতল দুটো যেন চেপে ধরেছে।

কিরীটী নিঃশব্দে পূর্ববৎ ধূমপান করতে থাকে।

অদূরে টেবিলের উপর রক্ষিত টাইমপিসটা কেবল ঘরের নিস্তব্ধতা একঘেয়ে টিক টিক শব্দ তুলে ভঙ্গ করে চলেছে।

দুজনের একজনও কোন কথা না বলায় মনে হচ্ছিল যেন একটা সুকঠিন স্তব্ধতা ঘরের নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে কুৎসিত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

পরস্পর যেন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে, কে কাকে এবং কে আগে প্রশ্ন করবে।

কিছুক্ষণ পরে কিরীটীই সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক সময় দগ্ধ চুরুটের অগ্রভাগের ছাইটা সম্মুখের ত্রিপয়ের ওপরে রক্ষিত অ্যাসট্রেটার ওপরে ঠুকে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, সুলতা দেবী, কয়েকটা কথা আপনার কাছ থেকে জানবার জন্য কষ্ট দিলাম আপনাকে!

সুলতা কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু কিরীটীর কথার কোন প্রত্যুত্তর দিল না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ গতরাত্রে ঘটনা-বিপর্যয়ে ঠিক দুর্ঘটনাটার সময়ই মিঃ চৌধুরীর শিয়রের সামনে আপনার উপস্থিতিটা—বলতে বলতে কথার মধ্যে একটুখানি ইতস্ততঃ করেই যেন কিরীটী আবার তার অর্ধসমাপ্ত বক্তব্যের জের টেনে বলে, বুঝতেই পারছেন মিস কর, পুলিসের কাছে আপনার জবানবন্দিরই সব চাইতে বেশী মূল্য এখন।

কিন্তু—সুলতা কিরীটীর দিকে মুখ তুলে কি যেন বলতে চেষ্টা করতেই, কিরীটী মৃদু স্মিতকণ্ঠে বলে, অবশ্য ঠিক দুর্ঘটনাটা যে সময় ঘটে আপনিই অকুস্থানের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি ছিলেন এবং এ-কথাও মিথ্যে নয় যে আপনার এ হত্যার ব্যাপারে কোনপ্রকার স্বার্থেরই যোগাযোগ থাকতে পারে না, তাহলেও বুঝতেই পারছেন এক্ষেত্রে আপনি যে একেবারে খুব সহজেই সমস্ত প্রকার সন্দেহ থেকে রেহাই পাবেন তাও নয়।

কিরীটীর কথায় সুলতার চোখেমুখে যেন একটা চাপা আতঙ্কের অস্পষ্ট আভাস জেগে ওঠে সহসা।

আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন মিঃ রায়?

অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে ঢোঁক গিলে সুলতা প্রশ্ন করে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, আপনি বোধ হয় জানেন না সুলতা দেবী অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমরা গোড়াতেই ঐ সন্দেহ নিয়েই কাজ শুরু করি, কিন্তু সে কথা যাক। ভয় পাবেন না যেন তাই বলে। বলছিলাম সমস্ত কিছুকেই একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে আমরা নিঃসন্দেহে গিয়ে পৌঁছই। সন্দেহই আমাদের নিঃসন্দেহের সত্যে পৌঁছে দেয়।

কিরীটী কথা বলতে বলতে এক সময় চেয়ার হতে উঠে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি শুরু করে দেয় এবং পায়চারি করতে করতেই পুনরায় তার বক্তব্যের মধ্যে ফিরে যায়, এবার আমাদের আসল ও কাজের কথায় আসা যাক—যে জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি এ ঘরে। আমি যে প্রশ্নগুলো আপনাকে করব আশা করি ভেবেচিন্তে তার যথাযথ উত্তর দেবেন।

বলুন ?

প্রথমত: আপনার কি মনে আছে ঠিক কত রাত পর্যন্ত আপনি জেগে ছিলেন ?

ঠিক কারেক্ট টাইম বলতে পারব না হয়ত, তবে মনে হয় সোয়া তিনটে পর্যন্ত বোধ হয় জেগে ছিলাম।

বেশ। আপনি আপনার গত রাত্রির জবানবন্দিতে বলেছেন, কফি পানের পরই কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন। মনে পড়ে আপনার ?

হ্যাঁ, এমন ঘুম পেয়েছিল যে কিছুতেই জেগে থাকতে পারলাম না। তাছাড়া রায়বাহাদুরও ঘুমিয়ে পড়ায়—

কিরীটী আবার বলে, আচ্ছা ডাক্তারের কাছেই শুনেছিলাম, ইদানীং প্রায় কোন ঘুমের ওষুধেই নাকি রায়বাহাদুরের তেমন ভাল ঘুম আসত না এবং সেই কারণেই সমস্ত রাত ধরেই ডাক্তারকে ও আপনাকে বলতে গেলে প্রায় তটস্থ হয়ে—মানে কখন ডাকবেন সেইজন্য সর্বক্ষণই প্রায় সজাগ হয়ে থাকতে হত, কথাটা কি সত্যি ?

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে সুলতা জবাব দেয়।

তাই যদি হবে তো অমন চট্‌ করে মাত্র একটা ঘুমের বড়ি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন, কি করে ?

সুলতা চুপ করে আছে। কিরীটীর প্রশ্নের কোন জবাব দিচ্ছে না।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে শকুনিবাবুর কতদিনকার আলাপ মিস কর ?

কিরীটীর প্রশ্নে হঠাৎ যেন একটু চমকেই সুলতা তার মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটী সেই চমকানোটুকু লক্ষ্য করেই এবারে বলে, কই, কথাটার আমার জবাব দিলেন না!

সুলতা মৃদুকণ্ঠে বলে, বছর দুই হবে।

দু বছর?

হ্যাঁ, আমার জন্ম এখানে, আমি এখানেই মানুষ। বাবা এখানকার একটা কোলিয়ারীর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিলেন।

Excuse me, শকুনিবাবুর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কি করে হল?

রায়বাহাদুরের কোলিয়ারীর হাসপাতালে কলকাতা থেকে নার্সিং শিখে এসে প্রথম যখন বছর দুই আগে চাকরি নিই—হাসপাতালের ডাক্তারবাবু মিঃ ঘোষের বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে হাসপাতালে ঐ সময় ওঁর যাতায়াত ছিল এবং সেই সময়েই আমাদের পরস্পরের আলাপ-পরিচয় হয়।

একটা কথা সুলতা দেবী; রায়বাহাদুরের এখানে আপনাকে কাজে নিযুক্ত করবার ব্যাপারে মিঃ ঘোষের কোন হাত ছিল কি?

কিরীটীর প্রশ্নটা এত পরিষ্কার যে প্রথমটায় সুলতা কিছুই জবাব দিতে পারে না। নিঃশব্দে বসে কেবল নিজের পরিধেয় শাড়ির আঁচলের পাড়টা টেনে টেনে সোজা করতে থাকে। কিরীটীও সুলতাকে দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন না করে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে তার প্রতি চেয়ে থাকে।

অতঃপর কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই কেটে যায়।

ধীরে ধীরে এক সময় সুলতা আবার মুখ তুলে বারেকের জন্য কিরীটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করল এবং শান্ত ধীর কণ্ঠে বললে, না, আমার এখানে কাজে নিয়োগ সম্পর্কে মিঃ ঘোষের কোন তদারকের প্রয়োজন হয়নি, কারণ আমি রায়বাহাদুরের হাসপাতালেই চাকরি করছিলাম। কাজেই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুই নার্সের প্রয়োজন হওয়ায় আমার কথা ডাঃ সানিয়ালকে বলায় এখানে আমার চাকরি হয়। বলতে গেলে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুই আমার এখানে চাকরি করে দেন।

কিরীটী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, মিঃ ঘোষই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে বলে এখানে আপনার নিয়োগ যাতে হয় সে বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন?

কিরীটীর প্রশ্নে সুলতা কয় মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়, তারপর শান্ত ধীর কণ্ঠে বললে, না, আপনার সে সন্দেহ সত্যি নয়, তাছাড়া সে রকম কোন কিছু হয়ে থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

মুহূর্তের জন্যই কিরীটীর চোখের তারা দুটি চক্‌চক্‌ করে ওঠে এবং যে উদ্দেশ্যে সে একই প্রশ্ন বারংবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সুলতাকে করছিল সেটা যে কতকটা সিদ্ধ হয়েছে তাতেই তার কিছুটা আনন্দ হয়। অতঃপর কিরীটী তার দ্বিতীয় প্রশ্ন করে।

মিস্ কর, এবারে আপনাকে আমি আবার গত রাত্রি সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

বলুন? শান্ত স্বর সুলতার।

গতরাত্রের জবানবন্দিতে এবং আজও এই কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছেন, কফি পানের পরই আপনার দু চোখের পাতায় অসহ্য ঘুম নেমে আসে, আপনি কোনমতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারেন না, আপনি ঘুমোতে বাধ্য হন!

এগার

কিরীটীর প্রশ্নে কিছুক্ষণের জন্য সুলতা ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দেই অতিবাহিত হয়।

সুলতাকে নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে কিরীটী আবার বলে, আপনি বোধ হয় জানেন না যে গত রাত্রে আপনাদের প্রত্যেকের জবানবন্দিই থানায় recorded হয়ে গিয়েছে! এবং বর্তমানের এই রায়বাহাদুরের হত্যা-মামলায় আপনাদের আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের দেওয়া জবানবন্দিই প্রত্যেকের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে evidence হিসাবেই আদালতে জেরা করা হবে!

একটু থেমে কিরীটী আবার তার অর্ধসমাপ্ত বক্তব্যের জের টেনে বলতে শুরু করে, এবং এও হয়ত বুঝতে পারছেন, ঘটনাচক্রে একমাত্র আপনিই সশরীরে অকুস্থানের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি ছিলেন ঠিক হত্যার সময়টিতে!

কিন্তু আমি—আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যথাসাধ্য নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করবার প্রয়াসে সুলতার কণ্ঠস্বরে যে উদ্বেগ ফুটে ওঠে সেটা কিরীটীর কান এড়াতে পারে না।

হ্যাঁ। হয়ত ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু সেটাও তো আদালতের বিচারের সময় বিবেচনাসাপেক্ষ। সে ঘুম কেন এল? কারণ আপনার তো ঘুমোবার কথা নয়!

সুলতা এরপর আর নিজের মনের উদ্বেগকে সংযত রাখতে পারে না। স্পষ্ট ব্যাকুল কণ্ঠেই বলে ওঠে, কি আপনি বলতে চাইছেন মিঃ রায়! আপনি কি বিশ্বাস করেন না সত্যিসত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি এমন এসে যায় বলুন মিস্ কর? আমি তো আর কিছু আদালতের নিয়োজিত প্রতিভূ নই এবং স্বয়ং বিচারকও নই, আপনাদের মতই একজন সাধারণ তৃতীয় ব্যক্তি—যে হত্যার সময় এই বাড়িতে উপস্থিত ছিল এইমাত্র।

কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, নচেৎ আপনি কি ভাবেন আমার জেগে থাকা সত্ত্বেও আমি আমার চোখের ওপর একজনকে হত্যা করতে বাধা দেব না? কারও পক্ষেই কি সেটা সম্ভব?

কারও পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা এক্ষেত্রে নিষ্প্রোয়জন। তবে আপনি যে আপনার duty ঠিক ভাবে পালন করেননি, এ কথাটা তো নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না!

আমি আমার duty অবহেলা করেছি!

করেননি? নিশ্চয়ই করেছেন সুলতা দেবী। নিজেই ব্যাপারটা একবার ভাল করে ভেবে দেখুন না, রাত্রে একজন মুমূর্ষ রোগীর সেবা ও দেখাশুনা করবার জন্যই তো টাকা দিয়ে আপনাকে নিয়োজিত করা হয়েছিল এখানে। আপনি জেগে থেকে রোগীর ভালমন্দ দেখাশোনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে অবিলম্বে ডাক্তারকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনবেন, এই তো ছিল আপনার duty? সেদিক থেকে ঘুমিয়ে আপনি কি কর্তব্যে অবহেলা করেননি? বলুন, জবাব দিন আমার প্রশ্নের?

শেষের দিকে কিরীটীর কণ্ঠস্বরে যেন কতকটা আদেশের সুরই ফুটে ওঠে।

সুলতা চুপ করে বসে থাকে। কোন জবাবই দিতে পারে না কিরীটীর অতর্কিত প্রশ্নের।

আপনি বলেছেন আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কফি পানের পরই; ধরে নেওয়া গেল না-হয় কথাটা আপনার সত্যি, এর পরই আদালত আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই কফির মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল!

ঘুমের ওষুধ?

হ্যাঁ। নচেৎ কি এক কাপ কফি খেয়ে কেউ অমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তে পারে? বরং উল্টোটাই স্বাভাবিক। কফিতে ঘুম তাড়ায়!

সুলতা কিরীটীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

কিরীটী আবার বলে, ধরুন তাই যদি হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন উঠবে, কে আপনাকে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিল? আর প্রশ্নটা ঐখানেই শেষ হবে না। কারণ আরও একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে ঐ সঙ্গে, কে আপনাকে কফি পাঠিয়ে দিয়েছিল?

কেন, কফি তো ডাক্তার সানিয়ালই দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে, যেমন এর আগেও প্রায়ই প্রতি রাত্রে ঐ সময় এক কাপ করে কফি তিনি আমাকে দিয়ে যেতেন!

সুলতার জবাবে কিরীটী যেন চমকে ওঠে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে তার কিছুই প্রকাশ পায় না।

কিরীটী কেবল প্রশ্ন করে, প্রায় রাত্রেই তাহলে ডাঃ সানিয়াল ঐ সময় আপনাকে এক কাপ করে কফি পাঠিয়ে দিতেন নাকি?

হ্যাঁ। রাত্রে ঐ সময় তিনি প্রত্যহই কফি পান করতেন এবং জেগে থাকবার সুবিধে হবে বলে আমাকে তিনিই একদিন suggest করেন, ঐ সময় এক কাপ গরম কফি পান করলে আমার জেগে থাকতে নাকি তত কষ্ট হবে না। সেই জন্য এক কাপ করে কফি আমাকেও পাঠিয়ে দিতেন এবং আমিও কফিটা খেতাম; কারণ ঐ সময়টায় প্রতি রাত্রেই প্রায় আমার একটা ঘুমের ঝোঁক আসত।

আপনি সে কথা ডাক্তার সানিয়ালকে বলেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম।

ও। তাহলে দেখছি প্রায় রাত্রেই ঐ সময়টা আপনার ঘুমের একটা ঝোঁক আসত বলেই ডাঃ সানিয়াল আপনাকে কাফ পাঠিয়ে দিতেন নিজে!

অ্যাঁ, কি বললেন?

বলছিলাম জেগে থাকবার জন্যই আপনি কফি খেতেন! তাহলে কাল রাত্রে যদি আপনাকে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েই থাকে, তাহলে it was intentional!

সুলতা কিরীটীর কথা যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, এইভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

যাক সে কথা, আচ্ছা মিস্ কর, এ বাড়িতে আপনি তো অনেকদিন ধরে রায়বাহাদুরের রোগশয্যায় duty দিচ্ছেন! কতদিন ধরে রাত্রে ঐ সময় আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে কফি খাচ্ছেন মিস্ কর?

কতদিন ধরে খাচ্ছি?

হ্যাঁ, একটু আগে আপনি বললেন না, উনিই মানে ডাঃ সানিয়ালই একদিন কফি খাবার কথা আপনাকে বলেছিলেন?

খুব বেশী দিন নয়, বোধ হয় দিন দশেক হবে।

দিন দশেক।

হ্যাঁ, বোধ হয় দিন দশ থেকেই রাত্রে তিনি যখন কফি খান, সেই সময় কফি তৈরী হলে এক কাপ করে আমার জন্য দিয়ে যেতেন।

সাধারণতঃ কি তিনিই—অর্থাৎ ডাঃ সানিয়ালই কি আপনাকে কফি এনে দিতেন ঐ রাত্রে?

হ্যাঁ, ডাক্তার সানিয়ালই দিতেন নিজে।

ডাঃ সানিয়ালই দিয়ে যেতেন! আবার প্রশ্ন করল কিরীটী।

হ্যাঁ।

গত রাত্রেও তাহলে তিনিই দিয়ে গিয়েছিলেন কফি?

হ্যাঁ, ডাঃ সানিয়ালই।

সুলতার জবাবে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কিরীটী যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকে। তারপর আবার এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে, কিন্তু সুলতা দেবী, অন্যান্য রাতের কথা আমি বলতে পারব না বটে তবে গতকাল রাত্রে যে তিনি আপনাকে কফি দিতে আসেননি সে সম্পর্কে কিন্তু আমি স্থিরনিশ্চিত।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়, আমি তখন জেগে একটা বই পড়ছিলাম—ডাঃ সানিয়ালই কাল রাত্রেও আমাকে নিজে এসে কফি দিয়ে গেলেন!

না, বললাম তো, কাল রাত্রে তিনি যে অন্ততঃ আপনাকে কফি দিতে আসেননি সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত। কারণ সে সময়ে তাঁর ঘরেই তিনি উপস্থিত ছিলেন।

না, তা হতে পারে না।

হওয়া-হওয়ির কথা এ নয় মিস্ কর, কারণ it is a facet। তাছাড়া আমি নিজে ও ডাঃ সেন ঐ সময় ডাক্তারের ঘরে বসে সকলে মিলে তাঁরই হাতে তৈরী কফি পান করছিলাম। কাজেই বুঝতে পারছেন, তিনি কিছু আর ম্যাজিকের দ্বারা নিজেকে অদৃশ্য করে কিংবা আমাদের hypnotise করে আমাদের চোখের সামনেই সে ঘর থেকে বের হয়ে এসে আপনাকে কফি দিয়ে যেতে পারেন না।

সুলতারও বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলে ওঠে, কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি বলছি সত্যিই তিনি গত রাত্রে কফি দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে নিজে এসে অন্যান্য দিনের মত।

না দেননি, তবু আপনি যখন বলছেন—আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা আপনার দেখবার ভুল সুলতা দেবী।

দেখবার ভুল!

হ্যাঁ। বা এমনও হতে পারে, আপনি আদৌ ভাল করে দেখেননি চেয়ে কে গত রাত্রে আপনাকে কফি দিয়ে গেল—মানে হয়ত অন্যমনস্ক ছিলেন কোন রকম!

তবে—একটা ভয়ার্ত শঙ্কিত দৃষ্টি সুলতার দু চোখের তারায় ফুটে উঠল!

হ্যাঁ, এ-কথা অবিশ্যি সত্যি একজন কেউ এসে গত রাত্রে কফি দিয়ে গিয়েছেন, তিনি অবিকল ডাঃ সানিয়ালের মত দেখতে হলেও আসল ডাঃ সানিয়াল নন। অন্য কেউ। কিন্তু কে সে? সেই-ই হচ্ছে প্রশ্ন—শেষের কথাটা কিরীটী যেন আত্মগত ভাবেই উচ্চারণ করে কতকটা।

আপনার কথা যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ রায়। তিনি ডাক্তারের মত দেখতে, অথচ তিনি নন!

বললাম তো একটু আগে আপনাকে, এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, নিষ্ঠুর সত্য যা ঘটেছিল কাল রাত্রে তাই বলেছি আপনাকে আমি। আচ্ছা এবারে আপনি বাড়ি যেতে পারেন মিস্ কর।

বাড়ি যাব?

হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে আমরাই দেখা করব। কেবল এই জায়গা ছেড়ে পুলিসের বিনা

অনুমতিতে কোথাও আপাততঃ যাবেন না।

সুলতা নিঃশব্দে শ্লথ গতিতে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সুলতা করের পায়ের শব্দটা বারান্দায় এক সময় মিলিয়েও গেল।

সুলতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে এক সময় হাতের সিগারটা নিভে গিয়েছে কিরীটীর খেয়ালও হয়নি। আবার নির্বাপিত সিগারটায় অগ্নিসংযোগ করে হাতের দেশলাইয়ের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নেহাৎ একটা অনুমানের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে কিরীটী সুলতাকে প্রশ্ন করেছিল ঐভাবে এবং অকস্মাৎ তার হাতের মধ্যে একটি মূল্যবান সূত্র (clue) এসে গেল।

সুলতাকে প্রশ্ন করতে করতে এবং তার জবাবের পর কিরীটীর এখন আর বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না যে গত দশদিন ধরে ডাঃ সানিয়ালের পরামর্শ ও উপদেশ মতই সুলতা রাত্রে নিদ্রাকে এড়াবার জন্য কফি পান করছিল এবং হত্যাকারী যে উপায়েই হোক সেই কথাটি জানতে পেরে পূর্বাহ্ণে সেই সুযোগটি চমৎকার কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। অপূর্ব চাতুর্যের সঙ্গেই সে নির্দিষ্ট একটি সময়ের পরিপূর্ণ ভাবেই সুযোগ নিয়েছে। ভাবতেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয় কি অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য দুঃসাহস ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় সে দিয়েছে এক্ষেত্রে।

আর রায়বাহাদুর যদি সত্যিই—তা সে যে ভাবেই হোক, জেনে থাকেন তাঁর এই মৃত্যুর ব্যাপারটা, তারপর তাঁকে ঠিক পূর্বাহ্ণে এভাবে জ্ঞাত করে কেউ যে এমন ভাবে পরিকল্পনানুযায়ী হত্যা করতে পারে এ যেন কিরীটীর স্বপ্নেরও অতীত।

কিন্তু সুলতা কর, তার কথাগুলো কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?

সত্যি কি সুলতা কর গত রাত্রের কফি পরিবেশনকারীকে চিনতে পারেনি, না ইচ্ছে করেই অর্থাৎ কথাটা জেনেও গোপন করে গেল?

মনে মনে কিরীটী গত রাত্রের ব্যাপারটা আর একবার পর্যালোচনা করে। রায়বাহাদুর ঘরের যে অংশে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন সেখানে নীল বাতিটা ডোমে ঢাকা থাকার দরুন স্থানটি তেমনি সুস্পষ্ট ভাবে আলোকিত ছিল না। ঘরের অন্য অংশ হতে সেই স্থানটি একটা ভারি কালো পর্দা টাঙিয়ে ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যে সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়—ঘরের মধ্যে অসুস্থ, ওষুধের প্রভাবে নিদ্রিত, রায়বাহাদুর ও পার্শ্বে একটি চেয়ারে ঐ একই ভাবে ওষুধের প্রভাবে নিদ্রিত নার্স সুলতা কর ব্যতীত আর কোন তৃতীয় প্রাণীই অকুস্থানে ছিল না। এবং রাত্রি সাড়ে তিনটে হতে চারটে বাজবার মধ্যে যে আধ ঘণ্টা সময়, ঐ সময়ের মধ্যেই কোন এক মুহূর্তে কৌশলে সুলতা করকে ঘুম পাড়াবার জন্য

ঘুমের কোনো তীব্র ওষুধ-মিশ্রিত কফি পান করানো হয়েছিল তার অজ্ঞাতেই। তারপর নিশ্চয়ই সুলতার কফি পানের পর নিদ্রাভিভূত হতে অন্ততঃ মিনিট দশ-বারো সময় তো লেগেছে। তাহলে বাকি থাকে কেবল হিসেবমত ঐ আধ ঘণ্টার মধ্যে মিনিট পনের, যে সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

মাত্র পনের মিনিট সময়। এবং গতরাত্রের ঐ পনের মিনিট সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় তদন্তের ব্যাপারে। কাজেই এখন খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে ঐ পনের মিনিট সময়ে অর্থাৎ রাত্রি পৌনে চারটে থেকে রাত্রি চারটে পর্যন্ত এই বাড়ির সকলে কে কোথায় কোন্ অবস্থায় ছিল। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যেকার প্রত্যেকের গতিবিধি চেক করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যেকার প্রত্যেকের গতিবিধি বা অবস্থানই বর্তমানে এই হত্যা-ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সূত্র।

বারো

কিরীটী পকেট থেকে তার নোট বুকটা বের করল এবং নিম্নলিখিত কথাগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করে এক, দুই, তিন ক্রমিক নম্বর দিয়ে পর পর লিখে যেতে লাগল।

১। রায়বাহাদুর যে গতরাত্রে ঠিক চারটের সময় নিহত হবেন সেটা তিনি অন্ততঃ এখন বোঝা যাচ্ছে জানতেন।

[টীকা: তাঁর এরূপ বদ্ধমূল ধারণা হওয়ার সত্যি কোন কারণ ছিল কি? না ডাক্তার যা বলছেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একটা hallucination—তাই? এবং তা যদি হয়ও তাহলে কেন হল ঐ রকম একটা hallucination এবং তার কারণ কি?]

২। ধারণা থেকে আর যাই হোক রাত্রি পৌনে চারটে থেকে চারটের মধ্যে যে তিনি নিহত হয়েছেন এ স্বতঃসিদ্ধ।

[টীকা: কাজেই ব্যাপারটা যেখানে স্বতঃসিদ্ধ সেখানে hallucination-এর theory কতদূর প্রযোজ্য?]

৩। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যে বাড়ির প্রত্যেকেই কে কোথায় ছিল এবং কে কি অবস্থায় ছিল?

[টীকা: প্রত্যেকের জবানবন্দি কি বিশ্বাসযোগ্য? গান্ধারী দেবীর জবানবন্দির মধ্যে প্রায় সবটাই মিথ্যে। তিনি জেগেই ছিলেন এবং কেন ছিলেন? জেগে থাকবার কি তাঁর কোন কারণ ছিল?]

৪। ঐ সময় গান্ধারী দেবীর শয়নঘরের পাশের ঘরে রুচিরা কি করছিল?

[টীকা: যতদূর মনে হচ্ছে ঐ সময় কেউ না কেউ তার ঘরে এসেছিল। কে তার ঘরে এসেছিল? সমীরবাবু কি?]

৫। রুচিরা ও সমীরবাবুর মধ্যে সত্যিকারের কোন ভালবাসা ও understanding আছে কি ?

[টীকা : সম্ভবতঃ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে না। গান্ধারী দেবীর কথাবার্তা থেকেই সেটা কিছু প্রমাণিত হয়েছে। আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। একটা ব্যাপারে কেমন যেন সন্দেহ হয়। ডাঃ সমর সেনকে দেখে রুচিরা অমন করে তাকিয়ে ছিল কেন ?]

৬। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যে কে সুলতা করকে কফি দিয়ে এসেছিল সত্যি সত্যি ? সুলতা বলছে অবিশ্যি ডাঃ সানিয়ালই তাকে কফি দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তা অসম্ভব। কারণ ডাঃ সানিয়াল তখন তার ঘরেই ছিল। তাই যদি হয় তাহলে কে ডাঃ সানিয়ালের ছদ্মবেশে তাকে গতরাত্রে কফি দিতে গিয়েছিল ? আর ছদ্মবেশধারীকে সুলতা কর চিনতেই বা পারল না কেন ? না চেনবার তো কথা নয়! ডাক্তারকেও একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

[টীকা : বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান সূত্র।]

৭। হত্যার ব্যাপারে এ বাড়ির কার কার interest থাকা সম্ভব।

[টীকা : বলতে গেলে রায়বাহাদুরের আত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেরই। কিন্তু তাহলেও কার ওদের মধ্যে interest সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল বা থাকতে পারে। দ্বিতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।]

৮। রায়বাহাদুরের সত্যি কোন উইল আছে কি ?

[টীকা : থাকাটাই সম্ভব। তবে হয়ত এখন আর পাওয়া যাবে না খুঁজে।]

৯। শকুনি ঘোষের ঘরের মধ্যে প্রাপ্ত কাপড়ের মধ্যে রক্তের দাগ ছিল। রক্ত কোথা থেকে এল তার সেই পরিত্যক্ত পরিধেয় বস্ত্রে এবং সেই বস্ত্র সিক্তই বা ছিল কেন ?

[টীকা : রক্তের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে।]

১০। গান্ধারী দেবী শকুনির নিকট কাকে এই হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করেন বলতে এসেছিলেন, এবং ঘরের মধ্যে তাকে দেখতে পেয়ে ব্যাপারটা চেপে গেলেন।

[টীকা : বিশেষ উল্লেখযোগ্য তৃতীয় সূত্র।]

বর্তমানে সর্বাগ্রে এই দশটি পয়েন্টের মীমাংসার একটা আশু প্রয়োজন।

ঐ পয়েন্টগুলোর একটা সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারটা একটা রহস্যের অন্ধকারে অস্পষ্টই থেকে যাবে।

কিরীটী চিন্তা করতে থাকে—এখন কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

বাইরে ঐ সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশাসন চৌধুরী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী দুঃশাসন চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, এক রাত্রের শেষের দিকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই যেন ভদ্রলোকের মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। চোখে মুখে একটা সুস্পষ্ট ক্লান্তির ও দুশ্চিন্তার আভাস যেন স্পষ্ট।

আসুন মিঃ চৌধুরী। কিরীটী আহ্বান জানায়, বসুন।

নির্দিষ্ট চেয়ারটার ওপর বসতে বসতেই ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে দুঃশাসন চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা কি হল বলুন তো মিঃ রায়? শেষ পর্যন্ত দাদার অনুমানই সত্য হল নাকি? সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন এখনও ঠিক ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

আপনি এসেছেন মিঃ চৌধুরী ভালই হল। পুলিসের সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি হাতে নেওয়ার আগে আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে আর একবার খোলাখুলি আলোচনা করব ভেবেছিলাম।

বলুন কি জানতে চান! আর সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন সত্যিই puzzled হয়ে আছি।

পাজলড্ শুধু আপনিই নন দুঃশাসনবাবু, প্রত্যেকেই হয়েছেন।

আচ্ছা আপনার এ ব্যাপারে কি ধারণা বলুন তো মিঃ রায়?

সে কথা বলবার আগে একবার আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি আলোচনা করে নিতে চাই। দালাল সাহেব বিকেলেই আসবেন বলে গেছেন। তাঁর আসবার আগেই এ ব্যাপারটা আমি শেষ করে দিতে চাই।

বলুন আমাকে কি করতে হবে?

প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব। এবং আপনাকেই সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বেশ।

অনুগ্রহ করে তাহলে পনের মিনিট বাদে ডাঃ সানিয়ালের ঘরে এলে আমি খুশী হব।

বেশ। তাই হবে।

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন কেমন যেন শ্লথ ক্লান্ত পায়ে।

কিরীটীর মনে হয়, হঠাৎ দুঃশাসন চৌধুরী তার ঘরে কেন এসেছিলেন! কোন কথা বলতে কি?

কি কথা?

দুঃশাসন চৌধুরী কি কিছু জানেন এবং জেনে বিশেষ কারণেই সেটা গোপন করে

যাচ্ছেন ? লোকটা ধূর্ত নিঃসন্দেহে এবং বর্মায় নিজের ব্যবসা গুটিয়ে বাংলা মুলুকে চলে এসেছেন—শুধু মাত্র কি রায়বাহাদুরের অনুরোধেই, না অন্য কোন কারণে ?

তের

ডাঃ সানিয়ালের ঘরে বসেই কিরীটী অপেক্ষা করছিল এবং মিনিট পনের-কুড়ি বাদেই দুঃশাসন চৌধুরী সেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী আহ্বান জানায়, আসুন, বসুন।

দুঃশাসন চৌধুরীর জবানবন্দি।

কিরীটী প্রশ্ন করছিল এবং দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দিচ্ছিলেন।—

সর্বপ্রথম একটা কথা আপনার সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন মিঃ চৌধুরী !

বলুন।

আপনি গতকাল রাত্রে বলেছেন মৌচীতে আপনার মাইকার ব্যবসা ছিল এবং আপনি সে ব্যবসা আপনার দাদা রায়বাহাদুরের ইচ্ছেয় তুলে দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন গত কয়েক মাস হল, তাই তো ?

হ্যাঁ।

সেখানে আপনার ব্যবসা কেমন চলছিল ?

ভালই।

কিছু মনে করবেন না, যখন ব্যবসা তুলে দিয়ে এখানে চলে আসেন তখন হাতে আপনার liquid cash কত ছিল ?

প্রশ্নটা দাদার হত্যার ব্যাপারে একান্তই অবান্তর নয় কি মিঃ রায় ? দুঃশাসনের কণ্ঠস্বরটা একটু উগ্র বলেই মনে হয় যেন কিরীটীর।

অবান্তর হলে অবশ্যই এ প্রশ্নটা আপনাকে আমি করতাম না মিঃ চৌধুরী।

কিন্তু যদি জবাব না দিই ?

অবশ্য জবাব দেওয়া-না-দেওয়াটা আপনার একান্ত ইচ্ছাধীনের, তবে আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলে কিছুটা সন্দেহের হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন।

সন্দেহ। কি বলতে চান আপনি ?

বলতে চাই যে, আমার ধারণা রায়বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডটা সম্পূর্ণ অর্থঘটিত। অর্থই অনর্থ ঘটিয়েছে।

আপনি তাহলে বলতে চান যে, সম্পত্তির লোভেই দাদাকে কেউ হত্যা করেছে ?

নিশ্চয়ই। হঠাৎ কঠোর শোনায় যেন কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর দুঃশাসন চৌধুরী চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন,

আমাকেও কি তাহলে আপনি ঐদিক দিয়েই সন্দেহ করছেন মিঃ রায় ?

শুধু আপনাকেই নয় মিঃ চৌধুরী, এ বাড়ির প্রত্যেককেই—এখানে গতরাত্রে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে নিহত রায়বাহাদুরের আপনারা আত্মীয়-স্বজনের দল, সে সন্দেহের দিক থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না পুলিসের বিচারে বা বিশ্লেষণে।

কিন্তু আপনি!

আমিও ঐ কথাই বলব।

বলছেন কি ? তাহলে আপনার কি ধারণা আমরাই, দাদার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ না-কেউ দাদাকে হত্যা করেছি অর্থের লোভে কাল রাত্রে ?

অতীব দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় ভাষণ আমাকে করতে হচ্ছে মিঃ চৌধুরী, আপনার অনুমানই সত্য।

মুহূর্তকাল দুঃশাসন চৌধুরী চুপ করে যেন কতকটা হতভম্বের মতই বসে রইলেন। তাঁর বাকশক্তি যেন লোপ পেয়েছে। কিরীটীও চুপ করে বসে থাকে।

হঠাৎ আবার দুঃশাসন চৌধুরীই প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমাকেও আপনি দাদার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন ?

তার আগে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন ?

কিরীটীর প্রশ্নটা যেন অতর্কিতে দুঃশাসন চৌধুরীকে একটা নাড়া দিল। কতকটা হত চকিত ও বিহ্বল কণ্ঠেই দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দেন, আমি !

হ্যাঁ। আপনার কি কারও ওপর সন্দেহ হয় ?

না। একটু ইতস্ততঃ করেই জবাবটা দিলেন দুঃশাসন চৌধুরী।

আচ্ছা আপনার দাদার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয় ?

বলতে পারি না।

ইদানীং কিছুকালের মধ্যে বা পূর্বে আপনার দাদার সঙ্গে এ বাড়ির কারও কোন মনো মালিন্যের কোন কারণ ঘটেছিল বা ছিল বলতে পারেন ?

তেমন কিছু বলতে পারি না। তবে এক মধ্যে মধ্যে শকুনির সঙ্গে দাদার খিটিমিটি হত। তাছাড়া আর কারও সঙ্গে কিছু শুনিনি। একটা কথা অবিশ্যি—ইদানীং দাদা তো সকলের প্রতিই বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন।

শকুনিবাবুর সঙ্গে খিটিমিটি হবার কারণ কি ? জানেন কিছু ?

বলবেন না ওটার কথা। একটা হতচ্ছাড়া scoundrel। ঐ যে বাড়িতে দাদা রোগশয্যার পাশে নার্স দেখেছেন—ঐ মেয়েটাকে শকুনি বিয়ে করতে চায়। এক পয়সা মুরোদ নেই, মামাদের ঘাড়ে বসে খাবে, তার ওপরে বিয়ের শখ বাবুর !

কেন, শকুনিবাবু কি কিছু করেন না ?

আড্ডা দেওয়া ছাড়া কিছু করে বলে তো জানি না। যেমন হয়েছেন আমাদের কাকা সাহেবটি তেমনি ঐ হতচ্ছাড়া বোম্বেটে শকুনিটা। একজন বসে বসে বাঈজী আর মদে টাকা উড়োচ্ছেন, আর একজন ক্লাব থিয়েটার আর আড্ডাবাজি করে টাকা উড়োচ্ছেন।

কিন্তু আমি যতদূর রায়বাহাদুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম, আপনাদের কাকা অবিনাশবাবুর প্রতি রায়বাহাদুরের কোন বিতৃষ্ণা বা বিরাগ ছিল বলে তো মনে হয়নি।

ঐ তো হয়েছিল মুশকিল। একটা অসম্ভব faith ছিল কাকার প্রতি দাদার, এবং দাদা ওঁকে বরাবরই প্রশ্রয়ই দিয়েছে।

হুঁ। কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ আত্মচিন্তাতেই বোধ হয় বিভোর হয়ে থাকে। আবার প্রশ্ন শুরু করে কিরীটী।

আপনি কাল রাত্রি সাড়ে তিনটে থেকে আপনার দাদার হত্যাসংবাদ পেয়ে দাদার ঘরে আসবার আগে রাত চারটে পর্যন্ত সময়টা কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে জেগেই ছিলাম।

কেন, আপনি তো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন, তাতেও আপনার ঘুম হয়নি?

না।

আর একটা কথা. আপনি ডাঃ সানিয়ালের ঘরে কাল রাত্রে যখন ঘুমের ওষুধ চাইতে আসেন, তখন বলেছিলেন গত এক মাস ধরে আপনি এ বাড়িতে আসা অবধি নাকি অনিদ্রা রোগে ভুগছেন, আবার দালাল সাহেবের কাছে কিছুক্ষণ পরেই জবানবন্দিতে বললেন, মাত্র দশদিন আপনি এখানে এসেছেন। কোন্ কথাটা আপনার সত্যি?

দুটোই সত্যি। স্থির কণ্ঠে দুঃশাসন চৌধুরী বললেন।

কি রকম? বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটী চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

মাসখানেক হল আমি বর্মা থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি এবং এই জায়গায় থাকলেও এ বাড়িতে ঠিক আমি ছিলাম না।

কি রকম?

এখান থেকে মাইল পনের দূরে আমাদের একটা কোলিয়ারীতে গোলমাল চলছিল, এখানে এসে পৌঁছবার পরই সেখানে আমাকে দাদা অসুস্থ বলে তার নির্দেশে চলে যেতে হয়। এই সবে সেখান থেকে দিন দশেক হল এই বাড়িতে ফিরে এসেছি।

কিরীটী দুঃশাসন চৌধুরীর জবাবে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে, তারপর আবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন শুরু করে, দালাল সাহেবের কাছে জবানবন্দিতে আপনি রুচিরা দেবীর কথায় অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, আপনি রায়বাহাদুরের নিহত হওয়ার সংবাদটা নাকি তাঁকে আদৌ দেননি। অথচ রুচিরা দেবী জোর দিয়ে বলছেন—

সে মিথ্যে কথা বলছে। আমি কেবল বৃহন্নলাকে সংবাদটা দিয়েছিলাম।

হুঁ। আচ্ছা রায়বাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যে ভৃত্যটিকে আপনি দেখেছিলে তার নাম কি?

কৈরালাপ্রসাদ।

কতদিন সে এখানে আছে?

দাদার খাসভৃত্য, শুনেছি বছর পাঁচেক সে এ বাড়িতে কাজ করছে, ইদানীং রোগী ঘরের যাবতীয় ফাই-ফরমাশই সে খাটত।

লোকটা বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হয়।

আচ্ছা আপনি যদি রুচিরা দেবীকে সংবাদটা না দিয়ে থাকেন, তাঁকে কে ঐ সংবাদ দিতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বলতে পারি না।

আপনি কি বিয়ে করেছেন?

কিরীটীর প্রশ্নটা যেন অত্যন্ত অতর্কিত ভাবেই আসে। এবং প্রশ্নের জবাবটা স সঙ্গে না দিয়ে একটু যেন ইতস্তত: করেই দুঃশাসন চৌধুরী বললেন, না।

আর একটি কথা মিঃ চৌধুরী, রায়বাহাদুরের যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল গতকাল রা ঠিক চারটের সময়ই তাঁর মৃত্যু হবে বা কেউ তাঁকে হত্যা করবে—এ ধরনের বদ্ধমূল ধার হবার কোন কারণ ছিল বলে আপনি জানেন কিছু?

না। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, ব্যাপারটাকে তো আমি শোনা অবধি হাস্যকর বলেই কোন গুরুত্ব দিইনি গোড়া থেকেই।

আচ্ছা আপনি এবার যেতে পারেন। বৃহন্নলা চৌধুরকে একটিবার পাঠিয়ে দিন ঘরে।

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

চৌদ্দ

বৃহন্নলা চৌধুরী ও কিরীটীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

গতরাত্রে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ পেয়েই আমি যখন রায়বাহাদুরের ঘ মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানে আপনার কাকা ও আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দে ছিলাম। কিন্তু একটু পরে লক্ষ্য করে দেখি আপনি ঘরে নেই। হঠাৎ ঘর থেকে চ গিয়েছিলেন কোথায় আর কেনই বা গিয়েছিলেন!

আমার ঘরে—কাকা যখন আমার শোবার ঘরে গিয়ে বাবার নিহত হবার সংবাদ দেন আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কাকার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ঘ

গিয়ে ঢুকি কিন্তু পরে ঐ ভীষণ দৃশ্য দেখেই সমস্ত মাথাটা যেন কেমন আমার বোঁ বোঁ করে হঠাৎ ঘুরে উঠল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি আবার ঘর থেকে বের হয়ে যাই, তারপর আবার দালাল সাহেব ডেকে পাঠাতে ফিরে আসি।

রাত্রি সাড়ে তিনটে থেকে আপনার কাকা আপনাকে ডাকতে যাওয়া পর্যন্ত আপনি কি করছিলেন?

গতকালই তো আমি বলেছি, শরীরটা আমার বিশেষ ভাল না থাকায় সন্ধ্যে থেকেই প্রায় আমি আমার ঘরেই ছিলাম। বিছানাতেই শুয়ে ছিলাম, তবে ঠিক ভাল ভাবে ঘুমোইনি। একটা আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থা।

একটা কথা বৃহন্নলাবাবু, আপনি কি সত্যিই আপনার বাবার কোন উইল আছে বলে জানেন না?

যতদূর জানি বাবার কোন উইল নেই। আর থাকলেও আমার সেটা জানা নেই মিঃ রায়।

আপনি বলতে পারেন, আপনার কাকা দুঃশাসন চৌধুরীর প্রতি আপনার বাবার ঠিক মনোগত ভাবটা কেমন ছিল?

কিরীটীর প্রশ্নে স্পষ্টই বোঝা গেল বৃহন্নলা চৌধুরী যেন একটু ইতস্তত‌ই করছেন। জবাবটা দিতে কেমন যেন একটু সংকোচ দ্বিধাবোধ করছেন।

অবশ্য আপনি যতটুকু জানেন, ততটুকুই আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে বৃহন্নলাবাবু!

কাকা তো মাত্র মাসখানেক হল ফিরে এসেছেন। এই সময়ের মধ্যে তেমন বিশেষ কিছু আমার চোখে পড়েছে বলে তো কই আমার মনে পড়ছে না। তবে ইতিমধ্যে কাকা এখানে আসবার পরই একদিন রাত্রে, জানি না কি কারণে বাবা ও কাকা দুজনের মধ্যে একট বচসা কথা-কাটাকাটি হয়েছিল এবং পরদিন সকালেই এখান থেকে মাইল পনের দূরে একটা কোলিয়ারীতে কাকা চলে যান।

সে বচসার বিষয়বস্তুটা কি ছিল কিছুই জানেন না?

না।

সে ঘরে আর কেউ ছিল?

না।

আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

কি একটা স্টেটের কাজেই ঐ সময় বাবার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। দরজার কাছাকাছি যেতেই শুনলাম কাকা খুব যেন রাগত ভাবেই চেঁচিয়ে কথা বলছেন।

শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর কোন কথা? মনে করে বলতে পারেন কিছু?

হ্যাঁ, একটা কথা কেবল শুনতে পেয়েছিলাম, কাকা বলছিলেন, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। এভাবে বঞ্চিত করবার তোমার কোন আইনগত অধিকার নেই জানবে। তারপরই কাকা দেখলাম ঘর থেকে দ্রুত চঞ্চল পদেই যেন বের হয়ে গেলেন। বাবার ঘরে ঢুকে দেখি বাবাও যেন তখন বেশ উত্তেজিত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঐ সম্পর্কে আমার কোন কথাই হয়নি সে-সময়ে।

হুঁ। আপনার প্রতি আপনার কাকার মনোগত ভাবটা তো ভাল বলেই মনে হয়, তাই না?

হ্যাঁ, কাকা আমাকে চিরদিনই একটু বেশী স্নেহ করেন। বিদেশেথাকাকালীন একমাত্র আমার কাছেই তিনি যা চিঠিপত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন।

মৌচীর মাইকার বিজনেস তুলে দিয়ে বাঙলাদেশে ফিরে আসবার জন্য আপনার কাকাকে শুনলাম আপনার বাবাই নাকি পীড়াপীড়ি করছিলেন, কথাটা সত্যি?

হ্যাঁ। বাবা কাকাকে একমাত্র ভাই বলে চিরদিনই বিশেষ একটু স্নেহ করতেন। কাকার বিদেশ যাওয়াটা শুনেছিলাম বাবার অমতেই হয়েছিল।

বিদেশ যাওয়ার আপনার কাকার কোন কারণ ছিল বলে জানেন?

বিদেশ যাওয়ার আগে কাকা বাবার ব্যবসাতেই কাজ করতেন। তারপর সঠিক আমি জানি না আসল ব্যাপারটা কি, তবে মনে হয় ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই বোধ হয় কি এক গোলমাল হয়। তারপরই কাকা বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে মৌচীতে তাঁর এক বন্ধু মাইকার বিজনেস করছিলেন সেই বিজনেসে গিয়ে যোগ দেন। এবং শুনেছি ব্যবসায়ে নাকি তাঁর খুব উন্নতি হয় এবং যথেষ্ট অর্থাগমও হতে থাকে।

একটা কথা, আশা করি কিছু মনে করবেন না বৃহন্নলাবাবু, আপনার কাকার বর্তমান আর্থিক অবস্থাটা কেমন বলতে পারেন?

সঠিক আমি জানি না, তবে নগদ টাকা বেশ কিছু তাঁর হাতে আছে বলেই আমার যে ধারণা।

কেন আপনার এ ধারণা—বলতে আপনার আপত্তি আছে কি কিছু?

এখানে এসে অবধিই তিনি আমাকে প্রায়ই বলেছেন কোডার্মাতে আবার তিনি মাইকার বিজনেস বড় করেই শুরু করবেন। ইতিমধ্যে দু'একবার কোডার্মায় গিয়ে ঘুরেও এসেছেন।

আচ্ছা আপনি আপনার পিতার হত্যার ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন কি?

না। ধীর সংহত কণ্ঠে জবাব দিলেন বৃহন্নলা চৌধুরী।

আপনি এবারে যেতে পারেন মিঃ চৌধুরী। আপনার দাদু অবিনাশবাবুকে যদি এ ঘরে একবার দেখা করতে আসতে বলি, আসবেন কি?

যদি মনে কিছু না করেন মিঃ রায়, আমার মনে হয় যদি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা

চান তাহলে তাঁর ঘরে গেলেই বোধ হয় ভাল হয়, কারণ তাঁকে ডাকলে যে তিনি আসবেন আমার তো মনে হয় না।

ডাঃ সানিয়ালের ঘর থেকে বের হয়ে ডাঃ সমর সেন কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে—সিঁড়ি যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এসে পৌঁছতেই যেন হঠাৎ চমকে ওঠেন।

ঠিক সামনেই তাঁর দাঁড়িয়ে রুচিরা। বোধ হয় নীচে গিয়েছিল। সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল।

রুচিরা!

রুচিরা ডাঃ সেনের ডাকে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায় একটু যেন চমকেই।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল রুচিরা।

নীচে বাইরের ঘরে এস।

চল।

রুচিরাকেই অতঃপর অনুসরণ করে ডাঃ সেন পূর্বরাত্রের সেই নীচেকার বিরাট খালি ঘরটার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কাল রাত্রে দেখা গিয়েছিল ঘরের জানলা-দরজাগুলো বন্ধ, কিন্তু আজ দেখা গেল জানলাগুলো খোলা। একটা খোলা জানলার সামনে দুজন এসে দাঁড়ায়।

রুচিরাই প্রথমে কথা বলে মৃদু হেসে, তোমাকে কাল রাত্রে বাড়িতে দেখেও কেন না চেনবার ভান করেছি তাই জিজ্ঞাসা করবে তো?

হ্যাঁ, তাছাড়া—

তাছাড়া আবার কি?

তাছাড়া সমীরবাবুর সঙ্গে যে অলরেডি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে সেইটাই বা এতদিন জানাওনি কেন?

রুচিরা ডাঃ সেনের কথার জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

ডাঃ সেন আবার বলেন, এইজন্যই যে এতদিন বার বার তোমার কাছে প্রোপোজ করা সত্ত্বেও আমায় কোন জবাব দাওনি তাও বুঝলাম, কিন্তু এর তো কোন প্রয়োজন ছিল না রুচিরা!

রুচিরা তথাপি চুপ।

কি, জবাব দিচ্ছ না যে?

যে জবাবই এখন দিই না কেন, তুমি তো বিশ্বাস করবে না সমর?

বিশ্বাস করব না!

না। তারপর একটু থেমে আবার বলে, কার কাছে তুমি কি শুনেছ তা জানি না। তবে আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্ততঃ আমাকে এতদিনে বুঝতে পেরেছ।

হ্যাঁ, বুঝেছি বৈকি। বড়লোক স্বামীর লোভ তুমি ছাড়তে পারনি বলেই গরীব আমাকে নিয়ে তুমি এতদিন ধরে খেলা খেলছ!

সমর!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল বলতে পার রুচিরা দেবী?

তোমার আর কোন কথা যদি না থাকে তো এবারে আমি যাব!

যাবে বৈকি। খেলাটা যখন জানতে পেরে গেছি—

সমর সেনের কথাটা শেষ হল না, ঘরের মধ্যে কিরীটীর গলা শোনা গেল, সমরবাবু!

দুজনেই চমকে অদূরে উপস্থিত কিরীটীর দিকে তাকায়। কিরীটী যে ইতিমধ্যে নিজের ঘর থেকে বেরুবার মুখে সিঁড়ির সামনে ওদের দূর থেকে দেখে একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে ওদের কথাগুলো শুনেছে সেটা দুজনের একজনও টের পায়নি।

কিরীটী অতঃপর বলল, আপনারা দুজনেই একটু ভুল বুঝেছেন দুজনকে। ডাঃ সেন আপনার এটা অন্ততঃ বোঝা উচিত ছিল যে রুচিরা দেবীর মা এখানে বর্তমান।

আমি জানি তা মিঃ রায়, ডাক্তার সেন বললেন।

কিরীটী আবার যেন কি বলতে যাচ্ছিল, এবার রুচিরা বাধা দিল, মিঃ রায়!

না রুচিরা দেবী, মিথ্যে মনগড়া মনোমালিন্যের বোঝা টেনে লাভ নেই। শুনুন ডা সেন, ওঁর মা সমীরবাবুর সঙ্গে ওঁর বিয়ের সব কথাবার্তা ঠিক করলেও ওঁর মত পাননি— বলেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলে, ঝগড়াটা তাহলে এবার মিটিয়ে ফেলুন, আমি চলি।

কিরীটী স্থানত্যাগ করে।

পনের

অবিনাশ চৌধুরীর ঘরের দরজা ভেতর হতে ভেজানোই ছিল।

দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত করে কিরীটী। ভেতর হতে সুমিষ্ট শান্ত গলায় প্রশ্ন আসে, কে?

আমি কিরীটী।

আসুন। ভেতর থেকে আহ্বান আসে।

দরজা ঠেলে কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

খোলা দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন অবিনাশ চৌধুরী।

হাত দুটি তাঁর পশ্চাতের দিকে নিবদ্ধ। পরিধানে দামী শান্তিপুরী মিহি ধুতি

গিলে করা কোঁচাটা মেঝেতে লুটোচ্ছে। গায়ে একটা সবুজ রঙের কাশ্মীরী কলকা-তোলা দামী শাল।

মেঝেতে পুরু দামী গালিচা বিছানো। একপাশে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এলোমেলো পড়ে আছে।

দেয়ালের দিকে ঘেঁষে একটি কাচের আলমারি। ভেতরে সুন্দর ভাবে সাজানো নানা বই।

অবিনাশ চৌধুরী একবার ফিরেও তাকালেন না। যেমন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিরীটীও নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর রায় মশাই, কি মনে করে আমার ঘরে? মৃদু শান্ত কণ্ঠে এক সময় অবিনাশ চৌধুরী আগের মত দাঁড়ানো অবস্থাতেই প্রশ্ন করলেন।

আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল কাকা সাহেব!

কথা?

আজ্ঞে।

আবার কিছুক্ষণ পীড়াদায়ক স্তব্ধতা।

কেবল ঘরের দেয়ালে বসানো একটি সুদৃশ্য দামী জার্মান ক্লক সময়-সমুদ্রের বুকে একটানা শব্দ জাগিয়ে চলেছে টক্ টক্ টক্ টক্ টক্।

বলে ফেলুন, শুনি কি কথা! পুনরায় কিছুক্ষণ বাদে অবিনাশ চৌধুরীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

আপনি বোধ হয় বুঝতেই পেরেছেন কাকা সাহেব, কি সম্পর্কে এবং কি কথা আমি বলতে চাই? কিরীটী বলে।

আমি তো অন্তর্যামী নই যে আপনার মনের কথা জানতে পারব মশাই। তবে যা জিজ্ঞাসা করতে চান একটু চটপট করলে বাধিত হব।

সামান্য কয়েকটা কথাই আমি জিজ্ঞাসা করব, বেশীক্ষণ আপনাকে আমি বিরক্ত করব না। আমি বলছিলাম রায়বাহাদুরের—

সহসা এতক্ষণে ফিরে দাঁড়ান অবিনাশ চৌধুরী এবং ক্ষণকাল তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নিঃশব্দে।

সত্যিই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি সেই রহস্যভেদী না? দুর্যোধনের অঘটন-পটিয়সী অদ্ভুত শক্তিধর কিরীটী রায়! তা বেশ, দুর্যোধনের হত্যার রহস্যভেদের জন্য লেগেছেন বুঝি? কিন্তু পারবেন—ধরতে পারবেন দুর্যোধনের হত্যাকারীকে? পারবেন ধরতে?

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে। মৃদু হাস্যোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে, চেষ্টা

করে দেখি।

কিরীটীর কথায় কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অবিনাশ চৌধুরী বললেন, করুন চেষ্টা তবে। হ্যাঁ, পারেন যদি আমি নিজে আপনাকে একটা reward দেব। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

না, আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না। দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাব।

দু-চারটে কেন, হাজারটা করুন না! হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম ব্যাপারটা ঠিক কি হল! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। দুর্যোধন সত্যি-সত্যিই শেষ পর্যন্ত নিহত হল! কিন্তু কেন? কেন—কেন সে এমন brutally নিহত হবে—শেষের দিককার কথাগুলো কতকটা যেন আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করে অবিনাশ চৌধুরী ঘরের মধ্যে আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

নিঃশব্দে গালিচা-বিস্তৃত ঘরের মেঝেতে অবিনাশ চৌধুরী পরিক্রমণ করছেন। পূর্বের মতই হাত দুটি তাঁর পশ্চাতের দিকে নিবদ্ধ।

আত্মগতভাবেই যেন অবিনাশ চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন, It's a curse! বুঝলে curse—অভিশাপ! সুরমার অভিশাপ! একটা দিনের জন্যও মেয়েটাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। একটা দিনের জন্যও শান্তি দেয়নি।

কার কথা বলছেন কাকা সাহেব? কিরীটী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

কিরীটীর প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী যেন চমকে ওঠেন, অ্যাঁ, কি বললেন! না, কারও কথাই নয়। কিন্তু আপনি—আপনি এখানে কি চান? কি প্রয়োজন আপনার? শেষের দিকে অবিনাশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বরও যেন বদলে গেল। রুক্ষ, কর্কশ।

এবং পরক্ষণেই—মহাবীর সিং! মহাবীর সিং!—বলে অবিনাশ চৌধুরী চিৎকার করে ভৃত্যকে ডাকেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে গেল এবং বৃদ্ধগোছের একজন বোধ হয় রাজপুত, ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল, জি মহারাজ!

বাঈজী! অবিনাশ চৌধুরী বললেন।

মহাবীর সিং আবার পূর্বদ্বারপথেই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এবং মহাবীর সিং ঘর ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার কিরীটীর দিকে তাকিয়ে অবিনাশ রুক্ষ স্বরে বলেন, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন!

আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা মিঃ চৌধুরী।

কথা! কি কথা? এখন আমার সময় নেই কোন কথা শোনবার বা বলবার।

কিন্তু—

আঃ, বলছি না সময় নেই!

বেশিক্ষণ আমি সময় নেব না।

এক মিনিট সময়ও আমার নেই।

মুন্না বাঈজী ঘরের মধ্যে এসে এমন সময় প্রবেশ করল।

অতি সাধারণ একখানি রক্তলাল চওড়াপাড় বাসন্তী রঙের খদ্দরের শাড়ি পরিধানে। অনুরূপ রক্তলাল বর্ণের সাটিনের হাফ-হাতা ব্লাউজ গায়ে। বিকীর্ণ-কুন্তলা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম সুর্মার টান।

সরু সরু চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো। নখ হতে যেন রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।

আমায় ডাকছিলেন চৌধুরী মশাই?

এস মুন্না। একেবারে সম্পূর্ণ অন্য কণ্ঠস্বর। যেন অবিনাশ চৌধুরী নয়।

আজ সকালে তুমি যে ভৈরো রাগটা ধরেছিলে, কিছুতেই মনের মধ্যে আর সে সুরটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সুরটাকে ফিরিয়ে আনতে পার বাঈজী!

মুন্না বাঈজী নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে মেঝের গালিচার ওপর হতে বীণাটা কোলে টেনে নিয়ে তারে মৃদু আঘাত করল।

তারের বুকে রিনিঝিনি শব্দ জাগে। এবং সেই সঙ্গে কণ্ঠও বাঈজীর গুনগুনিয়ে ওঠে। অবিনাশ গালিচার ওপরে বসে একটা তাকিয়া কোলের কাছে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নিজেকে তাকিয়ার ওপর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন।

ষোল

কিরীটী কিন্তু যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে।

সে নিজে অত্যন্ত সঙ্গীতপিপাসু হলেও, বর্তমানে তার সমগ্র চিন্তারাজ্যকে মন্থন করে যে চিন্তা ঘূর্ণাবর্ত রচনা করছিল—সঙ্গীতের সুর তার মধ্যে যেন কোনমতেই প্রবেশ করতে পারে না। এতটুকু স্পর্শও যেন করে না।

অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। কতকগুলো প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছ থেকে পেতেই হবে। কিন্তু অবিনাশ চৌধুরীর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, অত সহজে তাঁর কাছ থেকে কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া বোধ হয় যাবে না। এ অবস্থায় ঠিক কি ভাবে অবিনাশ চৌধুরীর কাছে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে তাঁর জবাব পাওয়া যায়।

বাঈজী তখনও গুনগুন গলায় তান তুলে ভৈরো রাগটা আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে। কিরীটী কতকটা অনন্যোপায় হয়েই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এতক্ষণ সে তার স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেও, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করেই অবিনাশ চৌধুরীকেই পর্যবেক্ষণ করছিল।

ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে সহসা তার দৃষ্টি দেওয়ালের গায়ে টাঙানো

কতকগুলো ফটো ও চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই কিরীটী ফটো ও চিত্রগুলো দেখতে থাকে।

চিত্রগুলো সব বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের।

নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ, দানীবাবু, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, শিশির ভাদুড়ী, কৃষ্ণভামিনী, তারা-সুন্দরী, বিনোদিনী, কুসুমকুমারী প্রভৃতির। আর সেই সঙ্গে কয়েকটি ফটো—বিখ্যাত সব নাটকের কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের রূপসজ্জায়। সাজাহানের ঔরংজীব, প্রফুল্লর রমেশ, চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য, প্রতাপাদিত্যের ভবানন্দ ইত্যাদি।

একসময় কিরীটীর অভিনয় দেখবার প্রচণ্ড নেশা ছিল ছাত্রজীবনে। এক গিরিশ ঘোষ ও সেই সময়কার দু-একজন ব্যতীত প্রায় সব নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদেরই সে প্রায় চেনে। কিন্তু বিশেষ ঐ বিভিন্ন রূপে সজ্জিত অভিনেতাটিকে তো কখনও ইতিপূর্বে কোন নাট্যালয়ে দেখেছে বলে কই স্মরণ করতে পারছে না!

হঠাৎ একটি ফটোর সামনে কৌতূহলভরেই সে এগিয়ে গেল। ঔরংজীবের রূপ সজ্জায় ফটোটি।

মুখটা বিশেষ করে চোখ দুটি চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে যেন। কে ঐ অভিনেতা? কে?

সহসা যেন বিদ্যুৎ-চমকের মতই মানসপটে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যায়।

তবে কি—

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় কিরীটী। এবং ঘুরে দাঁড়াতেই অবিনাশ চৌধুরীর কৌতূহলী দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হয়।

কি দেখছেন মিঃ রায়! অবিনাশ চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

আপনারই রূপসজ্জার ফটো বোধ হয় এগুলো? প্রশ্ন করে কিরীটী।

এতক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে যার উপস্থিতিকে অবিনাশ চৌধুরী ভ্রূক্ষেপমাত্রও করেননি—ফিরে তাকাননি পর্যন্ত তার দিকে, কিরীটীর ঐ শেষের প্রশ্নে সেই অবিনাশ চৌধুরী যেন সচকিতে মুখ তুলে তাকালেন ওর দিকে এবং এতক্ষণের মৌনতা ও বিরক্তি যেন সহসা মুহূর্তে এক নির্মল স্নিগ্ধ কৌতুক হাসিতে রূপান্তরিত হল।

স্নিগ্ধ প্রসন্ন কণ্ঠে চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ। এককালে আমার ঐ থিয়েটার করা একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল রায় মশায়—বলতে বলতে সহসা উপবিষ্ট অবিনাশ গালিচা ছেড়ে উঠে কিরীটীর একেবারে পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন।

আপনি কখনও পাবলিক স্টেজে অভিনয় করেছেন?

না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী ভাবে অভিনয় আমার ধাতে ঠিক খাপ খেত না রায় মশাই। স্টেজ ও অভিনয়ের ব্যাপারে আমার যেমন আগ্রহ কৌতূহল ও নিষ্ঠার

অভাব ছিল না তেমনি অর্থব্যয়ও কম করিনি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, ওদের দেশের অভিনয়, অভিনেতা ও ওখানকার রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবার জন্য ওদের দেশেও গিয়েছি এবং জীবনে একসময় অভিনয়কেই পেশা বলে গ্রহণ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না রায় মশাই, এদেশের অভিনয়শিল্পের সঙ্গে যে সব পুরুষ ও নারী সংশ্লিষ্ট, বলতে গেলে তাদের মধ্যে সকলেরই প্রায় অত বড় একটা শিল্পের প্রতি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থাকা দরকার তার বিন্দুমাত্রও আদৌ নেই। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়কে ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।

দোষটা হয়ত এক পক্ষেরই নয় চৌধুরী মশায়। কিরীটী মৃদু হেসে বলে, জনসাধারণের কাছ থেকেই বা অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কতটুকু সম্মান পেয়ে থাকেন আমাদের দেশে বলুন!

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হয়, অর্জন করতে হয় মিঃ রায়। ভিক্ষুকের মত হাত পেতে তা মেলে না।

কিরীটী ও অবিনাশ চৌধুরীর কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে কখন এক সময় বাঈজী গুনগুন করে কণ্ঠে যে তান তুলেছিল সেটা মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে কখন এক সময় ওদের কথাবার্তায় কান দিয়েছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে ক্রোড়স্থিত বীণার তারে মৃদু মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিল।

মধ্যে মধ্যে ঝিনঝিন একটা মিষ্টি তারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

অবিনাশ চৌধুরী যেন কিরীটীর প্রতি সহসা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

অবিনাশ ও কিরীটী অভিনয়-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় এতটা তন্ময় হয়ে ওঠে যে, বাঈজী যে একপ্রকার বাধ্য হয়েই একসময় ক্রোড়স্থিত বীণাটি গালিচার ওপরে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অবিনাশ চৌধুরীরও যেন সেটা নজরেই পড়ে না।

কিরীটী অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনায় নিবিষ্ট থাকলেও, তার মনের সক্রিয় অংশটা কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—কখন কোন ফাঁকে সে তার আসল বক্তব্যের মধ্যে প্রবেশ করবে!

সুযোগ করে দিলেন অবিনাশ চৌধুরী নিজেই। সহসা তিনিই কিরীটীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি যেন প্রয়োজন ছিল আমার কাছে রায় মশাই, আপনি বলছিলেন—

না না থাক, সে অন্য সময় হবে'খন।

উঁহু! স্বর্ণলঙ্কাধিপতি রাবণের খেদোক্তি শোনেননি, আজ নয় কাল এই করে করে স্বর্গের সিঁড়ি শেষ পর্যন্ত তাঁর তৈরী করাই হল না। বলুন, out with it!

বিশেষ তেমন কিছু না। আপনি তো জানেন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েই রায়বাহাদুর আমাকে এখানে আনিয়েছিলেন! এখন যদি তাঁর হত্যাকারীকে—

কথাটা কিরীটী শেষ না করেই থেমে গেল এবং সঙ্কোচের সঙ্গে অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকায়।

অবিনাশ চৌধুরীও যেন হঠাৎ ঐ কথায় কেমন কিছুক্ষণের জন্যে গুম হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, কিরীটীর মনে হয় অবিনাশ চৌধুরী কেমন যেন একটু চিন্তিত—তাঁর প্রশস্ত উন্নত ললাটে কয়েকটা চিন্তার রেখা জেগে উঠেছে।

এক সময় ধীরে ধীরে অবিনাশ চৌধুরী বলতে শুরু করলেন, কি জানেন রায় মশাই, সবই দুর্ভাগ্য। নচেৎ বয়েস হয়েছে আমার, যাবার কথা তো আমারই। কিন্তু চলে গেল দুর্যোধন। অবিশ্যি আপনারা বলবেন সে তো অসুস্থ ছিলই। তা ছিল—ঐ ভাবে না মরে যদি সে অসুখেই মারা যেত, তবে তো দুঃখটা এত হত না। এত painful হত না ব্যাপারটা। ওরা তো জানে না, এই বিরাট কোলিয়ারীর বিজনেস দুজনে মিলে আমরা গায়ের রক্ত জল করে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে কি ভাবে গড়ে তুলেছিলাম! এই মাত্র বছর দুই হল কাজ থেকে অবসর নিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। দুর্যোধন যে আমার কতখানি ছিল, ভাইপো হলেও সে আমার বন্ধু বলতে বন্ধু, সুহৃদ, পরামর্শদাতা, সঙ্গী সাথী—একাধারে সে-ই আমার সব ছিল। দুর্যোধনই ছিল এ গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষের মত মানুষ। নচেৎ এই চৌধুরী-বাড়িতে আর মানুষ বলতে একটা প্রাণীও আছে নাকি? ওর একমাত্র ছেলে ঐ বৃহন্নলা। ওটা তো মেয়েমানুষের অধম—effiminate, মেরুদণ্ডহীন। একমাত্র ঐ ভাই দুঃশাসন ওটার কিছু বুদ্ধি ছিল; কিন্তু ওটার মাথায়ও পোকা আছে!

পোকা আছে? কিরীটী প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায় অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে।

তা নয় তো কি? নইলে ও হতভাগাটার মধ্যেও পার্টস্ ছিল। এককালে চমৎকার গান-বাজনার শখ ছিল। কিন্তু সব গোল্লায় দিয়ে বসে আছে।

কেন, এখন আর গান-বাজনার শখ নেই বুঝি?

না, এখন কেবল এক নেশা হয়েছে—টাকা, টাকা আর টাকা! দিবারাত্র কেবল ফন্দিফিকির আঁটছে কিসে টাকা আসবে!

আচ্ছা শুনছিলাম মৌচীতে বিজনেসে নাকি বেশ টাকা উনি রোজগার করছিলেন, তবে চলে এলেন কেন হঠাৎ?

বেশ টাকা রোজগার করছিল না ঘোড়ার ডিম! সেখানকার ব্যবসা নষ্ট করে এখন এখানে বসে সব লণ্ডভণ্ড করবে এই মতলব। মরুক গে। দুর্যোধন গেল। আমিও আর কটা দিনই বা! থাকলে ওর আর বৃহন্নলারই থাকত। বৃহন্নলাটা একটা হস্তীমূর্খ। এখন সুবিধেই হল, দুদিনে সব তছনছ করে দেবে।

কিন্তু গতরাত্রে আপনি তো বলছিলেন রায়বাহাদুরের উইল আছে—

উইল ! হ্যাঁ, উইল একটা আছে। আর আমি জানি সে উইলে একটা কপর্দকও কারও নষ্ট করবার ক্ষমতা নেই এমন ভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সাত-সাতটা কোলিয়ারীর দেখাশোনা করবে কে ? কাঁচা পয়সা কোলিয়ারীতে। ওরা কাকা-ভাই-পোই তো দেখবে সব। দিনের আলোয় পুকুর চুরি হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে ?

আচ্ছা উইলটা কি রেজেষ্ট্রি করা আছে ?

তা জানি না, সংবাদ রাখি না।

আচ্ছা কাকা সাহেব, রায়বাহাদুর যে নিহত হবেন গত রাত্রে রাত চারটের সময়, এই বদ্ধমূল ধারণাটা তাঁর কেন হয়েছিল বলতে পারেন কিছু ? কোন কারণ ছিল কি ?

কিরীটীর প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, কোন জবাবই দেন না।

তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, না। বলতে পারি না।

আর একটা কথা। গতরাত্রে কে আপনাকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদটা দেয় ?

প্রসাদই তো দেয়।

প্রসাদ !

হ্যাঁ।

কাল রাত সাড়ে তিনটে থেকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?

রাত তিনটে নাগাদ বাঈজী চলে যায়। তারপর পাশের ঘরে আমি শুতে যাই। কিন্তু ঘুম আসছিল না বলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম।

প্রসাদ ঠিক কটায় আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছিল জানেন ? মনে আছে আপনার ?

রাত তখন প্রায় সাড়ে চারটে হবে বোধ হয়।

তখন কি আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন ?

ঠিক ঘুম নয়, বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, এমন সময় প্রসাদ এসে ডাকতেই—

ও-ঘর থেকে ফিরে এসে আপনি বোধ হয় আর শুতে যাননি ?

না। মনটা এমন অস্থির লাগতে লাগল দুর্যোধনকে ঐ ভাবে নিহত হতে দেখে যে, বাধ্য হয়ে মুন্নাকে এ-ঘরে তখুনি আবার ডেকে পাঠালেন। মুন্নাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র তাকে রাত্রির মত বিদায় দিয়েছিলাম।

মুন্নাবাঈ তখনও জেগেই ছিলেন ?

হাঁ। ও এসে বললে, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ও নিজেও বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল। আমার চাকর গিয়ে ডাকতেই উঠে এসেছিল।

হঠাৎ এমন সময় দেওয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বেলা এগারটার সময়-সঙ্কেত শোনা গেল।

ঘড়ির সময়-সঙ্কেতে কিরীটীর খেয়াল হল অনেকক্ষণ সে ঐ ঘরে আছে। বলে, আচ্ছা অনেক বেলা হয়ে গেল, আর আপনাকে বিরক্ত করব না কাকা সাহেব।

কাকা সাহেবও যেন কিরীটীর কথায় চমকে ওঠেন। এবং অকস্মাৎ একটা প্রশ্ন করে বসেন, আচ্ছা রায় মশাই, দুর্যোধনের মৃতদেহটা কি ওরা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে? প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণের জন্য অবিনাশ চৌধুরী।

হ্যাঁ, ময়নাতদন্তের জন্য পুলিস মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছে।

সৎকার হবে না?

ময়নাতদন্ত হয়ে গেলেই আপনারা সৎকারের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

তার আয়োজন কিছু ওরা করেছে জানেন?

আমি এখুনি গিয়ে বৃহন্নলা ও দুঃশাসন চৌধুরীর কাছে সংবাদ নিচ্ছি।

দয়া করে ওদের বলে দেবেন, আমাকে যেন ওর মধ্যে আর না টানে। আর একটা কথা বলে দেবেন, অস্থিটা যেন গঙ্গায় ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।

বলব।

দুঃখ যেমন দিয়েছে তেমনি নিজেও দুঃখ কম পায়নি। দিক, অস্থিটা গঙ্গাতেই বিসর্জন দিক। তবু যদি মরার পর গিয়ে শান্তি পায়।

কথাগুলো বলে অবিনাশ চৌধুরী যেন হঠাৎ আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। এবং নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে আবার পায়চারি শুরু করেন।

তারপর আবার একসময় পায়চারি থামিয়ে অবিনাশ চৌধুরী বলেন, মৃত্যুর পরে ঐসব প্রেতলোকটোক আপনি মানেন রায় মশাই?

হিন্দুর ছেলে যখন তখন চিরন্তন সংস্কারকে একেবারে এড়াব কেমন করে বলুন!

বিশ্বাস করেন তাহলে?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসে।

এই যে সব লোকে বলে অতৃপ্ত বাসনা বা কামনা নিয়ে মরলে বায়বীয় সত্তা সেই বাসনা বা কামনার জন্য এই পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে, বিশ্বাস করেন এসব কথা?

কিরীটী অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে অতঃপর না তাকিয়ে পারে না। বিশেষ করে অবিনাশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শুনে। অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন ওর মনে হয় একটা অলিখিত ভয় ও শঙ্কা যেন সে মুখের রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন?

অবিনাশ চৌধুরী অতঃপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে প্রলম্বিত একখানি নিজেরই ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যেন কি দেখতে লাগলেন। আর একটি কথাও কিরীটীর সঙ্গে বললেন না।

কিরীটী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু অবিনাশ চৌধুরী পূর্ববৎ পায়চারি করতে লাগলেন।

কিরীটী ঘর হতে বের হয়ে আসবার জন্য অতঃপর দুয়ারের দিকে পা বাড়ায়।

কিরীটী অবিনাশ চৌধুরীর ঘর থেকে বের হয়ে কি ভেবে আবার রায়বাহাদুর দুর্যোধনের ঘরের দিকে অগ্রসর হয় এবং ঢুকতেই হঠাৎ মেঝেতে রায়বাহাদুরের শূন্য খাটটার নীচে কি একটা বস্তু চিক্‌চিক্ করছে তার নজরে পড়ে। কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে তুলে নেয় নীচু হয়ে বস্তুটি। একটা লাল সুতোয় বাঁধা সোনার লকেট। লকেটটা খুলতেই ভেতর থেকে প্রকাশ পেল অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণীর মুখচ্ছবি। কে? কার ফটো?

সতের

অবিনাশ পায়চারি করছেন আর মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন—

নির্মম নিয়তি। অন্তিম সময়ে
একি মহা বিস্মরণ! গুরুদেব!
গুরুদেব!—ক্ষমা কর। ক্ষমা
কর প্রভু। অস্ত্র আবাহন মন্ত্র
দাও প্রভু ফিরাইয়া মোরে।

নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন গান্ধারী দেবী।

কাকামণি!

কে? ফিরে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ চৌধুরী।

আমি গান্ধারী।

আয় মা' দুর্যোধন—দুর্যোধনকে কি ওরা নিয়ে গেল?

হ্যাঁ। এই আধঘণ্টাটাক আগে পুলিসের লোক এসে মৃতদেহ নিয়ে গেছে।

অভিশাপ—বুঝলি মা এ সুরমার অভিশাপ!

সতী নারী দেছে অভিশাপ।
তীব্র নিরাশায় কেটে যাবে দিন
সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী—
আমার মনের ব্যথা কেহ বুঝিবে না,
কণ্টক হইবে শয্যা—

কাঁদতে পারছি না-মা—আমি কাঁদতে পারছি না। সুরমাই আমার সমস্ত চোখের জল মুছে নিয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে অবিনাশ চৌধুরী আবার বলতে থাকেন, চার বছর আগে এই বাড়ি থে যেদিন সুরমার মৃতদেহটা পালঙ্কের ওপর থেকে নিয়ে ওরা বের হয়ে গেল, সেই দিন—সে দিনই এ-বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য বিদায় নিয়েছিল চিরদিনের মতই। একটা দিনের জন্য তা শান্তি দেয়নি ওই দুর্যোধন। টাকা—টাকাই কেবল চিনেছিল। কিন্তু পারলি নিয়ে যে সঙ্গে সেই টাকা? একটা পয়সা নিয়ে যেতে পারলি? এত চিকিৎসা, এত আয়ো সবই মিথ্যে হয়ে গেল তো?

আপন মনেই এবং আপন খেয়ালেই যেন অবিনাশ কথাগুলো বলে যান। গান্ধা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে থাকে।

মেজাজী ও অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির খুল্লতাতকে গান্ধারী দেবী বেশ ভাল ক চেনেন। নিজের চলার পথে আজ পর্যন্ত এতটুকু বাধাও অবিনাশ কখনও সহ্য করেননি কারও উপদেশ বা পরামর্শকে কোনদিন গ্রহণ করেননি। নিজের বিচারবুদ্ধিতে চিরদিন ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলে বা ব বললে মুহূর্তে যে তিনি বারুদের মত জ্বলে উঠবেন গান্ধারী দেবী তা ভাল করেই জানে তাই বোধ হয় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন গান্ধারী দেবী।

কথাগুলো বলে অবিনাশ আবার আপন মনেই ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগে নিঃশব্দে। তারপর হঠাৎ একসময় যেন অদূরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান গান্ধারী দেবীর প্র দৃষ্টিপাত করে বলে ওঠেন, গান্ধারী, তুই আবার এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কে কি চাস?

একটা কথা বলতে এসেছিলাম কাকামণি!

কি বলবি বলে ফেল! হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?

আশ্চর্য, এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ।

একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে কাকামণি—

কি—কি হয়েছে?

বলছিলাম শকুনি পালিয়েছে—

শকুনি পালিয়েছে! সে কি? হঠাৎ সে হতভাগাটা আবার পালাতে গেল কে কিন্তু তুই—তুই সে কথা জানলি কি করে?

এই কিছুক্ষণ আগে কৈরালা এসে প্রসাদকে বলেছে কথাটা। প্রসাদ আমাকে গেল। বৃহন্নলার টু-সিটার গাড়িটা নিয়ে সে পালিয়েছে।

ইডিয়েট! গর্দভ!

কিন্তু তার পালানো ছাড়া আর উপায়ই বা ছিল কি?

মাথামুণ্ডু কি বলছিস তুই!

উত্তরে গান্ধারী দেবী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকেন।

অবিনাশ খিঁচিয়ে ওঠেন, জবাব দিচ্ছিস না কেন? বল্ না, হঠাৎ সে গর্দভটা গালাতেই বা গেল কেন?

কাল রাত্রে—গান্ধারী ইতস্তত: করতে থাকেন।

কি—কাল রাত্রে কি? উত্তেজিত ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন অবিনাশ।

কাল রাত্রে তখন বোধ করি রাত পৌনে চারটে হবে, ওর পাশের ঘরের লাগোয়াই তো আমার শোবার ঘর, একটা ছপ্ ছপ্ জলে কাপড় কাচার শব্দ শুনে সন্দেহ হওয়ায় আমার ঘরের লাগোয়া যে পেছনের বারান্দা আছে সেই বারান্দা দিয়ে ওর ঘরে বন্ধ জানলার কপাটের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি—

কি—কি দেখেছিস তুই?

ঘরের কুঁজো থেকে জল ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি করে শেকো একটা কাপড় ধুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আলোর সামনে তুলে ধরে কাপড়টা দেখছে। সে সময় আমি দেখেছি—

কি—কি দেখেছিস?

দেখলাম কাপড়ের সেই অংশে ছোপ ছোপ রঙের লাল দাগ। আজও সে কাপড়টা ঘরের কোণেতেই পড়ে ছিল। সকালে কিরীটীবাবু ওর সঙ্গে কথা বলে চলে আসবার পর কাপড়টা পরীক্ষা করে দেখেছি, ধুলেও তাতে অস্পষ্ট রক্তের দাগ লেগে রয়েছে এখনও।

রক্ত! কিসের রক্ত? রক্ত আবার কোথা থেকে এল তার কাপড়ে?

আমি ভেবেছিলাম প্রথমে ছোড়দাই বোধ হয়—

গান্ধারী! চাপা কণ্ঠে একটা যেন গর্জন করে ওঠেন অবিনাশ রোষকষায়িত লোচনে গান্ধারীর দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ কাকামণি, আমি ভেবেছিলাম ছোড়দাই হয়ত—তুমি তো জান না দিন কুড়ি-পঁচিশ আগে একদিন বেলা তখন দুটো কি আড়াইটে হবে দাদা সেই সময়টা দু-চার দিন সুস্থই ছিলেন—নার্স সব সময় বড় একটা কাছে থাকত না, ডাক্তার সানিয়ালও ঐদিন দুপুরে ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন, ওদিকটা একরকম খালিই ছিল, দাদা একটু আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে থমকে দাঁড়ালাম।

অবিনাশের চোখের তারা দুটো তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় ছুরির ধারাল ফলার ন্যায় চকচক্ করতে থাকে। মুখের শিরা-উপশিরাগুলি যেন সজাগ হয়ে ওঠে। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন অবিনাশ, কেন? দাঁড়ালি কেন?

ছোড়দার গলা শুনে।

ছোড়দা—মানে দুঃশাসন?

হ্যাঁ। তাই মনে হয়েছিল।

ঠিক মনে আছে তোর দুঃশাসনের গলাই শুনেছিলি ?

হ্যাঁ, তেমনি কর্কশ ভাঙা-ভাঙা। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছিল। ছোড়দাই দাদার সঙ্গে কথা বলছিল।

কি—কি বলছিল সে ? উত্তেজনায় অবিনাশের কণ্ঠের স্বর যেন বুজে আসে।

বলছিল, বিশ্বাস কর তুমি, ও চিঠি তোমাকে আমি দিইনি। দাদা জবাব দিলেন, হতভাগা তুই ভাবিস তোর হাতের লেখা আমি চিনি না ? কিন্তু আমি এতটুকুও কেয়ার করি না। কিরীটী রায়কে আনাব। যেই চিঠি লিখে থাকুক সব জারি জুরি সে ভেঙে দেবে।

তারপর ?

ছোড়দা তার জবাবে বললে, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর আমি বলছি আমি বিন্দু-বিসর্গও জানি না। তবে এও তোমাকে বলছি, তুমি তোমার উইল যদি না বদলাও তোমার কপালে সত্যিসত্যিই অপঘাতে মৃত্যু আছে।

শয়তান ! বলছিল শয়তানটা ও কথা ?

হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে বোধ হয় সেটা ছোড়দার গলা নয়—

তবে ?

বোধ হয়—এখনও মনে হচ্ছে সেটা শেকোর গলা।

শকুনির গলা !

হ্যাঁ। আমি আর দাদার সঙ্গে দেখা করতে সাহস পেলাম না। কারণ পরমুহূর্তেই দাদা যেন মনে হল অত্যন্ত চটে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এলাম। তারই আধঘণ্টাটাক পরে আবার যখন দাদার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি মুখ লাল করে শেকো দাদার ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। এবং আমার পাশ দিয়েই গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

হুঁ। কিরীটীবাবু এসব কথা জানেন, না জানেন না ?

না বলিনি। কিন্তু শেকো পালিয়েই তো সর্বনাশ করলে। পুলিসের লোকেরা বিশেষ করে মিঃ রায় ওকেই এখন দাদার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করবেন হয়তো—

ননসেন্স ! সন্দেহ করলে হল ? চুপচাপ থাক, কোন কথা কাউকে বলবি না খবরদার। পরেরই সহসা এমন সময় যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হল। যেন

ভেজানো দুয়ার ঠেলে কিরীটী ঘরের মধ্যে পা দিল, ক্ষমা করবেন চৌধুরী মশাই, ক্ষমা করবেন গান্ধারী দেবী। গান্ধারী দেবী, আপনাকে এ-ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই থেকে বাধ্য হয়েই আমাকে interrupt করতে হল আপনাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার মধ্যে। আমি আপনাকে অনুসরণ না করে পারিনি। দরজায় কান পেতে আপনাদের সব কথাও।

আমি এতক্ষণ শুনেছি।

সহসা যেন কিরীটীর কথায় বারুদ-স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ে। চিৎকার করে উঠলেন অবিনাশ চৌধুরী, বেশ করেছেন শুনেছেন! বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে এই মুহূর্তে। হামবাগ্—

বৃথা আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন চৌধুরী মশাই। অবশ্যম্ভাবীকে কেউ রোধ করতে পারে না।

গান্ধারী দেবী যেন পাষাণে পরিণত হয়েছেন। নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকেন নিঃশব্দে।

কিরীটী বলতে থাকে, যে কাজে আমি হাত দিয়েছি সে কাজ আজ আমি শেষ করে যাবই—

রায় মশাই! কিরীটীর কথা শেষ হল না, তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে অবিনাশ চৌধুরী যেন একটা চিৎকার করে ওঠেন।

চৌধুরী মশাই, যাচ্ছি আমি চলে ; তবে একটা কথা কেবল যাবার আগে বলে যাই, আড়ি পেতে লুকিয়ে আপনাদের ঘরোয়া কথা শোনবার মধ্যে আমার দিক থেকে অসৌজন্য হয়তো কিছুটা প্রকাশ পেয়ে থাকবে, কিন্তু ন্যায়ত ও ধর্মত যে স্বর্গত আত্মার কাছে আমি সত্যবদ্ধ—দায়ী, সেটুকু না পালন করে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আমার উপায় নেই। তাই আশা ক'র সেইটুকু বিচার করে আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।

অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে কথাগুলি বলে অতঃপর কিরীটী সত্যি সত্যিই ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং যাবার মুখে হাত দিয়ে ঘরের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল পেছন থেকে।

আর ঘরের মধ্যে নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অবিনাশ চৌধুরী ও গান্ধারী দেবী। দুজনেই নির্বাক, কারও মুখে কথা নেই।

কিরীটী সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে সোনার লকেটটা বের করল।

কার প্রতিকৃতি লকেটের অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত? কে ঐ নারী? এ বাড়ির কোন সঙ্গেই তো মিল নেই। আর রায়বাহাদুরের ঘরের খাটের তলায়ই বা এটা এল কি? লকেটটার সঙ্গে বাঁধা লাল সুতোটা পুরনো হয়ে গিয়েছিল, তাই বোধ হয় ছিঁড়ে গিয়েছে লকেটটার মালিকের অজ্ঞাতে। কিন্তু কার হাতে বাঁধা ছিল লকেটটা? রায়বাহাদুরের কি? সম্ভব নয়, কারণ তাঁর হাতে বাঁধা থাকলে তিনি লকেটটা পড়ে ল নিশ্চয়ই জানতে পারতেন।

তবে কে?

দুঃশাসন—বৃহন্নলা—ডাঃ সমর সেন—সুলতা কর—ডাঃ সানিয়াল—অবিনাশ চৌধুরী, কে—কার হাতে ছিল?

১১ নং পয়েন্ট: মৃত রায়বাহাদুরের ঘরে লাল সুতো বাঁধা সোনার লকেটে সুন্দরী তরুণীর প্রতিকৃতি।

টীকা: কোন ব্যর্থ প্রেমিকের গোপন প্রেমের নিদর্শন নয় তো ঐ লকেট!

আঠার

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিভিল সার্জেনের কাছে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, অতএব সে কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে সৎকারের কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না। তথাপি আজ হোক বা কাল হোক সৎকার তো করতেই হবে। দুঃশাসন ও বৃহন্নলা, সেক্রেটারি প্রাণতোষবাবু ও তহশীলদার ভুবনেশ্বর শর্মার সঙ্গে নিচের মহালে বাইরের ঘরে তারই ব্যবস্থার জন্য নিম্নস্বরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন পরস্পরের মধ্যে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ গৃহস্থঘরে যে স্বাভাবিক কান্নাকাটি ও শোকপ্রকাশ কয়েকটা দিন ধরে চলে অব্যাহত গতিতে তার কিছুই যেন নেই এক্ষেত্রে।

কে জানে স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়ে হত্যা বলেই হয়ত এই স্তব্ধতা। গত রাত্রে ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর হতে কেউ হয়ত একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি, কান্না তো দূরের কথা। অথচ স্বাভাবিক ভাবে সকলেরই হয়ত শোক করা কর্তব্য ছিল।

শোক নেই তবু যেন বাড়ির মধ্যে সর্বত্র একটা শ্বাসরোধকারী বিষণ্ণতা থমথম করে। সবাই যেন কেমন ভীতসন্ত্রস্ত।

সকলেই যেন কান পেতে আছে একটা কিছু শোনবার জন্যে, অবশ্যম্ভাবী একটি পরিণতির আশঙ্কায় প্রত্যেকেই যেন শঙ্কিত, ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুনছে।

নিহত হবার আগে রোগশয্যায় শুয়ে অসুস্থ রায়বাহাদুর গত কয়েকদিন ধরে বলতে গেলে দিবারাত্র যে দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন জাগ্রত ও নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই, সেই দুঃস্বপ্নেরই অশরীরী প্রেতটা যেন এখন এ বাড়ির প্রত্যেকের মনের উপর চেপে বসেছে। যেন সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

শ্রীনিলয়ের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা দুটো ঘোষণা করে।

কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ডাঃ সানিয়ালের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলছিল।

একটু আগে সে দালাল সাহেবের প্রেরিত অনুচরের মুখে সংবাদ পেয়েছে পলাতক শকুনি ঘোষ শেষ পর্যন্ত পুলিসের চোখ এড়িয়ে বেশীদূর পালাবার আগেই ধরা পড়েছে ও তাকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

ধরেছেন তাকে অবশ্য দালাল সাহেব নিজেই। কিছুদূরে একটা কোলিয়ারীতে জরুরী একটা তদন্তে নিজের গাড়িতে করে দালাল সাহেব যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মধ্যে একেবারে দুখানা গাড়ি দুইদিক হতে মুখোমুখি হওয়ায় শকুনি ঘোষের অবস্থাটা সঙ্গীন হয়ে ওঠে এবং একপ্রকার বাধ্য হয়েই দালাল সাহেবের পূর্ব নির্দেশকে অমান্য করে স্থানত্যাগ করবার অপরাধে ধৃত হয়ে সরাসরি একেবারে সশস্ত্র প্রহরীর হেপাজতে হাজতে প্রেরিত হয়েছে। সংবাদটা অবশ্য একমাত্র কিরীটী ও ডাঃ সানিয়াল ব্যতীত এ বাড়ির একটি প্রাণীও জানে না বা কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি।

কিছুক্ষণ পূর্বে কিরীটী ও ডাঃ সানিয়ালের মধ্যে শকুনি ঘোষ সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল।
—তবে কি শকুনিবাবুই অপরাধী মিঃ রায়? প্রশ্ন করেন ডাঃ সানিয়াল।

মনে মনেও অন্ততঃ তিনি কিছুটা অপরাধী বৈকি। নচেৎ ওভাবে হঠাৎ তিনি পালাবার চেষ্টাই বা করবেন কেন? কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়।

আপনার কি সত্যিই মনে হয় স্পষ্ট করে বলুন মিঃ রায়! আপনার ধারণা কি তাহলে শকুনি ঘোষই কাল রাত্রে—কথাটা বলে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন ডাঃ সানিয়াল কিরীটীর মুখের দিকে।

প্রশ্নটা আপনার বড্ড direct ডাক্তার, এক্ষেত্রে অবিশ্যি সত্যিকারের সংবাদটা গোপন করে যাওয়াটাও একটা মস্তবড় অপরাধ। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে নিজের হাতে হত্যা না করলেই উনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হত্যাকারীকে সাহায্য করেছেন। বিচারের দৃষ্টিতে ও আইনে murder ও abetment of murder—দুটো charge কি একই পর্যায়ে পড়ে না?

তবে কি—

ক্ষমা করবেন, অত স্পষ্ট করে কিছুই আমি বলতে চাই না ডাক্তার, তবে শকুনি ঘোষ যে নিবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন একথাও আমি বলব, তাছাড়া এটা হয়ত তাঁর জানা ছিল না, বাঘে এক বার কামড়ালে আঠারো জায়গায় ঘা হয়। ও বড় মারাত্মক ছোঁয়া। বলতে বলতে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হয়ে কিরীটী এবং ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে বলে, কিন্তু আপনাকেও যে আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাস্য ছিল ডাক্তার!

আমাকে?

হ্যাঁ।

কি বলুন তো?

অবশ্য কথাটা সম্পূর্ণই আমার ও আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না।

বলুন না কি জানতে চান মিঃ রায় ?

কথাটা সুলতা কর সম্পর্কে।

সুলতা !

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ সানিয়ালের মুখখানা যেন রক্তিম হয়ে ওঠে। আ হতেই দু'চোখের দৃষ্টি নত হয়ে আসে ডাক্তারের।

কিরীটী মনে মনে না হেসে পারে না। এবং কৌতুকের লোভটাও সম্বরণ কর পারে না।

স্মিত কণ্ঠে বলে, ডাক্তার, মনের খোঁজ নিয়ে মন দিয়েছিলেন তো ?

লাজরক্তিম মুখটা তুলে ডাক্তার বলেন, যাঃ, কি যে বলেন মিঃ রায়। Simpl liked that girl, বেশ মেয়েটি !

সে বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ তবু বলব মনটা দেবার আগে বোধ হয় একটু যাচ করে নিলে পারতেন।

ডাঃ সানিয়াল যেন চমকে ওঠেন কিরীটীর শেষের কথায়।

তাই-ই ডাক্তার, কারণ মহাভারতের উপাখ্যানের সঙ্গে এখানে সামান্য একটু উল্ পাল্টা হয়ে গিয়েছে। মাতুল না হয়ে এখানে হয়েছেন ভাগিনেয়। দুর্যোধন মাতু ভাগিনেয় শকুনি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ডাক্তার কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

শকুনি !

হ্যাঁ। সংবাদটা কিন্তু আপনার রাখা উচিত ছিল।

শকুনি ?

তাই আশ্চর্য, এই সহজ ব্যাপারটা আপনার চোখে পড়েনি ! সুলতা দেবীর প্র শকুনির চাউনিটাই তো ইতিপূর্বে আমার কাছে সংবাদটা ব্যক্ত করেছিল ডাক্তার !

কিন্তু সুলতা—

তা অবশ্য আমার চাইতে আপনারই বেশী জানবার কথা। কিন্তু রাত্রে কফি দি গিয়ে যে এদিকে আপনি একটা প্রচণ্ড জটিলতার সৃষ্টি করে ফেলেছেন !

জটিলতা ?

হ্যাঁ। প্রতি রাত্রেই তাকে আপনি কফি দিয়ে আসতেন ইদানীং, তাই তো ?

ডাক্তার সানিয়াল লজ্জায় আবার দৃষ্টি নত করলেন।

সুলতা দেবী বলেছেন, গতরাত্রেও নাকি আপনিই তাকে কফি দিয়ে এসেছেন অ

গয় জানা নেই যে আমরা আপনার ঘরে ঠিক গতরাত্রে ঐ সময়টায় উপস্থিত থাকায়—লজ্জা এসে আপনাকে আপনার চরণ ধরে বাধা দিয়েছিল।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! আমি তো কাল—

জানি। আপনি তাকে কফি দেননি—অন্ততঃ গতকাল রাত্রে। অথচ মজা কি জানেন, আপনি না দিলেও লোকে জেনেছে আপনিই দিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, যাকে দিয়েছেন তারও সুনিশ্চিত ধারণা তাই।

সে কি!

হ্যাঁ। একেই বলে শয়তানীর চাতুরী।...

কিন্তু! কিরীটীর বক্তব্য শেষ হল না, বাইরে থেকে বন্ধ দরজার কপাটের গায়ে অত্যন্ত মৃদু একটা করাঘাত শোনা গেল।

নিশ্চয়ই রুচিরা দেবী! আপনি একটু অনুগ্রহ করে বাইরে যান ডাক্তার ওপাশের ঐ দরজাটা দিয়ে, ওঁর সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে।

নিশ্চয়ই। ডাঃ সানিয়াল আর কোনরূপ মন্তব্য না করেই কিরীটীর নির্দেশমত ঘরের দ্বিতীয় দ্বারপথে বের হয়ে গেলেন।

এবং পরক্ষণেই দরজার গায়ে আবার মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

আসুন রুচিরা দেবী! কিরীটী মৃদু কণ্ঠে আহ্বান জানায়।

রুচিরাই!

রুচিরা দ্বার ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলে রুচিরাকে, আসুন। বসুন ঐ চেয়ারটায় রুচিরা দেবী।

রুচিরা নিঃশব্দে কিরীটী-নির্দিষ্ট চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারেকের জন্য কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে একেবারে কিরীটীর মুখোমুখি বসল।

খোলা জানালাপথে শীতের পড়ন্ত রৌদ্রালোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। দিনশেষের শেষ লিপি যেন।

কিরীটী রুচিরার দিকে চেয়ে থাকে নিঃশব্দে।

রুচিরার পরিধানে একটা গেরুয়া রঙের দামী মিলের শাড়ি। গায়ে একটা ফিকে আকাশ-নীল রঙের দামী কাশ্মীরী শাল জড়ানো। মাথায় তৈলহীন রুক্ষ চুল এলো খোঁপা করে বাঁধা অবস্থায় কাঁধের একপাশে স্তূপাকার হয়ে আছে। সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী রুচিরা।

কিরীটী তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে রুচিরাকে দেখছিল। গতরাত্রে প্রথম দৃষ্টিতে যাকে ষোল-সতের বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, সুস্পষ্ট দিনের আলোয় তাকে পুনর্বার ভাল করে দেখতেই যেন তার সে ভুল ভেঙে যায়। মুখখানি অতীব কমনীয় ও ঢলঢলে হলেও রুচিরার বয়স তেইশ-চব্বিশের কম নয়, বরং দু-এক বছর বেশীও হতে পারে।

অতঃপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হবার পর কিরীটী প্রশ্ন করে সর্বপ্রথমে, ,আপনি তো কলকাতায় বেথুনে পড়েন রুচিরা দেবী ?

হ্যাঁ, আমার ফোর্থ ইয়ার।

যদি কিছু মনে না করেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনার বর্তমান বয়স কত হল ?

বোধ হয় চব্বিশ। মৃদু অনাসক্ত কণ্ঠে রুচিরা জবাব দেয়।

আপনার পদবী ?

মিত্র।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কিরীটী মনে মনে নিজেকে বোধ করি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে—কি ভাবে তার আসল বক্তব্যটা এবারে সে শুরু করবে। কিন্তু তার আগে সুযোগ রুচিরাই করে দেয়। সে-ই এবারে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আমাকে আপনি ডেকেছিলেন কেন মিঃ রায় ?

ও হ্যাঁ, বিশেষ তেমন কিছুই নয় রুচিরা দেবী। গত রাত্রের সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু তার আগে আপনার—

ভ্রুকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে রুচিরা কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, আপনার মাকে বুঝি জানাননি যে ডাঃ সেনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?

কেন বলুন তো !

কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম এইজন্য যে, মিথ্যে তাহলে আর হয়ত আপনাকে অন্যত্র উনি বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন না।

আমার মাকে আপনি জানেন না মিঃ রায়, কোন একটা ব্যাপারে মা একপ্রকার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে সে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো দুঃসাধ্য।

কিন্তু তাতে করে জটিলতা কি আরও বাড়ে না ? যাক সে কথা, কিন্তু সমীরবাবুকে অন্ততঃ সে কথাটা জানিয়ে দিলেও হয়ত—

সেরকম বুঝলে জানাতেও হবে।

আমি বলব ?

প্রয়োজন নেই। যা করবার আমিই করব।

বেশ। এবার তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক।

কিন্তু যা আমি জানতাম সবই তো দালাল সাহেবকে কাল রাত্রেই বলেছি !

বলেছেন সত্যি, তবে আরও আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রুচিরা কিরীটীর মুখের দিকে।

দেখুন মিস মিত্র, যে প্রশ্নগুলো আপনাকে আমি করব, জানবেন তার জবাবের ওপর

আপনার বড়মামা রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করছে।

কি প্রশ্ন ?

প্রশ্নগুলো অবশ্য কিছুটা গত রাত্রেরই পুনরুক্তি বলতে পারেন। তবু করছি এইজন্য যে কিছু কিছু ব্যাপার আরও স্পষ্ট করে আমি জানতে চাই।

কি জানতে চান বলুন ?

গত রাত্রে আপনার মামার নিহত হবার কথাটা জানবার আগে আপনি কোথায় ছিলেন ও কি অবস্থায় ছিলেন ? অর্থাৎ ঠিক ঐ সময়টাতে—সোয়া তিনটে থেকে পৌনে চারটে পর্যন্ত আপনি জেগে ছিলেন, না ঘুমিয়ে ছিলেন ?

মুহূর্তকাল কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে রুচিরা জবাব দেয়, আমি আমার ঘরে তখনও জেগেই ছিলাম। ঘুম আসছিল না বলে শুয়ে শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিলাম।

কিরীটীর মনে হয় রুচিরা যেন শেষের দিকে একটু ইতস্তত: করে কথাটা শেষ করল।

হুঁ, কাল তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলেন যে আপনি ঐ সময় ঘুমোচ্ছিলেন। যাক গে, কাল রাত্রের মতই এমনি রাত জেগে উপন্যাস পডাটাই কি আপনার অভ্যাস ?

না। তবে ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়ি।

পাশের ঘরে আপনার মা ঘুমিয়ে ছিলেন ?

হ্যাঁ।

কিরীটী ক্ষণকাল আবার চুপ করে থাকে। অত:পর বলে, কেউ আপনার ঘরে ঐ সময় আর ছিল না ?

রুচিরা মুহূর্তকাল যেন আবার একটু ইতস্তত: করে, তারপর বললে, না।

জবাবটা মৃদু। হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে, শুনুন রুচিরা দেবী, সকালবেলা তখন নটা-দশটার সময়ই হবে, আপনি যখন আপনার ঘরে ছিলেন না, সেই সময় আপনার ঘরের মধ্যে আপনা‍ বিনানুমতিতেই আমাকে একবার বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল—

আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন ! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় রুচিরা কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, শুধু আপনার ঘরেই নয়—আপনাদের প্রত্যেককেই না জানিয়ে প্রত্যেকের ঘরেই আমাকে যেতে হয়েছিল। অবশ্য ক্ষমা চাইছি সেজন্য। এবং জানেন না আপনারা কেউ যে, প্রত্যেকের ঘরেই আমি কিছু-না-কিছু সূত্রের সন্ধান পেয়েছি।

সূত্রের সন্ধান !

হ্যাঁ।

আমার ঘরে ? রুচিরা হঠাৎ যেন প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ, আপনার ঘরেও। বলতে বলতে কিরীটী পকেটের মধ্যে সহসা হাত ঢুকিয়ে

কয়েকটি দগ্ধাবশেষ সিগারেটের অংশ বের করে প্রসারিত হাতের পাতার উপর রেখে হাতটা রুচিরা দেবীর চোখের সামনে এগিয়ে ধরল এবং মৃদুকণ্ঠে বললে, এই বিশেষ সিগারেটে দগ্ধাবশেষগুলো আপনার ঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি মিস্ মিত্র। Special Turkish brand সিগারেট! নিশ্চয়ই আপনার ধূমপানের অভ্যাস নেই?

স্তম্ভিত নির্বাক, অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রুচিরা কিরীটীর প্রসারিত হাতের উপর রক্ষিত সিগারেটের অংশগুলির দিকে চেয়ে থাকে।

সামান্য শব্দও তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় না।

আরও বলছি শুনুন, খোঁজ নিয়ে জেনেছি গতরাত্রে এ বাড়িতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সমীরবাবুই এই brand-এর সিগারেটে অভ্যস্ত এবং একটু বেশি মাত্রাতেই ধূমপান করে থাকেন তিনি।

নিষ্করুণ ও কঠোর কিরীটীর অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠস্বর।

অব্যর্থ তীক্ষ্ণ শর সে যেন নিক্ষেপ করেছে।

শরাহত পক্ষিণীর দৃষ্টি রুচিরার দুই চোখের তারায় ঘনিয়ে ওঠে। একটা বোবা যন্ত্রণা যেন তার চোখমুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রুচিরা দেবী! আবার কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এবারে বলবেন কি, অত রাতে সমীরবাবু কেন আপনার ঘরে গিয়েছিলেন? এবং কখনই বা গিয়েছিলেন, আর কতক্ষণ বা সেখানে মানে আপনার ঘরে ছিলেন?

তথাপি নির্বাক রুচিরা।

জবাব দিন রুচিরা দেবী! রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারে একবার যদি আপনি তালিকার মধ্যে এসে যান, আপনারও অবস্থা ঠিক আপনার মাসতুতো ভাই শকুনিবাবুর মতই হবে—হাজত—

একটা অস্ফুট আর্ত শব্দ কেবল রুচিরার কণ্ঠ হতে নির্গত হল। কিন্তু কোন কথা সে বলতে পারল না।

কিরীটী আবার বলে, শুনুন, মিথ্যে আপনি নিজেকে গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছেন। হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ—এ ঠিক মাকড়সার বিষাক্ত রস-গরল। গরল গায়ে লাগলেই ঘা দেখা দেবে। Come out with it! বলুন—

বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, সত্যিই আমি মামার হত্যার ব্যাপারের কিছুই জানি না।

অত্যন্ত দ্রুত কথাগুলি বলে রুচিরা যেন হাঁপাতে থাকে।

সে কথা তো আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি কাল রাতে কখন সমীরবাবু আপনার ঘরে গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণই বা ছিলেন? কেনই বা গিয়ে ছিলেন এবং তিনি স্ব-ইচ্ছায়ই গিয়েছিলেন, না আপনিই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন

বলুন জবাব দিন!

আ—আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

আপনি?

হ্যাঁ।

কখন গিয়েছিলেন তিনি?

রাত তিনটে বাজার বোধ হয় কয়েক মিনিট পরেই। বই বন্ধ করে আমি শুতে যাব, ঠিক এমনি সময় তিনি আমার ঘরে এসে ঢোকেন।

অত রাতে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

না, সন্ধ্যার সময় ডেকেছিলাম—এসেছিলেন ঐ সময়।

হুঁ, তাহলে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তিনি আপনার ঘরেই এসে ঢুকেছিলেন। কতক্ষণ ছিলেন?

বোধ করি আধ ঘণ্টাটাক হবে।

আধ ঘণ্টা, না ঘণ্টাখানেক?

তা ঘণ্টাখানেকও হতে পারে।

হুঁ। ঘণ্টাখানেক যদি হয় তাহলে রাত তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত আপনারা দুজনে আপনার ঘরেই ছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

সমীরের কথাটা বলতেই।

বলেছেন তাঁকে?

না।

কেন?

সুযোগ পাইনি।

কেন?

কেবলই তিনি অন্য কথা বলতে লাগলেন!

এবারে কিরীটীর দ্বিতীয় শর নিক্ষিপ্ত হল রুচিরার প্রতি, দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এবারে বলুন রায়বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদটা আপনাদের কে দিয়েছিল?

সে তো কালই বলেছি, ছোটমামা!

দুঃশাসনবাবু?

হ্যাঁ।

দুঃশাসনবাবু যখন আপনাকে খবরটা দেন, সে-সময় সমীরবাবুও সেখানে উপস্থিত

ছিলেন কি?

কিরীটীর প্রশ্নে রুচিরা কেমন যেন একটু ইতস্তত: করতে থাকে।

বলুন?

না, মামার পায়ের শব্দ শুনে ঘরে কেউ আসছে টের পেয়ে চট করে ঘরের সংলগ্ন বাথ-রুমের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল সমীর।

হুঁ। দুঃশাসনবাবু আপনাকে কি বলেছিলেন?

বলেছিলেন, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—দাদাকে ছোরা দিয়ে কে যেন হত্যা করেছে শীগগিরি আয়—বলেই তিনি ঘর থেকে চলে যান।

তারপর?

কিন্তু সংবাদটা এত আকস্মিক যে কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম

তারপর?

তারপর মাকে গিয়ে সংবাদ দিই।

আপনার মা ঐ সময় জেগে ছিলেন, না ঘুমিয়ে ছিলেন?

ঘুমিয়েই ছিলেন বিছানায়।

আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন, আপনার মা কি গরম জামা গায়ে দিয়েই রাতে বিছানায় ঘুমোন?

না, কেন বলুন তো!

না, তাই বলছিলাম। আপনি হয়ত জানেন না বা লক্ষ্য করবারও সময় পানি রুচিরা দেবী, গতরাত্রে আপনি যখন আপনার মাকে দুঃসংবাদটা দিতে যান তিনি তখন জেগেই ছিলেন। অর্থাৎ ঘুমের ভান করে শয্যায় শুয়েছিলেন মাত্র। তবে এখন বুঝছি আপনার কথাই সত্যি!

রুচিরা কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গতরাত্রে সে যখন তার মাকে ডাকতে যায়, মা তাহলে জেগেই ছিলেন? বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থেকেও ঘুমের ভান করে ছিলেন? কিন্তু কেন? তবে কি—রুচিরার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল কিরীটীর প্রশ্নে!

এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, গতরাত্রে আপনার ও সমীরবাবুর মধ্যে যে আলোচনাই হয়ে থাক—সমস্ত কিছুই তিনি পাশের ঘরে জেগে থাকার দরুন শুনতে পেয়েছেন!

কিন্তু কেন—মা তা করতেই বা যাবেন কেন?

কিরীটী এবারে হেসে ফেলে, তারপর স্মিতকণ্ঠে বলে, তা কেমন করে বলি বলুন আপনাদের সাংসারিক ব্যাপার তো আমার জানা সম্ভব নয়!

But I hate—I simple hate this sort of spying! এ ধরনের কারও

কথা আড়ি পেতে শোনা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। অত্যন্ত বিরক্তিমিশ্রিত রুক্ষকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল রুচিরা।

কিরীটী তার অনুমানকে যাচাই করবার এমন সুবর্ণ সুযোগটি হেলায় যেতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, হয়ত তাঁর ইচ্ছা আপনি সমীরবাবুকেই বিবাহ করেন, তাই!

রুচিরার গোপন ব্যথার স্থানে অতর্কিতেই আঘাত করে কিরীটী। মুহূর্তে রুচিরার সমগ্র চোখমুখ রাগে ও উত্তেজনায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে।

তিক্ত কঠোর কণ্ঠে রুচিরা আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলে ওঠে, তাঁর ইচ্ছা! নিজের ভালমন্দ বিবেচনা করবার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আমার। কারোর ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নেব—তা সে যিনিই হোন না কেন, অন্তত রুচিরার দ্বারা তা হবে না।

শান্ত হোন রুচিরা দেবী. এসব ব্যাপারে বৃথা উত্তেজিত হয়ে তো কোন লাভ নেই। আপনি সমীরবাবুকে বিবাহ করতে চান না সে কথা সুস্পষ্ট ভাবে আর কাউকে না পারেন সমীরবাবুকেও তো অন্ততঃ জানিয়ে দিতে পারতেন এতদিন। আর সেই কথাই আমি একটু আগে বলছিলাম।

সেই কথাই কাল রাত্রে তাকে বলব বলে ডেকে এনেছিলাম গোপনে, কিন্তু লোভী সে—কিছুতেই আমার কথা শুনতে চাইছিল না। যাক গে, না শোনে না শুনুক—তাছাড়া আজ আর বড়মামাও বেঁচে নেই, দায় থেকে আমিও মুক্ত। যার এবং বিশেষ করে তাঁরই ইচ্ছায় এ ব্যাপারটা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল। এইখানেই এর শেষ।

আপনার বড়মামা রায়বাহাদুরই বুঝি ঐ বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন?

হ্যাঁ। সমীরের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে বড়মামা ঐ সমীরের গ্রাস থেকে একটা কোলিয়ারী বাঁচাতে চেয়েছিলেন। মাত্র দিন-দুই হল দাদুর মুখে আমি কথাটা জানতে পেরেছি। আগে তো জানতেই পারিনি।

কে? অবিনাশবাবু আপনাকে বলেছিলেন ও-কথা?

হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি প্রথম থেকেই কথাটায় আমল দিইনি। কিন্তু বিশেষ করে ঐ কথাটা কয়েকদিন আগে জানবার পর কাল রাত্রে খোলাখুলি ভাবেই আমার অমত জানিয়ে দেব ভেবেছিলাম সমীরকে ডেকে এনে।

রুচিরার গতরাত্রের সযত্নরচিত গোপনতার আড়ালটুকু কিরীটী সুকৌশলে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিল। রুচিরা সব কিছু অতঃপর প্রকাশ করে দিল।

আর একটি কথার জবাব চাই আমি আপনার কাছ থেকে মিস মিত্র!

কি?

গতকাল আপনার ছোটমামা যখন আপনাকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদটা দেওয়ার কথা অস্বীকার করলেন তখন আপনি তাঁকে বলেছিলেন—তাঁর কীর্তির কথা নাকি কারও জানতে বাকি নেই! কেন তাঁকে সে কথা আপনি বলেছিলেন বলবেন কি?

কি আর—এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ওঁর এইখানে আসা অবধিই তো বড়মামার সঙ্গে নিত্য প্রায় খিটিমিটি চেঁচামেচি হত, বড়মামা যে অসুস্থ এই সামান্য কথাটাও যেন উনি ভুলে যেতেন—

তাই কি?

শুধু কি তাই! বলতে লজ্জা হয় মিঃ রায়, মার মুখে শুনেছি—একদিন নাকি উইলের ব্যাপারে ছোটমামাকে threaten পর্যন্ত করেছেন!

উনিশ

কিরীটী রুচিরাকে বিদায় দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে মুন্না বাঈজীকে।

মুন্না বাঈজী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

বসুন. নমস্কার। কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে তার সম্মুখস্থিত শূন্য চেয়ারটি দেখিয়ে দিল।

মুন্না নিঃশব্দে উপবেশন করে।

আমাকে আপনি ডেকেছিলেন মিঃ রায়? প্রতিনমস্কার করে মুন্না প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। গতরাত্রে এ বাড়িতে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে, সব শুনেছেন বোধ হয়?

হ্যাঁ।

কার কাছে শুনলেন?

বাবুর মুখেই শুনেছি। গত রাত্রেই সব আমাকে তিনি বলেছেন।

সেই সম্পর্কেই আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই।

বলুন?

কাল কত রাত পর্যন্ত আপনি গানবাজনা করেন?

রাত বোধ হয় তিনটে বাজবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত।

তারপর বুঝি আপনি শুতে যান?

হ্যাঁ।

আবার কখন কাপ্তাসাহেব আপনাকে ডেকে পাঠান তাঁর ঘরে?

বোধ হয় রাত সাড়ে চারটে কি পৌনে পাঁচটা হবে তখন, আকাশ ফিকে হয়ে আসছে—

অবিনাশবাবুর ঘরে ঢুকে কি দেখলেন?

দেখলাম ঘরের মধ্যে তিনি অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। আমার পদশব্দেও তাঁর

খেয়াল হয়নি। আমিই তখন গলাখাঁকরি দিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম। এবারে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, 'কে, ও মুন্না—এস। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মুন্না। দুর্যোধন—দুর্যোধনকে কে যেন হত্যা করেছে।' রায়-বাহাদুর অসুস্থ আমি তিন মাস আগে এখানে যখন আগেরবার মুজরা নিয়ে আসি তখুনি শুনে গিয়েছিলাম। এবারেও এসে শুনেছিলাম তাঁর অবস্থা নাকি একই রকম।

এবার কতদিন হল এসেছেন এখানে?

দিনপাঁচেক হল এসেছি।

সহসা এমন সময় দ্বারে করাঘাত শোনা গেল বাইরে থেকে।

কিরীটী প্রশ্ন করল, কে?

আমি দুঃশাসন। দালাল সাহেব এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন।

কিরীটী বলে, আসুন মিঃ চৌধুরী—ভিতরে আসুন।

দুঃশাসন চৌধুরী দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই, মুন্না নিজের অজ্ঞাতেই চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়েছিল।

দুঃশাসনও মুন্না বাঈজীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই যেন সহসা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ব্যাপারটা কিরীটীর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি এড়ায় না, সেও ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুঃশাসন চৌধুরীই সর্বপ্রথম যেন কতকটা আত্মগতভাবেই অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, কে? কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারাটাই সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

সুস্পষ্ট একটা আতঙ্ক যেন ফুটে ওঠে সমস্ত মুখখানিতে। সহসা বিচিত্র একটা হাসি যেন বাঈজীর অমন সুন্দর মুখখানিকেও বীভৎস করে তুলল। চাপা কণ্ঠে বাঈজী বলে, হ্যাঁ। খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন মিঃ চৌধুরী এখানে আমায় দেখে, না? মরিনি, চেয়ে দেখুন আজও বেঁচেই আছি।

বাঈজীর দিকে চেয়ে কিরীটীই এবার প্রশ্ন করল, আপনি তাহলে জানতেন না দুঃশাসনবাবু এই বাড়িতেই থাকেন?

না।

বলেন কি? আপনাদের পূর্বপরিচয় থাকা সত্ত্বেও জানতেন না? কিরীটী দ্বিতীয়-বার প্রশ্ন করে।

না।

আশ্চর্য! সাবিত্রী তুমি এখানে? এতক্ষণে কোনমতে কথাটা উচ্চারণ করলেন যেন শান্তকণ্ঠে দুঃশাসন চৌধুরী।

সাবিত্রী হঠাৎ হেসে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিটা থামিয়ে বলে, সাবিত্রী—সাবিত্রী

তো অনেকদিন আগেই মারা গেছে চৌধুরী মশায়। এ যা দেখছেন বলতে পারেন তাঁর প্রেতাত্মা। অধীনের নাম মুন্না বাঈজী।

বিষাক্ত একটা কদর্য শ্লেষ যেন বাঈজীর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায়।

মুন্নার জবাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অকস্মাৎ দুঃশাসন চৌধুরী মুন্নার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিরীটীর দিকে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, মিঃ রায়, দালাল সাহেব বোধ হয় আপনাকে ডাকছেন।

বোঝা গেল দুঃশাসন চৌধুরী যে কারণেই হোক ঘর ত্যাগ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, যান দুঃশাসনবাবু, দালাল সাহেবকে এ-ঘরেই ডেকে নিয়ে আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন চৌধুরী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মনে হল তিনি যেন বাঁচলেন।

মুন্না বাঈজী নির্বাক নিশ্চল তখনও বসে আছে। হঠাৎ কিরীটী বাঈজীকে প্রশ্ন করে, কত দিনের আলাপ আপনাদের পরস্পরের, মুন্না দেবী?

অ্যাঁ।...যেন চমকে ওঠে বাঈজী।

শুনেছি মিঃ দুঃশাসন চৌধুরী গত পাঁচ বছর ধরে ভারতবর্ষে ছিলেন না, আপনাদের আলাপ বুঝি তারও আগে?

হ্যাঁ। তা পাঁচ বছর হবে বৈকি। হ্যাঁ, পাঁচ বছর। অস্পষ্ট ভাবেই বাঈজী কথা কটি উচ্চারণ করে।

কিরীটী লক্ষ্য করে বাঈজী অন্যমনস্ক ও চিন্তিত। সে আবার প্রশ্ন করল, ইতিমধ্যে আর আপনাদের পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি বুঝি?

না। মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল বাঈজী।

এমন সময় বাইরে দালাল সাহেবের ভারী জুতোর মচ্‌মচ্‌ আওয়াজটা পাওয়া গেল। এদিকেই আসছেন তিনি বোঝা গেল।

আপনি আপাততঃ যেতে পারেন, তবে আপনি আপনার ঘরে থাকবেন মুন্না দেবী। আমি ঘণ্টাখানেক বাদেই আপনার ঘরেই আসছি আবার। আপনার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে। দালাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলেই আমি আসছি।

দরজা ঠেলে দালাল সাহেব ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন এবং বাঈজী শ্লথ চরণে বের হয়ে গেল।

আসুন দালাল সাহেব, বসুন। কিরীটী দালাল সাহেবকে আহ্বান জানাল।

দালাল সাহেব চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে বললেন, ইয়ে বহুত তাজ্জব কি বাত, হায় মিঃ রায়, শকুনিবাবু তো কই বাত নেহি মানতা!

কি ব্যাপার, কি মানছে না সে ?

ও মু নেহি খুলতা—ইয়ে আপকো হাম জরুর কঁহতে হে ওহি রায়বাহাদুরকো জান লিয়া—

বলেন কি !

হাঁ হাঁ।

অতঃপর দুজনের মধ্যে নিম্নলিখিত আলোচনা শুরু হয়।

শকুনিবাবুকে ধরে এনে হাজতের মধ্যে বন্দী করা অবধি সেই যে লোকটা মুখ বন্ধ করেছে এখন পর্যন্ত একটি কথাও ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি কর্মিৎকর্মা দালাল সাহেব।

কিন্তু এও আপনাকে বলে দিচ্ছি মিঃ রায়, দালাল সাহেব বলতে লাগলেন, রায়-বাহাদুরকে হত্যা করেছে ওই শকুনিই। লোকটার চেহারা আর চোখের চাউনি দেখেছেন, একেবারে পাকা ক্রিমিন্যালের মত।

দালাল সাহেব কিরীটীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

কিরীটী দালাল সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবল প্রশ্ন করে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে মিঃ দালাল ?

হ্যাঁ। ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। একেবারে হার্ট পর্যন্ত ছুরি গিয়ে ঢুকেছে।

Stomach content chemical analysis-এর জন্য পাঠানো হয়েছে ?

হ্যাঁ। কিন্তু হত্যাকারীকেই যখন আমরা মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, তখন—

মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন—কিন্তু প্রমাণ ? প্রমাণ করতে পারবেন কি উনিই রায়-বাহাদুরের হত্যাকারী ?

প্রমাণ ! আমাদের ওর পেটের কথা টেনে বের করতে হবে। সে tactics আমার জানা আছে মিঃ রায়। তাছাড়া কিছু কিছু প্রমাণও already আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই তো এসেই গেছে।

কি রকম ? কি কি প্রমাণ পেয়েছেন বলুন তো যাতে করে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে উনিই অপরাধী, রায়বাহাদুরের হত্যাকারী ?

প্রথমতঃ ধরুন, উনি অপরাধী না হলে অমন করে না বলে কয়ে হঠাৎ ওভাবে পালাতেই বা যাবেন কেন ? দ্বিতীয়তঃ, অপরাধীই যদি উনি না হন এমনি করে মুখ বুজেই বা থাকবেন কেন। সাফ্ সাফ্ সব কথা যা জানেন খুলে বললেই তো পারেন।

আমি আপনাকে বলতে পারি মিঃ দালাল, ঠিক অপরাধী বলে নয়, স্রেফ্ ভয় পেয়েই হয়ত উনি পালাবার চেষ্টা করেছিলেন।

ভয় পেয়ে ! কিসের জন্য ভয় পেয়ে ?

কাপড়ে তাঁর রক্তের দাগ ছিল বলে।

রক্তের দাগ! কোন্ কাপড়ে?

তাঁর ঘরেই যে ধুতিটা এক কোণে পড়েছিল তাতেই রক্তের দাগ ছিল। কিন্তু একটা কথা হয়ত এখনও আপনি শোনেননি মিঃ দালাল, মৃত রায়বাহাদুর নিহত হবার কয়েকদিন আগে টাকাকড়ি ও উইলের ব্যাপার নিয়ে রায়বাহাদুর ও দুঃশাসন চৌধুরীর মধ্যে বিশ্রী একটা বচসা হয়ে যায়, এমন কি দুঃশাসন চৌধুরী রায়বাহাদুরকে নাকি threaten পর্যন্ত করেছিলেন!

বলেন কি? এখুনি তো তাহলে একবার দুঃশাসন চৌধুরীকে ডেকে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত?

তাতে করে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। Most probably he will deny the whole story.

কিন্তু তাই বলে তাকে আমরা সহজে নিষ্কৃতি দোব না। কিন্তু কার মুখে কথাটা শুনলেন?

স্রেফ্ ঘটনাচক্রেই ব্যাপারটা জানা সম্ভব হয়েছে। আড়ি পেতে শুনেছি গান্ধারী দেবী কাকাসাহেবকে যখন কথাটা বলছিলেন।

কাকাসাহেব মানে ঐ বুড়োটা?

হ্যাঁ। রায়বাহাদুরের কাকা অবিনাশ চৌধুরী।

আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

যান না। তিনি বোধহয় এখন তাঁর ঘরেই আছেন।

দালাল সাহেব অতঃপর হন্তদন্ত হয়েই অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী মুন্না বাঈজীর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

একুশ

কথাটা আর চাপা রাখা গেল না।

দালাল সাহেবই সকলকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, রায়বাহাদুরের হত্যাপরাধেই শকুনি ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামার হত্যাপরাধে শকুনি ধৃত হয়েছে এবং বর্তমানে সে হাজতে বাস করছে।

শীতের বেলায় শেষ আলোর ম্লান রশ্মিটুকু একটু একটু করে ক্রমশঃ ধরিত্রীর বুক থেকে যেন মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া বাদুড়ের মত ডানা মেলে যেন চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে একটা কালো পর্দার মত শ্রীনিলয়ের উপরে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ

পর্যন্ত নেই।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কা দুঃস্বপ্নের মত সকলেরই মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সন্ধ্যা নাগাদ ডাঃ সেনও এসে শ্রীনিলয়ে উপস্থিত হলেন।

কিরীটীর ঘরের মধ্যে সকলে উপস্থিত হয়। একমাত্র দালাল সাহেব বাদে, কাকাসাহেব অবিনাশ চৌধুরী, দুঃশাসন চৌধুরী, বৃহন্নলা চৌধুরী, তার স্ত্রী পদ্মা দেবী, গান্ধারী দেবী, তাঁর মেয়ে রুচিরা দেবী, সমীর বোস, নার্স সুলতা কর, ডাঃ সানিয়াল, ডাঃ সমর সেন এবং কিরীটী নিজে।

একমাত্র কিরীটী ছাড়া ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য সকলের চোখেমুখেই কেমন একটা যেন আতঙ্কের ভাব। কিরীটী তার পাইপটা হাতে নিয়ে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন আপনাদের সকলকে কেন এ-সময় এ-ঘরে আমি ডেকে এনেছি—একটু থেমে বলে, আপনারা সকলেই দালাল সাহেবের মুখে শুনেছেন রায়-বাহাদুরের হত্যা-অপরাধে বোধ হয় শকুনিবাবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিস অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি। অথচ আপনারা জানেন না কিন্তু আমি জানি, শকুনিবাবু যদি মুখ খোলেন হত্যারহস্যটা জলের মত হয়ে যাবে এখনি। কারণ তিনি এই হত্যার ব্যাপারে এমন কতকগুলো মারাত্মক কথা জানেন যা একবার পুলিসের গোচরীভূত হতে হত্যাকারী আর তখন আত্ম-গোপন করে থাকতে পারবে না।

কিরীটীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধারী দেবী প্রশ্ন করে, তবে কি শেকো দাদাকে হত্যা করেনি?

না। বজ্রকঠিন কিরীটীর কণ্ঠস্বর, কিন্তু আমি জানি হত্যাকারী কে! হত্যাকারী যতই চতুর হোক এবং যত বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়ে থাক না কেন, এমন একটি মারাত্মক চিহ্ন সে রায়বাহাদুরের শয্যার পাশে রেখে গিয়েছে গতরাত্রে হত্যা করতে এসে, যেটি আজ দুপুরে সেই ঘরটা পুনরায় গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময়ই আমার নজরে পড়েছে। সেটি কি জানেন?

সকলেই চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে।

কিরীটী বলে, যে ছোরাটা গতরাত্রে রায়বাহাদুরকে হত্যা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল তারই শূন্য খাপটা। তাড়াতাড়িতে হত্যাকারী খাপটা ঘরের মধ্যে ভুলে ফেলে এসেছিল। সেই শূন্য চামড়ার খাপটার গায়েই হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে যা থেকে সহজেই প্রমাণ করা যাবে হত্যাকারী কে!

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কটি নরনারীই একেবারে যেন বোবা। সূচ পতনের শব্দও

বোধ হয় শোনা যাবে। কারও মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই।

কিরীটী আবার বলতে থাকে, আপনাদের সকলের কাছেই আমার শেষ অনুরোধ এবং সেইটুকু জানবার জন্যই আপনাদের সকলকে আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, এখনও যদি আপনাদের কারও কিছু জানা থাকে যা এখনও আপনারা গোপন করে রেখেছেন আমাকে বলুন। অন্যথায় পুলিস আপনাদের প্রত্যেককেই নাজেহালের একেবারে চূড়ান্ত করবে। অপমান ও লাঞ্ছনারও অবধি হয়ত রাখবে না। দালাল সাহেব সহজে আপনাদের কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না জানবেন।

কিন্তু তথাপি সব নিশ্চুপ। কারও বাক্যস্ফূর্তি নেই। বোবা ভীত দৃষ্টিতে কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

একজন পুলিস অফিসার ঘরের বাইরে দ্বারের নিকট প্রহরায় দাঁড়িয়েছিল, সে এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কিরীটীর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নস্বরে যেন কি বলল। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বলে, বেশ, আপনাদের আমি আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, পরস্পর আপনারা আলোচনা করে দেখুন। নীচের থেকে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সেরে আসছি।

চলুন। কিরীটী পুলিস অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নীচের একটি ঘরে নিঃশব্দে পুলিসের প্রহরায় মাথা নীচু করে একটা চেয়ারে শকুনি ঘোষ বসেছিল। কিরীটীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল। চোখের ইঙ্গিতে কিরীটী পুলিসের লোকটিকে ঘর ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেই সে ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে আর তৃতীয় প্রাণী নেই, কিরীটী আর শকুনি ছাড়া।

কিরীটীকে একা ঘরের মধ্যে পেয়ে এতক্ষণে সহসা শকুনি কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমাকে বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি—আমি মামাকে খুন করিনি

কিন্তু পুলিস যে সে কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না!

কেন—কেন? আমি নির্দোষ, আমি জানি না, কিছুই জানি না।

কিন্তু আপনার ঘরের কোণে একটা ধুতি পাওয়া গিয়েছে, তাতে রক্তের দাগ এল কি করে?

শকুনি নিশ্চুপ!

তাছাড়া গতকাল রাত্রে সাড়ে তিনটে থেকে রাত সাড়ে চারটে পর্যন্ত আপনি কোথা ছিলেন? ঘরে ছিলেন না তো?

আমি—

অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমি বলছি আপনি ঘরে ছিলেন না—কোথা

ছিলেন ? এখনও বলুন ? কথার জবাব দিন ?

কুণ্ডলেশ্বরবাবুর ঘরে গিয়েছিলাম। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শকুনি জবাব দিল।

কেন গিয়েছিলেন সেখানে ?

আমি—মানে—

মদ খেতে, তাই না ?

শকুনি চুপ।

কতদিন ধরে মদ্যপান করছেন ?

মদ্যপান !

হ্যাঁ। শর্মাই বোধ হয় ঐ ব্যাপারে আপনাকে রপ্ত করিয়েছেন। আজ সকালেও আপনার কথা বলবার সময় মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ পেয়েছি।

বছরখানেক হবে।

হুঁ। তারপর কখন ফিরে আসেন সেখান থেকে কাল রাত্রে ?

রাত সাড়ে চারটে হবে বোধ করি তখন।

সাধারণতঃ কি আপনি ঐ সময়েই শর্মার ঘরে যেতেন মদ খেতে ?

হ্যাঁ। পাছে জানাজানি হয়ে যায় তাই ঐ সময়েই যেতাম তার ঘরে।

পয়সা কে যোগাত, আপনি নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ।

ঘরে ফিরে এসে কি দেখেন ?

রক্তাক্ত আমারই পরনের একটা ধুতি ঘরের কোণে মেঝেতে পড়ে আছে। প্রথমটা আমারই পরিধানের একটা ধুতিতে রক্ত দেখে এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে কি করি বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর রক্তের দাগগুলো কুঁজোর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলি কাপড় থেকে।

হুঁ। আচ্ছা রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ আপনি গতরাত্রেই পেয়েছিলেন, তাই না ?

না।

গতরাত্রে পাননি সংবাদটা ?

না।

তবে ?

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর জানতে পারি।

সেই রাত্তেই। রাত বোধ করি পৌনে চারটে হবে।

নিঃশব্দ নিঝুম শীতের রাত। কেবল একটুক্ষণ আগে নাইট কিপার হুম সিংয়ের

খবরদারীর চিৎকারটা শোনা গিয়েছে।

সেই ঘর। গতকাল রাত্রে এই ঘরের মধ্যেই রায়বাহাদুর ছুরিকাঘাতে আততায়ীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন।

আজ শূন্য সেই শয্যা। কেবল গত রাতের নীল ঘেরাটোপে ঢাকা বাতিটা আজ নেভানো।

ঘরের একধারে ক্যাম্পখাটের উপর নিদ্রাভিভূত কিরীটী। আর কেউ ঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে নেই। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দেয়াল-ঘড়িটার একঘেয়ে টক্‌টক্‌ শব্দ কেবল শূন্য ঘরের মধ্যে যেন সজাগ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে। কিরীটী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। সহসা নিঃশব্দে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। তারপরই ঘরের মধ্যে অতি-সতর্ক পদসঞ্চারে প্রবেশ করল এক ছায়ামূর্তি। ছায়া-মূর্তি পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় নিদ্রিত কিরীটীর শয্যার দিকে।

অল্প পরে আর একটি ছায়ামূর্তি প্রবেশ করে সেই একই পথে। প্রথম ছায়ামূর্তি টেরও পেল না দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি যে তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঐ মুহূর্তে তার পেছনেই প্রবেশ করল অন্ধকারে।

শায়িত কিরীটীর শয্যার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল প্রথম ছায়ামূর্তি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে যেন চোখের পলকে ভোজবাজির মত কিরীটী একটা গড়ান দিয়ে একেবারে শয্যা থেকে নীচে পড়ে গেল এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা আর্ত করুণ চিৎকার অন্ধকারকে চিরে দিয়ে গেল।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গিয়ে সুইচটা টিপে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকেই ফিট করা হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝলমল করে ওঠে।

দালাল সাহেব কিরীটীর পূর্ব-নির্দেশমত এতক্ষণ তার খাটের তলাতেই শুয়ে পেতে ছিলেন। তিনিও ততক্ষণে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন কিরীটীর পাশে।

রক্তাক্ত কলেবরে সামনের মেঝেতেই বসে হাঁপাচ্ছেন দুঃশাসন চৌধুরী। পেছনে রড মাথা হাতে তখনও দাঁড়িয়ে বাঈজী মুন্না, তার দু'চোখে হিংসার আগুন যেন জ্বলছে সহসা মুন্না বাঈজী পাগলের ন্যায় খিলখিল করে হেসে ওঠে, হি, হি! পাঁচ বছর ধরে তোমা খুঁজে বেড়িয়েছি। প্রতিশোধ—এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছি। কেমন—কেমন হয়েছে

What's all this Mr. Roy? এতক্ষণে বিহ্বল হতচকিত দালাল সাহেবের কণ্ঠে স্বর ফোটে।

কিরীটী দালাল সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ভূপতি দুঃশাসনের ক্ষতস্থান থেকে বিদ্ধ ছোরাটা টেনে বের করতে করতে বলে, চট ক

ডাক্তারকে পাশের ঘর থেকে এখুনি একবার ডেকে আনুন, মিঃ দালাল !

দালাল সাহেব ডাক্তারকে ডাকতে ছুটলেন।

প্রচুর রক্তপাতে দুঃশাসন চৌধুরীর অবস্থা তখন ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে আসছে।

মুন্না বাঈজী তখন যেন কেমন হঠাৎ নিঝুম হয়ে গিয়েছে—বিড়বিড় করে বলে চলেছে, কেমন জব্দ ! কেমন প্রতিশোধ ! পাঁচ—পাঁচ বছর ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি !

ডাঃ সানিয়াল ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে, কি ব্যাপার মিঃ রায় ?

দেখুন তো ! He has been stabbed !

কিন্তু দেখবার আর তখন কিছুই ছিল না। নিদারুণ ভাবে আহত ও প্রচুর রক্তপাতে চৌধুরীর অবস্থা তখন প্রায় সকল চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়েছে। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে ও নাড়ী তার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ; তথাপি পরীক্ষা করে বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে বলে, আশা নেই, কিন্তু কেন এমন করে স্ট্যাব্ করল দুঃশাসনবাবুকে মিঃ রায় ?

জবাব দিল মুন্না বাঈজী, আমি—আমি প্রতিশোধ নিয়েছি নারীহত্যার—vendetta.

কয়েকটা হেঁচকি তুলে চৌধুরীর দেহটা স্থির হয়ে গেল।

মরেছে। এবার আপনারা আমায় ধরতে পারেন। শুনুন পুলিস সাহেব, আমার আসল নাম সাবিত্রী। একদিন ঐ নরপিশাচ দুঃশাসন আমার নারীত্বকে এমনি করেই হত্যা করেছিল, তারই প্রতিশোধ নিতে আমি তাকে হত্যা করেছি। আমি ধরা দিচ্ছি, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে এবারে, আমি ফাঁসি যেতেও প্রস্তুত।

ভুল করেছেন সাবিত্রী দেবী। গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে কিরীটী হঠাৎ বলে।

চকিতে মুন্না বাঈজী কিরীটীর কথায় ফিরে কিরীটীর মুখের প্রতি তাকাল, ভুল করেছি !

হ্যাঁ, ভুল করেছেন। উনি তো দুঃশাসন চৌধুরী নন !

কিরীটীর কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত যুগপৎ সকলেই একই সময়ে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কিরীটীর দিকে তাকায়।

হতভম্ব দালাল সাহেবই সর্বপ্রথম কথা বললেন, কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ! উনি—উনি দুঃশাসন চৌধুরী নন ?

না।

তবে কে ? কে উনি ?

বাইশ

রায়বাহাদুরের হত্যাকারী ! খোঁজ নিয়ে দেখুন এতক্ষণে হয়ত তীব্র কোন ঘুমের ওষুধের প্রভাবে আসল ও সত্যিকারের দুঃশাসন চৌধুরী তাঁর ঘরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছেন। দুঃশাসন চৌধুরীর ছদ্মবেশ উনি নিয়েছেন মাত্র।

এ কি বিস্ময় ! সকলেই বাক্যহারা, নিস্পন্দ।

তবে উনি কে ? দুঃশাসন চৌধুরী উনি নন ? তবে কাকে—কাকে আমি হত্যা করলাম ? বলতে বলতে পাগলের মতই মুন্না বাঈজী মৃতদেহটার উপরে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হতেই, চকিতে ক্ষিপ্রহস্তে কিরীটী বাঈজীকে ধরে ফেলে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে শুধু আপনারই নয় সাবিত্রী দেবী, ভুল আমারও হয়েছে। ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এমনি দাঁড়াবে আমিও তা ভাবতে পারিনি—নইলে এই হত্যাকাণ্ডটা হয়ত ঘটত না। উ What a mistake—what a mistake !

কিরীটী বলছিল : হত্যাকারী যে কেবল অসাধারণ ক্ষিপ্র ও চতুর তাই নয়, সুদক্ষ একজন অভিনেতাও ! আগাগোড়াই সে দুঃশাসন চৌধুরীকে ধ্বংস করবার জন্য এম চমৎকার ভাবে প্ল্যান করে হত্যার কাজে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে করে রায়বাহাদুরে হত্যাপরাধের সমস্ত সন্দেহ নিঃসন্দেহে হতভাগ্য দুঃশাসন চৌধুরীর উপরে গিয়ে পড়ে আর হয়েছিলও তাই। ব্যাপারটা অবশ্য আমি গতকালই বুঝতে পেরেছিলাম। কি সবটাই আমার অনুমানের উপরে ভিত্তি করে গতকাল রাত্রের ঐ ফাঁদটা পেতেছিলাম- ছোরার খাপের চার ফেলে। এবং রায়বাহাদুরেরই ঘরে নিজের শয়নের ব্যবস্থা করেছিলা শুধু জানবার জন্য, কোন্ পথে হত্যাকারী আগের রাত্রে ঐ ঘরে প্রবেশ করে হত্যা কা গিয়েছিল। অবশ্য এটা স্থির জানতাম আমি, হত্যাকারী যত চতুরই হোক না কেন, রা সেই মারাত্মক একমাত্র হত্যার নিদর্শন ছোরার খাপটি সংগ্রহ করতে তাকে আস হবেই। কেননা হত্যাকারীর নিশ্চয়ই স্থিরবিশ্বাস হবে অত বড় মূল্যবান হত্যার প্রমাণ আমি অন্য কোথাও না রেখে সর্বদা নিজের কাছে কাছেই রাখব। এখন আপনা সকলেই বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় যে আমার গণনায় ভুল হয়নি। সে আমার পা ফাঁদে পা দিয়েছে—এসেছে সে, কিন্তু এটা ভাবিনি ঐ সঙ্গে যে সাবিত্রী অর্থাৎ মুন্না বাঈ যার নারীত্বের মর্যাদা একদা দুঃশাসন চৌধুরী লুণ্ঠন করেছিল, প্রতিশোধ-স্পৃহায় সে গা মুজরা নিয়ে ঐ দুঃশাসনেরই খোঁজে দেশদেশান্তরে গত পাঁচ বছর ধরে তীক্ষ্ণ ছোরা কো গুঁজে প্রতীক্ষায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং এও বুঝিনি যে দুঃশাসনকে খুঁজে পাওয়া মা তাকে হত্যার প্রথম সুযোগেই সাবিত্রী ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড একেই বলে নিয়তি। কেউ তা রোধ করতে পারে না। ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়। অনিবা

কিন্তু তবুও বলব হত্যাকারীর প্ল্যানটা নিঃসন্দেহে অপূর্ব। অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে খুনী হত্যার ব্যাপারে। আগে থেকেই সমস্ত আটঘাট বেঁধে মাত্র পনের থেকে বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে অন্য একজনের ছদ্মবেশে হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে আবার সে তার নিজের জায়গায় ফিরে এসে ছদ্মবেশ ছেড়ে সব হত্যার চিহ্ন নিজের গা থেকে যেন মুছে ফেলেছে। তাহলে গোড়া থেকেই বলি। রায়বাহাদুরের কেন ধারণা কোন এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মারা যাবেন! হত্যাকারী তাঁকে চিঠি দিয়ে সেকথা জানিয়েছিল।

রায়বাহাদুরের মুখেও আমি শুনি কথাটা এবং পরে একদিন সৌভাগ্যক্রমে লুকিয়ে আড়ি পেতে গান্ধারী দেবী ও কাকা সাহেবের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছিলাম আমি, রায়বাহাদুরকে হত্যাকারী একটা চিঠি দিয়েই কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হত্যা করবার ভয় দেখিয়েছিল যদি না তিনি তাঁর উইল পরিবর্তন করেন। কিন্তু কেন? ঐভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে হত্যার ভয় দেখিয়েছিল কেন? খুব সম্ভব যাতে করে রায়বাহাদুর কথাটা সকলকে বলেন ও হত্যার প্রতিশোধের জন্য ব্যবস্থা করেন। অন্তত আমার ধারণা তাই। তাহলেও এ থেকে দুটো জিনিস ভাববার আছে। প্রথমতঃ অসুস্থ রায়বাহাদুর ঐ ধরনের কথা বললে চট্ করে সহজে কেউই বিশ্বাস তো করবেই না ব্যাপারটা—অর্থাৎ তাঁর কথার কোন গুরুত্বই দেবে না কেউ। হয়েছিলও তাই।

এ বাড়ির কেউ সেকথা বিশ্বাসই করেননি, এমন কি আমিও করতে পারিনি প্রথমটায়; ডাক্তাররাও বলেছে ওটা hallucination-এর ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ, খুনীর নির্বিঘ্নে হত্যা করবার একটা চমৎকার সুযোগ হাতে আসবে, ঐ ধরনের একটা কথা চাউর করে দিতে পারলে। কিন্তু যা বলছিলাম, ওদিকে তারপর খুনী হত্যার সমস্ত সন্দেহ দুঃশাসন চৌধুরীর উপরে চাপিয়ে দেবার জন্য দুঃশাসনের ছদ্মবেশে একবার গিয়ে রায়বাহাদুরকে threaten পর্যন্ত করে এসেছিল এবং সন্দেহটাকে ঘনীভূত করে তোলবার জন্য ঠিক ঐ সময়টিতেই গান্ধারী দেবীকেও রায়বাহাদুরের ঘরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। জানলা দরজা বন্ধ থাকায় ঘরটা ছিল অন্ধকার তাই হয়ত রায়বাহাদুর ছদ্মবেশী খুনীকে চিনতে পারেননি এবং গান্ধারী দেবীও শেষ পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ না করবার দরুন ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই থেকে গিয়েছিল। হত্যার রাত্রে খুনী প্রথমত ডাঃ সানিয়ালের ছদ্মবেশে নার্স সুলতা করকে কফির সঙ্গে তীব্র কোন ঘুমের ওষুধ পান করিয়ে তাকে গভীর নিদ্রাভিভূত করে ফেলে। তারপর দুঃশাসনের ছদ্মবেশে রায়বাহাদুরের ঘরের সংলগ্ন বাথ-রুমের ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে রায়বাহাদুরকে হত্যা করে। হত্যার সময় তার পরিধেয় বস্ত্রে রক্ত এসে লাগে। সেই রক্তমাখা বস্ত্রটা তড়িৎপদে এসে শকুনির অবর্তমানে তার ঘরের মধ্যে ছেড়ে রেখে নিজেদের জায়গায় আবার ফিরে যায়। আমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি শকুনির ঘরের বাথরুমের জানলাপথে নেমে কার্নিশ দিয়ে রায়বাহাদুরের কক্ষসংলগ্ন

বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করা যায় খুব সহজেই। শুধু তাই নয়, হত্যা করবার পর দুঃশাসনেরই ছদ্মবেশে রুচিরা দেবীর ঘরে গিয়েও তাকে হত্যার সংবাদটা দিয়ে আসে হত্যাকারী।

স্তম্ভিত নির্বাক সকলে। কারও মুখে একটি কথা নেই।

দালাল সাহেবই আবার প্রশ্ন করেন, তবে হত্যাকারী কে?

কিরীটী এবারে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, এখনও আপনারা বুঝতে পারছেন না! মহামান্য কাকা সাহেব শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

কিরীটী বলে, গতকাল সকালে কাকা সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকখানা ফটো দেখেই প্রথমে তার ওপর আমার সন্দেহ হয়। এককালে অবিনাশ একজন সুদক্ষ অভিনেতা ও রূপসজ্জাকর ছিলেন। ঐটিই প্রথম কারণ ও দ্বিতীয় কারণ তাঁকে সন্দেহ করবার হচ্ছে, তিনটে থেকে রাত চারটে পর্যন্ত ঐ এক ঘণ্টা সময় তাঁর movements-এর কোন satisfactory explanation-ই তিনি দিতে পারেননি। তৃতীয়তঃ, তাঁর ঘরের বাথরুমের সংলগ্নই হচ্ছে শকুনিবাবুর ঘরের বাথরুম। বাইরে চওড়া কার্নিশ দিয়ে ঐ বাথরুমে যাওয়া খুবই সহজ। চতুর্থতঃ, হয়ত উইল। উইলের ব্যাপারটা এখনও আমি জানি না তবে নিশ্চয়ই অবিনাশ চৌধুরীর ভাগে খুব সামান্য পড়েছে। তাতেই হয়ত তিনি উইলটার অদলবদল চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ভয় ছিল দুর্যোধন চৌধুরীর মৃত্যুর পর হয়ত অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গীতপিপাসা ও খেয়ালের খরচ মেটাতে রাজী থাকবে না তাঁর মত।

দুঃশাসন চৌধুরী এবারে এখানে ফিরে আসা অবধিই ঐ ব্যাপারটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে রায়বাহাদুরের সঙ্গে বচসা করতেন। তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না ঐভাবে অনর্থক প্রতি মাসে কতকগুলো টাকা নষ্ট হয়। কিন্তু নির্মম নিয়তিই এক্ষেত্রেও প্রবল হয়ে দেখা দিল। কাকা সাহেবকে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হল প্রাণ দিয়ে। একেই বলে বিধাতার বিচার বোধ হয়। কিন্তু I pity—ঐ সাবিত্রী দেবীকে! কিরীটী চুপ করে।

সাবিত্রী এক রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী! কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে!

শেষ পর্যন্ত কিরীটীর মধ্যস্থতায় ডাঃ সমর সেনের সঙ্গে রুচিরার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু আজও ডাক্তার সেন মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে। তাকিয়ে আছে পলকহীন স্থির নিষ্কম্প, বিভীষিকাময় কার দুটি চক্ষু তার দিকে যেন।

হাড়-জাগানো বলিরেখাঙ্কিত মুখ, ফ্যাকাশে রক্তহীন হলদেটে চামড়া বিস্রস্ত, কাঁচা-পাকা চুলগুলি কপালের উপরে নেমে এসেছে।

বুকে বিঁধে আছে একখানি কালো বাঁটওয়ালা ছোরা সমূলে। তারপরই যেন কানে আসে কে ডাকছে তাকে।

হুজুর, হুজুর!

ডাক্তার জেগে ওঠে, কে—কে?

বনমরালী

বাড়িটা তৈরী হয়েছিল বছর তিনেক আগেই।

একেবারে সাদার্ন অ্যাভিনুর উপর বাড়িটা। তিনতলার ছাদে উঠলে লেক চোখে পড়ে। জায়গাটা গগনবিহারী—কর্নেল গগনবিহারী চৌধুরী কিনেছিলেন চাকরিজীবনেই। ইচ্ছা ছিল রিটায়ার করার পর বাকি দিনগুলো কলকাতা শহরেই কাটাবেন গগনবিহারী, স্ত্রী নির্মাল্যর তাই একান্ত ইচ্ছা ছিল।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যখন ঐ তল্লাটে জমিগুলো বিক্রি করছিল তখনই কিনেছিলেন জমিটা। সাড়ে চার কাঠা জমি।

চাকরি যখন আর বছর ছয়েক বাকি তখন বাড়িটা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে বাড়িটা তৈরী হয়েছে প্রায় চার বছর ধরে।

দোতলা বাড়ি।

উপরে চারখানা ঘর—নীচে চারখানা ঘর। একতলা ও দোতলার ব্যবস্থা সবই পৃথক, যদি কখনও একতলাটা ভাড়া দেন সেই মতলবেই সব ব্যবস্থা আলাদা করে-ছিলেন গগনবিহারী।

মিলিটারি চাকরির জীবনে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর্মির ইনফ্যানট্রি অফিসার কর্নেল চৌধুরী। কিন্তু ছাত্রজীবনে কলকাতার যে স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল কোনদিন তা বুঝি ভুলতে পারেননি।

কলকাতার একটি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তাঁর মনের মধ্যে চিরদিন।

প্রায়ই বলতেন গগনবিহারী, দূর দূর, শহর বলতে কলকাতা শহর! বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী আবার একটা শহর নাকি? প্রাণের স্পন্দন বলতে কিছুই নেই ওসব জায়গায়!

স্ত্রী নির্মাল্য হেসেছে।

নির্মাল্য বরাবর ইউ. পি.-তেই মানুষ। সে কিন্তু বলেছে, কলকাতা আবার একটা শহর! ঘিঞ্জি, ধুলো, মানুষের ভিড়।

কর্নেল চৌধুরী জবাবে বলেছেন, তবু শহর কলকাতা—কলকাতা শহরই!

বাড়িটা মনের মত করেই তৈরী করেছিলেন গগনবিহারী—সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, ফুলের বাগান থাকবে, তারপর ছোট ঘোরানো একটা গাড়িবারান্দা।

নীচে ও উপরে বড় বড় দুটো হলঘর।

চওড়া সাদা পাথরের সিঁড়ি।

দোতলায় হলঘরটার সামনে খানিকটা খোলা ছাদের মত—টেরেস। নামকরা এক আর্কিটেক্টকে দিয়ে বাড়ির প্ল্যানটা করিয়েছিলেন।

কণ্ট্রাকটারকে বলেছিলেন বাড়ি তৈরী শুরুর সময় গগনবিহারী, মিঃ বোস তাড়াতাড়ি বাড়িটা কমপ্লিট করে দেবেন। যতদিন না অবসর নিই চাকরি থেকে ছুটিছাটায় ওখানে গিয়ে থাকবে।

কণ্ট্রাকটার মিঃ বোসও সেই মতই অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু বাড়ি তৈরি শুরু হবার মাস-আষ্টেক পরে হঠাৎ নির্মাল্য একটা মোটর-অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেল।

স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন কর্নেল চৌধুরী। স্ত্রীর আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুটা তাই তাঁকে খুবই আঘাত দিল। জীবনটাই যেন অতঃপর তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। একমাত্র সন্তান ছেলে রাজীব বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গিয়ে আর ফিরল না। গগনবিহারীর বাড়ি তৈরি করবার ইচ্ছাটাই যেন অতঃপর কেমন ঝিমিয়ে গেল। কণ্ট্রাকটার মিঃ বোসকে তখন বললেন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ধীরে-সুস্থে কমপ্লিট হোক বাড়ি।

মিঃ বোসও অতঃপর কাজে ঢিলা দিলেন।

ধীরে ধীরে শম্বুকগতিতে কাজ চলতে লাগল। এবং বাড়ি শেষ হল দীর্ঘ চার বছর বাদে একদিন।

তখনও চাকরির মেয়াদ দু'বছর বাকি রয়েছে।

নতুন বাড়ি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রইল। একজন কেয়ারটেকার রইল—জার্নাল সিং। আরও দু বছর পরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর গগনবিহারী মাস-চারেক এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে এসে উঠলেন তাঁর বাড়িতে। এক শীতের অপরাহ্ণে।

মালপত্র সব আগেই চলে এসেছিল। ভাগ্নে আর ভাইপো—সুবিনয় সান্যাল ও সুবীর চৌধুরীকে চিঠিতে লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন গগনবিহারী কিছু আসবাবপত্র কিনে বাড়ি-টাকে সাজিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে।

চিঠিতে ওদের আরও লিখেছেন, ওরা যেন অতঃপর তাদের মেসের বাসা তুলে দিয়ে ঐখানেই এসে থাকে

সুবিনয় সান্যাল আর সুবীর চৌধুরী একজনে মামার ও অন্যজনে তার কাকার নির্দেশ পেয়ে মনে মনে খুশিই হয়েছিল।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে লেকের কাছে বড় রাস্তার উপরে অমন চমৎকার বাড়ি—খুশি তো হবারই কথা।

দুজনেরই অবস্থা যাকে বলে অতি সাধারণ।

সুবিনয় বি. এস-সি পাস করে এক ওষুধ কোম্পানীতে মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি করে—মাইনে শ-দুই টাকা।

গ্রামের বাড়িতে বিধবা মা ও ছোট বছর পনরোর একটি বোন। মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটা মেসে ফোর-সিটেড্ রুমের একটা সীটে থাকত। আর সুবীর চৌধুরী আই. এ. পাস

করে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে একটা দেশী ফার্মে চাকরি করে। সে-ও থাকত হাজরা রোডের একটা বোর্ডিং হাউসে।

তার আয়ও সামান্য। মাসান্তে শ-দেড়েক টাকা মাত্র।

তবে তার সংসারে কেউ ছিল না।

গগনবিহারীর স্কুলমাস্টার বড় ভাই বিজনবিহারীর ছেলে ঐ সুবীর। বিজনবিহারীর অনেক দিন আগে মৃত্যু হয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যুর বছর ছয়েকের মধ্যেই স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছিল।

গগনবিহারী সুবীরকে মধ্যে মধ্যে অর্থ সাহায্য করতেন তবে সে সাহায্যের মধ্যে খুব একটা আগ্রহ বা প্রাণ ছিল বলে সুবীরের কখনও মনে হয়নি।

সুবীরও তার কাকা কর্নেল চৌধুরীকে জীবনে দু-একবারের বেশী দেখেনি।

দুজনকেই আলাদা আলাদা করে চিঠি দিয়েছিলেন কর্নেল চৌধুরী।

তাঁর চিঠি পেয়ে সুবীরই মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে গিয়ে এক সন্ধ্যায় সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা করে।

মফঃস্বল থেকে দু'দিন টুর করে সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সুবিনয় ফিরেছে। ফিরেই সে মামার চিঠিটা পেয়েছে।

এক কাপ চা পান করতে করতে সুবিনয় মামার চিঠিটার কথাই ভাবছিল।

মামা বড়লোক। মিলিটারিতে বড় অফিসার। তাদের সমপর্যায়ের মানুষ নন। তাছাড়া ঐ মামার সঙ্গে তার বাবা কল্যাণ সান্যালের বিশেষ কোন একটা প্রীতির সম্পর্কও কোন দিনই ছিল না।

বরং বলা যায় বরাবর একটা মন-কষাকষিই ছিল।

কারণ ছিল তার।

তার বাবার সঙ্গে তার মায়ের বিয়ের ব্যাপারটা কর্নেল চৌধুরী কখনও ক্ষমার চোখে দেখেননি।

ঐ একটিমাত্র বোন তার মা বাসন্তী দুই ভাইয়ের।

গগনবিহারী মিলিটারির চাকরিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন ভারতবর্ষের সর্বত্র। বড় ভাই বিজনবিহারী বর্ধমান জেলায় এক ছোট জায়গায় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। সামান্য আয়।

স্ত্রী, বিধবা মা ও ছোট ঐ বোন বাসন্তী। ছোট সংসার। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন গগনবিহারী মধ্যে মধ্যে দুশো-একশো করে টাকা পাঠাতেন। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র আসত তবে সে চিঠি গগনবিহারীর লেখা নয়, তাঁর স্ত্রী নির্মাল্যের।

চাকরি-জীবনে গগনবিহারী যখন কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে পোস্টেড, সেই সময়ই

ওখানকার এক ধনী কনট্রাকটার পুরোপুরি সাহেবী ভাবাপন্ন নির্মাল্যের বাবা যতীন মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়।

আলাপটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে মিত্র সাহেবের একমাত্র কনভেন্টে পড়া বিদুষী কন্যা নির্মাল্যকে কেন্দ্র করে। সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই পরবর্তীকালে বিবাহ।

বিবাহের পূর্বে কিছু জানাননি মাকে বা দাদাকে গগনবিহারী। জানানো বোধ হয় প্রয়োজনও বোধ করেননি। বিবাহের পরে একটা চিঠিতে দু-লাইনে লিখে সংবাদটা দিয়েছিলেন মাত্র। মা এবং ভাই দুজনেই অবিশ্যি আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন গগনবিহারী ও নির্মাল্যকে।

তারই কিছুদিন বাদে নির্মাল্যর চিঠি এল শাশুড়ীর কাছে তাঁকে প্রণাম দিয়ে। শাশুড়ী জীবিতা থাকবার সময় বার-দুই নির্মাল্য বর্ধমানের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিল। একবার দশদিন ও একবার সাতদিন কাটিয়েও এসেছিল সে শ্বশুরবাড়িতে।

সুবীরের বয়স তখন বারো কি তেরো। স্কুলের ছাত্র।

আর একমাত্র বোন বাসন্তীর বয়স বছর-কুড়ি। প্রাইভেটে সে ম্যাট্রিক পাস করে বাড়িতে বসে লেখাপড়া, ছুঁচের কাজ ও অন্যান্য ঘরের কাজ করে।

সুবিনয়ের বাবা কল্যাণ সান্যাল ঐ সময় বিজনবিহারীর স্কুলে নতুন টিচার হয়ে যান। সেই সূত্রেই কল্যাণ সান্যালের সঙ্গে বিজনবিহারীর পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয়।

কল্যাণ সান্যাল বাসন্তীকে বিবাহ করে।

বিবাহ স্থির হওয়ার পর বিজনবিহারী ভাইকে চিঠি দিয়েছিলেন সব কথা জানিয়ে। ছেলেটি যদিও স্কুলমাস্টার, সামান্য মাইনে পায়, তাহলেও লেখাপড়ায় ও চরিত্রে আদর্শ মনে হয়েছিল বিজনবিহারীর।

গগনবিহারী, বলাই বাহুল্য, সে চিঠির জবাব দেননি। তবে নির্মাল্য দিয়েছিল চিঠির জবাব ও পাঁচশো টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এসব কথা সুবিনয়ের বড় মামার মুখেই শোনা।

ঐ কাহিনী শোনার পর থেকেই সুবিনয়ের মনে ঐ মিলিটারি অফিসার বড়লোক মামার প্রতি কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ক্রমশঃ জেগে ওঠে।

পরে অবিশ্যি ঐ মামার সঙ্গে বার-দুই দেখা হয়েছে তার।

একবার দিল্লীতে বছর সাতেক আগে, আর শেষবার লক্ষ্ণৌতে বছর দুই আগে। এবং ঐ দেখা হওয়া মাত্রই—তার বেশি কিছু না।

গগনবিহারী তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন সুবিনয়কে—সে যেন তার মা ও ছোট বোনকে নিয়ে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতেই এসে ওঠে। গ্রামের বাসা আর রাখার দরকার নেই।

সুবিনয় চা পান করতে করতে তার মামার চিঠিটার কথাই ভাবছিল, এমন সময়

সুবীর তার মামাতো ভাই এসে ঘরে ঢুকল।

সুবীর বলতে গেলে তার চাইতে বছর তেরোর বড়। কিন্তু ছোটবেলায় পাশাপাশি একই জায়গায় মানুষ হওয়ায় দীর্ঘদিন থেকেই পরস্পরের মধ্যে রীতিমত একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কলকাতায় দুজনে দু'জায়গায় থাকলেও মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হত।

সুবীর ঘরে ঢুকতেই সুবিনয় বলে, এই যে সুবীরদা, এস। চা হবে নাকি?

বল।

সুবিনয় উঠে গিয়ে মেসের চাকরকে চেঁচিয়ে এক কাপ চা উপরে দিয়ে যেতে বলে আবার এসে চৌকিটার উপর বসল।

সুবিনয় বললে, একটু আগেই তোমার কথাই ভাবছিলাম সুবীরদা।

সুবীর সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, কাকার একটা চিঠি পেয়েছি আজ সুবিনয়।

তাই নাকি? আমিও মামার একটা চিঠি পেলাম আজ ফিরে এসে।

কি লিখেছেন রে কাকা তোকে?

সুবিনয় চিঠিটা বালিশের তলা থেকে বের করে সুবীরের হাতে দিল, পড়ে দেখ না।

সুবীর চিঠিটা পড়ল। পড়ে ফিরিয়ে দিল আবার সুবিনয়কে।

ইতিমধ্যে চাকর এসে এক কাপ চা রেখে যায় ওদের সামনে।

সুবীর পকেট থেকে তার চিঠিটা বের করে সুবিনয়কে দিল, পড়ে দেখ আমার চিঠিটা।

মোটমুটি ঐ একই বয়ান দুই চিঠির। দুজনের ওপরেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে তারা যেন অবিলম্বে গিয়ে বাড়ির কেয়ার-টেকার জার্নাল সিংহের সঙ্গে দেখা করে এবং বালিগঞ্জ টেরেসে গিয়ে গগনবিহারীর বন্ধু সোমেশ্বর ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করে টাকা নিয়ে কিছু আসবাবপত্র পছন্দমত কিনে বাড়িটাকে সাজিয়ে ফেলে। টাকার জন্যে যেন কৃপণতা কোন রকম না করা হয়। যে টাকাই লাগুক সোমেশ্বর দেবেন। তাঁকে চিঠিতে তিনি সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন কি করবে? সুবীর জিজ্ঞাসা করে।

সুবিনয় বলে, সব ব্যবস্থা করতে হবে।

তাহলে?

সুবিনয় বললে, মামা সাহেব মানুষ—সেরকম ব্যবস্থাই করতে হবে। এক কাজ কর সুবীরদা!

কি?

তুমি কটা দিনের ছুটি নাও, আমিও নিই। দুজনে মিলে সব ব্যবস্থা করে ফেলি।

সুবিনয় ও সুবীর দুজনে মিলে ভাল নাম-করা ফার্নিচারের দোকান থেকে সব কিনে এনে গগনবিহারীর সার্দান অ্যাভিন্যুর বাড়িটা সাজিয়ে ফেলল সাতদিনের মধ্যেই।

জানলা-দরজায় পর্দা, মেঝেতে কার্পেট, বসবার ঘরে সোফা সেট, খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিল, একটা ফ্রিজ, কিছু ক্রকারিস—কিছুই বাদ দিল না।

এবং দুজনে নির্দেশমত একদিন সার্দান অ্যাভিন্যুর বাড়িতে এসে উঠল।

একজন রাঁধুনী বামুন প্রিয়লাল ও ভৃত্য রতনকেও খুঁজে পেতে নিযুক্ত করল।

কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল, গগনবিহারীর দেখা নেই। কোন চিঠিপত্রও আর এল না।

আরও দু'মাস পরে পৌষের এক সন্ধ্যায় গগনবিহারী সোজা দিল্লী থেকে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলেন।

সুবীর তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। বাড়িতে সুবিনয় একাই ছিল।

সে রাত্রে কি রান্না হবে প্রিয়লালকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ গাড়ির হর্ন শুনে উঠে দাঁড়াল সুবিনয়, কে এল আবার!

একতলার জানালাপথে উঁকি দিল সুবিনয়। নজরে পড়ল ধুলো ভর্তি বিরাট এক ডজ গাড়ি গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নামল দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি। পরনে গরম সুট, মাথায় একটা মিলিটারী ক্যাপ। মুখে পাইপ। আন্দাজেই অনুমান করতে পেরেছিল আগন্তুক কে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বাইরে গেল সুবিনয়।

জার্নাল সিং ড্রাইভার বাহাদুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত তখন।

সুবিনয় সামনে গিয়ে প্রণাম করতেই গগনবিহারী ওর মুখের দিকে তাকালেন, তুমি!

আজ্ঞে আমি সুবিনয়।

মনুর ছেলে তুমি?

সুবিনয়ের মায়ের ডাকনাম মনু।

আজ্ঞে।

আমার চিঠি পেয়েছিলে?

আজ্ঞে।

সব ব্যবস্থা করে রেখেছ?

হ্যাঁ।

চল। বেশ ভরাট গম্ভীর গলা।

দুজনে ভিতরের হলঘরে গিয়ে ঢোকে

দাঁতে পাইপটা চেপে ধরে গগনবিহারী একবার চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। লম্বা-চওড়া পুরুষ গগনবিহারী।

এককালে রীতিমত গৌরবর্ণ ছিলেন, সুপুরুষ যাকে বলে দেখতে ছিলেন। কিন্তু এখন যেন গায়ের রঙ কেমন তামাটে মনে হয়। মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

চোখে কোন চশমা নেই। ছোট ছোট চোখ, খাড়া নাক, দুপাশে গালের হনু দুটো একটু সজাগ।

কপালে বয়সের বলিরেখা জেগেছে, যদিও দেহের মধ্যে কোথাও বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা যায় না। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল যেন সুবিনয়ের গগনবিহারী খুব অখুশি হননি, কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না।

চিরদিনই একটা চাপা প্রকৃতির মানুষ গগনবিহারী। কথাবার্তা কম বলেন, অবিশ্যি সেটা পরবর্তী চার মাসেই বেশ জানতে পেরেছিল সুবিনয়রা। অতি বড় দুঃখেও যেমন কোন বহিঃপ্রকাশ নেই, তেমনি আনন্দের ক্ষেত্রেও তাই।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন গগনবিহারী। সুবিনয় পিছনে পিছনে উঠতে লাগল।

সুবীরবাবু কই, তাকে দেখছি না?

এখনও অফিস থেকে ফেরেনি, সুবিনয় বললে।

আর কোন প্রশ্ন করলেন না। উপরে উঠে সব ঘুরে দেখলেন। তারপর গিয়ে শোবার ঘরের সংলগ্ন বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন।

পাইপটা বোধ হয় নিভে গিয়েছিল, পকেট থেকে একটা দামী লাইটার বের করে পুনরায় তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, সুবিনয়বাবু, আমার ড্রাইভার বাহাদুরকে একবার ডাকতে পার!

সুবিনয় তখুনি গিয়ে নীচ থেকে বাহাদুরকে ডেকে নিয়ে এল।

বাহাদুরেরও বয়স হয়েছে, চল্লিশের উর্ধ্বে বলেই মনে হয়। চ্যাপ্টা মঙ্গোলিয়ান টাইপের মুখ তবে নেপালীদের মত পরিষ্কার রঙ নয়, খানিকটা কালোর দিকে ঘেঁষা। চ্যাপ্টা নাক, খুদে খুদে চোখ। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় লোকটা সতর্ক ও ধূর্ত।

পরনে বটল্-গ্রীন রঙের মিলিটারি ইউনিফর্ম। কোমরে খাপেভরা একটা ছোট ভোজালি। বাহাদুর সেলাম দিয়ে দাঁড়াল, সাব, আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। বাহাদুর তুই নীচের তলায় থাকবি আর রামদেও এই ঘরের পাশের যে ঘরটা সেই ঘরে থাকবে। তোর সমনপত্র গুছিয়ে নে গিয়ে—

বহুত আচ্ছা সাব।

গাড়ি গ্যারেজ করে দিয়েছিস?

না সাব, গাড়ি পুঁছে পরিষ্কার করে গ্যারেজে তুলব।

ঠিক আছে, যা।

বাহাদুর চলে গেল।

তারপর সুবিনয়বাবু, তোমার মাকে আমার চিঠির কথা জানিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

তা সে এল না কেন?

গগনবিহারী বুঝতে পেরেছিলেন বোধ হয় তাঁর বোন দেশের বাড়ি ছেড়ে আসেনি। এলে সে ইতিমধ্যে এসে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করত।

মা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এলেন না, মৃদু গলায় সুবিনয় বললে।

কেন? ভদ্রমহিলার প্রেস্টিজে লাগত বুঝি?

সুবিনয় কোন জবাব দেয় না।

ভুয়ো প্রেস্টিজের কোন মূল্য নেই, বুঝেছ! ঠিক আছে। আসেনি যখন তার আর আসার দরকার নেই। তা তোমাদের আমার এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

না। কষ্ট কিসের!

হ্যাঁ, নিজের বাড়ি এটা মনে করলেই আর কোন ঝামেলা থাকে না। তা এখানে রান্না-বান্নার কি ব্যবস্থা?

একজন ভাল কুক পেয়েছি—প্রিয়লাল।

ইংলিশ ডিস করতে জানে কিছু, না ঝোল ডাল চচ্চড়ি পর্যন্ত বিদ্যে?

জানে—সব রকম রান্নাই জানে।

ঐ সময় একটা গাড়ি এসে থামবার আওয়াজ পাওয়া গেল নীচে। তারপরই গুরু-গম্ভীর একটা কুকুরের ডাক।

সুবিনয়ের হতচকিত ভাবটা কাটবার আগেই বাঘের মত একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কাম্ হিয়ার জ্যাকি!

কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে গগনবিহারীর কোলের উপরে দু'পা তুলে দিয়ে নানাভাবে তার প্রভুকে আদর জানাতে লাগল।

একটু পরে এসে ঢুকল রামদেও, গগনবিহারীর বহুদিনের পুরাতন এবং খাসভৃত্য। রামদেও জ্যাকিকে নিয়ে ট্রেনেই এসেছে।

রামদেও লক্ষ্ণৌর লোক।

দুপুরে জ্যাকি কিছু খেয়েছিল রে? জিজ্ঞাসা করলেন গগনবিহারী।

জী হাঁ।

জ্যাকি ইতিমধ্যেই গগনবিহারীর কাছে বসে পড়ে পা চাটছিল নিজের।

রামদেও?

জী সাব্!

তুই এই ঘরের পাশের ঘরটায় থাকবি।

বহুৎ খুব সাব!

নীচে রান্নাঘরে গিয়ে দেখ্ ঠাকুর কি কি এনেছে, চিকেন না থাকলে চিকেন নিয়ে আয়, আর জ্যাকির জন্য মাংস।

সুবিনয় বলে, আমি টাকা দিচ্ছি—

তাহলে তাই যাও; টাকা দিয়ে দাও গে। আর চাকরটাকে বল ওর সঙ্গে গিয়ে বাজারটা চিনিয়ে দিতে।

চল রামদেও।

চলিয়ে সাব।

সুবিনয় এগুচ্ছিল, গগনবিহারী আবার ওকে ডাকলেন, শোন সুবিনয়বাবু!

কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ। সুবীরবাবুর ফিরতে কি এর চাইতেও বেশী রাত হয়?

ঘড়িতে তখন রাত পৌনে আটটা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে রাত দশটাও হয়ে যায় ফিরতে।

আর তোমার?

আমারও হয়।

দেখ একটা কথা মনে রেখো আর সুবীরবাবুকেও বলে দিও, রাত ঠিক সাড়ে দশটায় কিন্তু আমি জার্নাল সিংকে কাল থেকে গেট বন্ধ করে দেবার জন্য বলব।

বেশ, বলব।

আচ্ছা যাও।

সেরাত্রে সুবীর এল প্রায় পৌনে এগারটায়। গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সুবীর, দোতলার উপর থেকে জ্যাকি গর্জন শুরু করে দিয়েছে। মুখ তুলে তাকাল সুবীর দোতলার বারান্দার দিকে।

বারান্দার আলোয় চোখে পড়ল ড্রেসিং গাউন গায়ে কে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি বারান্দার রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে বাঘের মত একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

উপর থেকেই ভারী গলায় সাড়া এল, হু কামস দেয়ার?

সুবীর সাড়া দেয়, আমি সুবীর।

সুবিনয় জেগেই ছিল সুবীরের প্রতীক্ষায়, সে ততক্ষণে বের হয়ে গেটের কাছে এগিয়ে গিয়েছে।

কে, সুবীরদা?

হ্যাঁ।

এস ভেতরে।

কাকা এসে গেছেন বলে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ।

জ্যাকির ডাকাডাকি তখন থেমে গিয়েছে।

দুই

নীচের তলায় দুটো ঘরে সুবিনয় ও সুবীর নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সুবীর এসে সুবিনয়ের ঘরে ঢুকল।

কখন এল রে?

সন্ধ্যাবেলা। সুবিনয় বলল।

ঐ বাঘের মত কুকুরটাও সঙ্গে এনেছে নাকি?

হ্যাঁ। আরও আছে—

আর কে এল আবার?

ড্রাইভার কাম বডিগার্ড নেপালী বাহাদুর, আর এক্স-মিলিটারী পার্সোন্যাল রামদেও।

হুঁ।

সুবীর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে, তা থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। নিঃশব্দে গোটা-দুই টান দিল।

এখনও জেগে আছেন?

বোধহয় তোমার ফেরবার প্রতীক্ষাতেই জেগে ছিলেন।

তাই নাকি!

তাই তো মনে হচ্ছে।

কেন?

বলে দিয়েছেন কাল থেকে নাকি রাত ঠিক সাড়ে দশটায় গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

গেট বন্ধ হয়ে যাবে!

হ্যাঁ।

তাহলে তো এখানে আমার পোষাবে না সুবিনয়।

ক'টা দিন একটু তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা কর না।

থাম্ তো তুই। রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটার আগে কোন ভদ্রলোক আজকালের দিনে বাড়ি ফিরতে পারে নাকি! ওসব আমার দ্বারা হবে না।

সুবিনয় মৃদু হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কিছু সুবিধে হল?

সুবীরের চাকরিটা টেম্পোরারী ছিল, মাসখানেক হল চাকরি গিয়েছে, সে আবার একটা চাকরির চেষ্টা করছে।

না।

নটরাজনের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

করেছিলাম।

কি বললে সে?

বললে এখনও কিছু স্থির হয়নি। ঐ পোস্টটার জন্য তোদের অফিসে দিন পনেরো বাদে একবার খোঁজ নিতে বলেছেন।

ঠিক আছে। আমাদের সার্কুলেশন ম্যানেজার মিঃ গিল বম্বে থেকে ফিরুক, তাকে আবার আমি বলব।

কবে ফিরবে রে?

দিন সাত-আট বাদে বোধ হয়।

এদিকে পকেট তো আমার গড়ের মাঠ। নেহাৎ পাকা-খাওয়ার ভাবনা নেই এখন—

পরশু পঁচিশ টাকা নিলে যে।

পঁচিশ টাকা একটা টাকা নাকি?

তা এত রাত হল কেন ফিরতে?

মিত্রাণীকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম।

সুবীর চরিত্রে একটু ঢিলেঢালা, দিলদরিয়া ভাব, যা উপার্জন করে দু'হাতে খরচ করে। কাল কি হবে তার জন্য কোন চিন্তাই নেই যেন।

পোশাক-পরিচ্ছদেও একটু বাবু গোছের।

সুবিনয় কিন্তু সুবীরের ঠিক বিপরীত। সঞ্চয়ী, গোছানো চিরদিনই।

সুবিনয়!

কি?

কাল আমাকে আরও কিছু দিতে পারিস?

কত?

এই গোটা কুড়ি টাকা!

দেব।

মাসের শেষ, তোর অসুবিধা হবে না তো আবার?

না। চল ওঠ, এবার খাবে চল। না খেয়ে এসেছ।

বিশেষ কিছু খাইনি—একটা কাট্‌লেট আর এক কাপ চা। চল, খিদে পেয়েছে দারুণ।

ডাইনিং হলে দুজনে খেতে বসে।

চিকেন স্টু ও পুডিং দেখে খেতে বসে সুবীর বলে, আরে বাবা, এ যে রাজকীয় ব্যাপার। প্রিয়লাল, এসব কখন রাঁধলি ের।

আজ্ঞে কত্তাবাবুর বেয়ারা রেঁধেছে—রামদেও।

আই সি!

সুপ থেকে একটুকরো চিকেন তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে সুবীর বলে, রেঁধেছে তো খাসা!

সুবীর চিরদিনই একটু ভোজনবিলাসী।

ঐ সময় জ্যাকি এসে ঘরে ঢুকে সুবীরের গায়ের গন্ধ শুঁকতে থাকে। ভয়ে সুবীর সিঁটিয়ে ওঠে। হাত থেমে যায় তার।

বলে. ওরে বাবা, এটা আবার এখানে কেন?

সুবিনয় বললে, কিছু বলবে না? গন্ধ শুঁকে চিনে নিচ্ছে।

বিশ্বাসও নেই কিছু—সুবীর বলে।

জ্যাকি গন্ধ শুঁকে চলে গেল ঘর থেকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে ঘর থেকে বেরুল। বারান্দায় আসতেই অন্ধকারে নজরে পড়ে বারান্দার শেষপ্রান্তে কে যেন আবছায়া দাঁড়িয়ে আছে।

সুবীর প্রশ্ন করে, কে? কে ওখানে?

আমি বাহাদুর হুজুর।

সেই নেপালীটা বুঝি সুবিনয়? সুবীর শুধায়।

হ্যাঁ।

যে যার ঘরে গিয়ে অতঃপর খিল তুলে দিল।

জামা-কাপড় বদলে সুবীর স্লিপিং-সুটটা পরে নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাল লাগছে না সুবীরের, কাল এখান থেকে চলে যেতে পারলে ভাল হত কিন্তু উপায় নেই।

গত মাস থেকে চাকরি নেই। টেম্পোরারি চাকরি অবিশ্যি যাবে জানতই, তাছাড়া ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ সিংয়ের সঙ্গে আদৌ বনিবনা হচ্ছিল না।

হয়ত এত তাড়াতাড়ি চাকরিটা যেতও না, আর মাস দুই থাকত—কিন্তু সিং-এর সঙ্গে হঠাৎ সেদিন চটাচটি হতেই পরের দিনই চাকরিটা গেল।

পরের দিন অফিসে গিয়েই নোটিস পেল। ডেপুটি ম্যানেজারের নোটিস। মাইনে বুঝে নিয়ে তাকে চলে যেতে বলা হয়েছে।

সুবীরও চলে এসেছিল সোজা টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে।

চাকরি আজও একটা জোটেনি। তাহলেও এখানে সে থাকবে না।

থাকতে সে পারবেও না। তবে একটা চাকরি চাই সর্বাগ্রে। এখানে অন্ততঃ থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল সে। তাছাড়া মিত্রাণীর হোস্টেলটাও কাছে।

শ্যামবাজার থেকে মাস দুই হল মিত্রাণী কাছেই এখানকার একটা মেয়েদের হোস্টেলে উঠে এসেছে।

হেঁটে যেতেই পারা যায় মিত্রাণীর হোস্টেলে।

মিত্রাণীর কথা মনে পড়তেই অন্ধকারে সুবীরের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে, বয়স কত হল মিত্রাণীর! মনে মনে একটা হিসাব করে সুবীর।

খুব কম করেও ত্রিশের কাছাকাছি তো হবেই। চাকরিই তো করছে দশ বছর। এখনও মিত্রাণী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। বেচারী। আজকের দিনে ঘর বাঁধার ব্যাপারটা যেন এতই সহজ!

মিত্রাণী এখনও জানে না বছর দুই আগেই তার পার্মানেন্ট চাকরিটা গিয়েছে। তার-পর দু জায়গায় টেম্পোরারি কাজ করল। শেষ চাকরিটাও মাসখানেক হল গিয়েছে।

ব্যাপারটা জানলে অত উৎসাহের সঙ্গে বলত না, আমি আড়াইশো মত পাই, তুমিও তিনশো সাড়ে তিনশো পাও। দুজনের বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। একটা দু'-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট।

নাঃ, একটা চাকরি যোগাড় করতে হবেই।

পরের দিন দেখা হল সুবীরের গগনবিহারীর সঙ্গে।

সামান্যই কথাবার্তা হল।

তার মধ্যে বিশেষ যে কথাটা সেটা হচ্ছে তার চাকরি ও উপার্জন সম্পর্কে।

তাহলে বি.-এ.টাও পাস করতে পারনি? গগনবিহারী বললেন।

পরীক্ষা দিইনি।

দিলে অন্ততঃ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হত না। তা কোথায় চাকরি করছ?

ঐ একটা মার্চেন্ট অফিসে। কোনমতে ঢোঁক গিলে কথাটা উচ্চারণ করল সুবীর কতকটা যেন ভয়ে-ভয়েই।

মাইনে কত?

শ-দুই মত।

ঠিক আছে, যোগজীবন আসুক, তাকে বলব'খন তোমার কথা।

আমি তাহলে উঠি?

হ্যাঁ, এস।

সুবীর উঠে দু'পা এগিয়েছে, পিছন থেকে গগনবিহারী ডাকলেন, হ্যাঁ শোন, আর একটা কথা—

থেমে ঘুরে তাকাল সুবীর গগনবিহারীর মুখের দিকে।

রাত ঠিক সাড়ে দশটায় আজ থেকে কিন্তু গেট বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝেছ?

হ্যাঁ।

যাও।

সুবীর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নীচে এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই দেখে সুবিনয় বসে আছে।

সুবিনয় জিজ্ঞাসা করল, কি বললেন মামা, সুবীরদা?

সুবীর খাটের উপর থপ করে বসে পড়ে বললে, ইম্পসিব্‌ল।

কি হল?

এখানে বাস করা আমার চলবে না সুবিনয়। এত কড়াকড়ি, এত নিয়মকানুন—এ তো কয়েদখানা!

একটা কথা বলব সুবীরদা?

কি?

বলছিলাম ভাল একটা যা হোক চাকরিবাকরি না পাওয়া পর্যন্ত--

তার আগেই মৃত্যুরেব ন সংশয়!

পাগলামি করো না সুবীরদা। যা বলি শোন, হুট্ করে একটা কিছু করে বসো না। তাছাড়া রাজীব ও'দেশ থেকে আর ফিরবে না, মামার যা কিছু তো তুমিই পাবে।

আমি?

হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কে আছে বল?

তাহলে বলব সুবিনয় তুমি ভুল করেছ।

ভুল করেছি!

হ্যাঁ। আমি ঐ চীজটিকে এক প্যাঁচড়ে চিনে নিয়েছি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে।

তার মানে?

মানে অতীব সরল, অতীব প্রাঞ্জল।

হেঁয়ালি রাখ তো।

শোন, ঘরে ঢুকে কি দেখলাম জান?

কি ?

যত রাজ্যের বিলিতী আমেরিকান আর ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিন !

হ্যাঁ, সঙ্গে দু-বাক্স ভর্তি ম্যাগাজিন ও বইপত্র এসেছে কাল দেখছিলাম।

ঐ ম্যাগাজিনগুলো কিসের জান ?

কিসের ?

যত নগ্ন মেয়েদের মানে ন্যাংটো মেয়েদের ছবিতে ভরা। আর সেই ছবিগুলো বসে উল্টে উল্টে দেখছেন তোমার মামাবাবু।

সত্যি !

এক বর্ণ মিথ্যে নয়। ঐ ম্যাগাজিনগুলো দেখে বুঝে নিয়েছি, ওঁর মনের অলিতে-গলিতে এই বয়সেও কোন রসের প্রবাহ চলেছে।

কিন্তু—

ছি ছি, বুড়ো হয়েছেন, সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছেন, এখনও ঐসব পর্নোগ্রাফি নিয়ে মজে আছেন ! এই মানুষ দেবে আমায় সম্পত্তি ? একটি কপর্দকও নয় !

সুবিনয় আর কোন কথা বলে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যাই উঠি, অফিসের বেলা হল।

টাকাটা দিয়ে যেও কিন্তু—

হ্যাঁ, মনে আছে।

সুবিনয় উঠে পড়ল।

দিনচারেক বাদে এলেন যোগজীবন সান্যাল, কলেজ-জীবনের সহপাঠী গগনবিহারীর এবং দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। যোগজীবনও দীর্ঘদিন সেণ্ট্রালের বড় চাকরি করে রিটায়ার করেছেন। যোগজীবন একা আসেননি, সঙ্গে তাঁর ছাব্বিশ-সাতাশ বা বোন শমিতা।

শমিতার গায়ের রংটা কালো হলেও সারা দেহ জুড়ে যেন একটা অপূর্ব যৌবন যৌবন যেন সারা দেহে টমমল করছে।

যেন উপছে পড়ছে কানায় কানায়। বেশভূষাও অনুরূপ।

শমিতা এম. এ, পাস—কোন এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপিকা।

ভালবেসে একজনকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু সে বিবাহ দু'বছরের বেশি টেঁকেনি, ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল—সেও আজ বছর পাঁচেকের কথা।

শমিতা এসেছিল নিজেই ইচ্ছা করে গগনবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে, কারণ যোগজীবনের বাড়িতে গগনবিহারীর ছাত্রজীবনে যখন যাতায়াত ছিল তখন থেকেই বালিকা

শমিতাকে চিনতেন গগনবিহারী।

যোগজীবনের ছোট বোন ওঁকেও দাদা বলে ডাকত। গগনবিহারী ভালও বাসতেন।

শমিতা যোগজীবনের সঙ্গে গগনবিহারীর ঘরে ঢুকে একেবারে হৈ হৈ করে উঠল, তোমার উপরে ভীষণ রাগ করেছি গগনদা!

কেন বল তো? গগনবিহারী হাসতে থাকেন।

চারদিন এসেছ অথচ একটিবার আমাদের ওখানে গেলে না দেখা করতে।

আর দু'দিন অপেক্ষা করলে না কেন? দেখতে যেতাম কিনা?

সত্যি বলছ যেতে?

পরীক্ষা করা উচিত ছিল আগে।

যোগজীবন বলেন, শমির সঙ্গে তুমি কথায় পারবে না গগন।

গগনবিহারী নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসেন আর দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে স্বল্প বেশবাসের ফাঁকে ফাঁকে শমিতার যে উগ্র যৌবন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই যৌবনকে যেন উপভোগ করতে থাকেন!

শমিতা ঐ সময় বলে, শোন গগনদা, দাদার সঙ্গে তোমার এখানে আসার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে কিন্তু—

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তা উদ্দেশ্যটা কি?

আমাদের একটা ক্লাব আছে—

ক্লাব! তা ক্লাবের নাম কি?

ক্লাবের নাম মরালী সঙ্ঘ।

বেশ নামটা তো!

তাছাড়া যোগজীবন বলেন, ঐসব করছে আর কি! তা বাপু বলেই ফেল না গগনকে কি করতে হবে!

পেট্রোন হতে হবে।

পেট্রোন?

হ্যাঁ।

গগনবিহারী হাসতে হাসতে বলেন, তা দক্ষিণা কত?

পেট্রোনের কোন ধার্য দক্ষিণা নেই—তাঁরা যা-ই দেবেন তাই গ্রহণীয় হবে।

সুবীর একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে।

যোগজীবন আসছেন বলে গগনবিহারী তাকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সুবীর দেখ-

ছিল তার কাকার দু'চোখের লুব্ধ দৃষ্টি কেমন করে লেহন করছে শমিতার যৌবনকে।

ঠিক আছে, বস—আসছি।

গগনবিহারী উঠে গেলেন এবং একটু পরে চেক-বইটা হাতে ঘরে এসে খস খস করে একটা দেড় হাজার টাকার চেক লিখে শমিতার দিকে চেকটা ছিঁড়ে এগিয়ে ধরলেন, নাও।

চেকটায় একবার চোখ বুলিয়ে শমিতা বললে, মেনি মেনি থ্যাংকস্। আজ সন্ধ্যায় তাহলে আসছ?

কিন্তু আমি তো তোমাদের ক্লাব চিনি না।

আমি নিজে এসে নিয়ে যাব, শমিতা বললে।

বেশ, কখন আসবে?

সাড়ে সাতটায়। আমি তাহলে এখন উঠি গগনদা।

এখুনি উঠবে কি, চা-টা খাও। সুবীর?

কাকা।

রামদেওকে চা দিতে বল।

সুবীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তার সমস্ত মনটা জুড়ে তখন একটা ভরন্ত উজ্জ্বল যৌবন যেন নানা রংয়ের তুলি টেনে চলেছে!

চা-পর্ব শেষ হবার পর শমিতা চলে গেল।

গগনবিহারী তখন সুবীরের পরিচয় দিলেন, যোগজীবন, এই ভাইপোটির একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পার? তোমার তো অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে?

কতদূর লেখাপড়া করেছে? যোগজীবন প্রশ্ন করেন।

আরে তাহলে আর ভাবনা ছিল কি! আই. এ. পাস করে শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শিখেছে। অবিশ্যি একটা অফিসে কাজ করছে, মাইনে তেমন সুবিধার নয়।

যোগজীবন বললেন, বলব'খন দু-একজনকে।

সুবীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তারপরও ঘণ্টাখানেক দুই বন্ধুতে আলাপ-সালাপ হল।

দুজনেরই স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে।

গগনবিহারীঃ তবু এক ছেলে আছে, যোগজীবনের তাও নেই।

যোগজীবন একসময় জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের খবর কি তোমার, ফিরছে কবে?

সে আর ফিরবে না।

সে কি হে!

হ্যাঁ, সেখানেই বিয়ে-থা করে সংসার পেতেছে। যাক গে যা খুশি তার করুক।

আমার তো তবু শমিকে নিয়ে একরকম জীবন কেটে যাচ্ছে। তোমার তো তাহলে দেখছি একা একা খুবই কষ্ট হবে হে।

সেই জন্যেই তো ভাগ্নে আর ভাইপোটাকে এখানে এনে রেখেছি। গগনবিহারী বললেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় শমিতা এল গগনবিহারীকে নিতে নিজেরই গাড়িতে।

সুবীর নীচের বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় বসে একটা পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছিল।

মনে মনে সে স্থির করে রেখেছিল কাকা গগনবিহারী বের হয়ে যাবার পরেই সে বেরুবে।

শমিতা এল সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রায়। দূর থেকে দেখতে পেল সুবীর শমিতাকে। সকালের বেশভূষায় তবু তার কিছু আব্রু ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার বেশভূষায় সুবীরের মনে হল তাও বুঝি নেই।

পরচুলা দিয়ে উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। পরনে ফিনফিনে দামী আমেরিকান নাইলনের শাড়ি, গলা ও বগলকাটা অনুরূপ এক জামা গায়ে—যার তলা থেকে ব্রেসিয়ার ও দেহের প্রতিটি ভাঁজ ও উদ্ধত উচ্ছল যৌবন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শমিতা তার সামনে দিয়ে উপরে চলে গেল এবং মিনিট কয়েক বাদে গগনবিহারীকে নিয়ে নেমে এল। গগনবিহারীও সাজের কসুর করেননি। দামী ব্লু রংয়ের টেরিউল সুট, গলায় দামী টাই। দুজনে গাড়িতে উঠল, গাড়ি চলে গেল।

তারপর তিনটে মাস।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় গগনবিহারী বের হয়ে যান মরালী সঙ্ঘে এবং ফেরেন রাত সাড়ে এগারোটায়। রাত সাড়ে দশটায় গেট বন্ধ হয়ে যায়, তবে রাত সাড়ে এগারোটায় একবার খোলে। কাজেই সুবীরের কোন অসুবিধাই হয় না।

তাছাড়া যোগজীবনের চেষ্টায় সুবীরের একটা ভাল চাকরিও জুটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে।

গগনবিহারী যেন এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠেন।

সুবীর ও সুবিনয় আরামেই কাটায়। গগনবিহারীর সঙ্গে তাদের বড় একটা দেখাই হয় না। ওরা যে দুজন ঐ গৃহে আছে তাও যেন গগনবিহারীর মনে পড়ে না।

মধ্যে মধ্যে গগনবিহারী যেদিন ক্লাবে যান না শমিতাই আসে। রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত থাকে সে এবং ঐ সময়টা একমাত্র রামদেও ব্যতীত কারও উপরে যাবার হুকুম নেই।

সিঁড়ির নীচে বাহাদুর বসে থাকে।

সুবিনয় ও সুবীরের সঙ্গে জ্যাকির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।

আরও তিন মাস পরে হঠাৎ আর একজনের আবির্ভাব ঘটল ঐ বাড়িতে। রামদেওর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী রুক্মিণী।

রুক্মিণীর বয়স সতের কি আঠার। সবে যৌবনে পা দিয়েছে। যৌবন যেন টলটল করছে রুক্মিণীর সারা দেহে। দেহাতী গাঁয়ের মেয়ে হলে কি হবে রুক্মিণী রীতিমত চটুল। লাজ-লজ্জার তেমন বালাই নেই। সারা বাড়ি সে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যায় সাজগোজ করে, খোঁপায় ফুল গোঁজে। গুনগুন করে গান গায়। রুক্মিণীর স্থান হল উপরেই রামদেওর ঘরে।

রুক্মিণী ঐ গৃহে আসবার দিন কুড়ি-বাইশ বাদেই আকস্মিক ঘটনাটা ঘটল।

একদিন প্রত্যুষে—

হঠাৎ বাহাদুরের চেঁচামেচিতে সুবিনয়ের ঘুমটা ভেঙে গেল।

সুবীর গতরাত্রে গৃহেই ফেরেনি। সুবিনয়কে সে বলেই গিয়েছিল, রাত্রে হয়তো ফিরবে না—কোথায় এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাবে।

সুবিনয় বাহাদুরের চেঁচামেচিতে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি রে, ব্যাপার কি?

সাব্—

বাহাদুর আর বলতে পারে না। গলা আটকে যায়।

কি হয়েছে সাহেবের?

সাব্ খতম হো গিয়া—

খতম হো গিয়া! সে কি রে!

হাঁ। চলিয়ে—উপরমে চলিয়ে—

ত্বরিত স্খলিত পদে সুবিনয় উপরে উঠে গেল।

গগনবিহারী আসবার পর থেকে আর সে উপরে ওঠেনি। প্রয়োজনও হয়নি তার।

গগনবিহারীর শয়নকক্ষে ঢুকে থমকে দাঁড়াল সুবিনয়।

ঘরের মেঝেতে গগনবিহারীর মৃতদেহটা পড়ে আছে। পিঠে একটা ছোরা বসানো আমূল—চাপ চাপ রক্ত চারদিকে জমাট বেঁধে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বোজে।

তিন

প্রায় মিনিট দশ-পনরো লাগে সুবিনয়ের নিজেকে সামলে নিতে।

ধীরে ধীরে একসময় নিজেকে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সুবিনয়। আবার মেঝের

দিকে তাকায়, পরনে গগনবিহারীর পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন।

খালি পা। পায়ের চপ্পল জোড়ার একটা খাটের সামনে পড়ে আছে, অন্যটা মৃত-দেহের পায়ের অল্প দূরে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছেন গগনবিহারী। একটা হাত ছড়ানো, অন্য হাতটা দেহের নীচে। ঘরের মধ্যে সেণ্ট্রাল টেবিলটা উল্টে পড়ে আছে। একটা অর্ধসমাপ্ত হোয়াইট হর্সের বোতল, একটা ভাঙা কাচের গ্লাসে গোটা-দুই সোডার বোতলও মেঝের মধ্যে পড়ে আছে।

সুবিনয় ভেবে ঠিক করতে পারে না অতঃপর তার কি কর্তব্য। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বাহাদুর পাশেই দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সে-ই বলে, অব্ কেয়া হোগা দাদাবাবু!

রামদেও কোথায়? এতক্ষণে যেন নিজেকে অনেকটা গুছিয়ে নিয়ে প্রশ্নটা করে সুবিনয়।

রামদেও!

হ্যাঁ, রামদেও কোথায়? সে তো রাত্রে পাশের ঘরেই থাকে?

রামদেও নেহি হ্যায়।

নেহি হ্যায়? কোথায় গেল সে জান?

মুঝে মালুম নেহি হ্যায় দাদাবাবু। সুবেসেই উসকা পাত্তা নেহি।

ওর বৌ রুক্মিণী?

উ তো হ্যায়।

কোথায়?

উসিকা কামরামেই হ্যায়, নিদ যাতা হ্যায়।

অভিতক নিদ যাতা হ্যায়! ওকে ডেকে আন।

বাহাদুর চলে গেল এবং একটু পরে রুক্মিণীকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। রুক্মিণী ঘরে পা দিয়েই ভূপতিত গগনবিহারীর রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে ওঠে, এ মাইয়া—হায় রাম!

এই রুক্মিণী, কাল রাত্রে তুই পাশের ঘরেই ছিলি তো?

হ্যাঁ, ছিলাম।

কোন শব্দ বা চিৎকার শুনিসনি?

হায় রাম! নেহি দাদাবাবু, কুছ নেহি শুনা।

মিথ্যে কথা। সুবিনয় গর্জন করে ওঠে, সত্যি কথা বল্?

হায় রাম! সাচ্ বলছি দাদাবাবু, তোর গোড় লাগি, আমি কিছু জানি না, কিছু শুনিনি।

রামদেও কোথায়, তোর স্বামী?

কেন, সে বাড়িতেই আছে।

না, তাকে দেখছি না। কোথায় গিয়েছে সে?

কোথায় আবার যাবে। হয়তো বাজারে গিয়েছে।

এত সকালে বাজারে?

তবে কোথায় যাবে?

ঐ সময় সুবীর এসে ঘরে ঢুকল হন্তদন্ত হয়ে। সে বাড়ি ফিরেই নিচে চাকর ও প্রিয়লালের মুখে দুঃসংবাদটা পেয়েছিল।

ঘরে পা দিয়ে সুবীর বলল, এ কি, কখন হল!

সুবিনয় বললে, মাথার মধ্যে আমার যেন কেমন করছে সুবীরদা। চল চল, এ ঘর থেকে বের হয়ে চল—এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়।

পুলিসে একটা খবর দিয়েছ? সুবীর প্রশ্ন করে।

পুলিস!

হ্যাঁ, খুন—সর্বাগ্রে আমাদের পুলিসকেই খবর দেওয়া উচিত। এস। এই রুক্মিণী, বাইরে যা।

রুক্মিণী বাইরে চলে গেল।

সুবীরই পাশের ঘরে গিয়ে নিকটবর্তী থানায় একটা ফোন করে দিল এবং থানায় ফোন করবার পর যোগজীবনবাবুকেও একটা ফোন করে দিল।

ফোন করে দুজনে নিচে এসে বসল সুবিনয়ের ঘরে।

সুবিনয় বললে, এখন কি হবে সুবীরদা?

পুলিস এসে যা ব্যবস্থা করে তাই হবে।

কিন্তু ঐ ভাবে ক্রুটালি কে মামাকে খুন করল!

যে ভাবে বুড়ো বয়সে মামা মেয়েমানুষ নিয়ে বেলেল্লাপনা শুরু করেছিলেন, এমন যে একটা কিছু হবে আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। তা রামদেও রুক্মিণী কি বলে—ওরা তো রাত্রে পাশের ঘরেই থাকে!

রুক্মিণী বললে সে কিছু জানে না।

বললেই অমনি হল? পাশের ঘরে একটা মানুষ খুন হয়ে গেল, আর ওরা কিছুই জানে না? রামদেও কি বলে?

রামদেও নেই।

নেই মানে?

পাওয়া যাচ্ছে না তাকে সকাল থেকে।

তবে হয়তো ঐ বেটারই কীর্তি!

কি বলছ তুমি সুবীরদা?

কাকাবাবুর যা চরিত্র ছিল—হয়তো ঐ ছুকরি রামদেওর বৌটার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, দিয়েছে বেটা খতম করে!

না, না—

নচেৎ বেটা গায়েবই বা হবে কেন?

হয়তো ব্যাপারটা জানতে পেরে ভয়ে নার্ভাস হয়ে পালিয়েছে!

সুবীর মৃদু হাসল, ভুলে যেও না সুবিনয়, বেটা এককালে মিলিটারিতে চাকরি করত।

কিন্তু ও তো মামার কাছে অনেকদিন থেকেই আছে।

হুঁ, মেয়েমানুষের ব্যাপারে বিশ্বাস! দুনিয়াটা অত সহজ রাস্তায় চলে না হে সুবিনয়। অত্যন্ত জটিল। আমি তোমাকে বলে রাখছি, ঐ রুক্মিণী ছুঁড়ীকে নিয়েই ব্যাপারটা ঘটেছে। তা গতরাত্রে মিস শমিতা সান্যাল আসেনি?

শুনলাম তো এসেছিলেন কাল রাত্রে—

কে বললে?

রামদেওই বলছিল।

ঐ মিস শমিতা সান্যালটি আর একটি চিজ!

আধঘণ্টার মধ্যে থানা অফিসার অরূপ মুখার্জী এসে গেলেন। অরূপ মুখার্জী একেবারে ইয়ং নয়—বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, লম্বাচওড়া চেহারা। সঙ্গে জনাচারেক সিপাইও আছে।

পুলিসের জিপের আওয়াজ পেয়েই সুবীর সুবিনয়কে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

অরূপ মুখার্জী জিজ্ঞাসা করলেন, থানায় ফোন করেছিলেন কে?

সুবীর বললে, আমি স্যার।

আপনি?

আমি এই বাড়িতেই থাকি, আমার কাকা এক্স-মিলিটারি অফিসার কর্ণেল গগনবিহারী চৌধুরী খুন হয়েছেন।

কি করে খুন হল?

খুব সম্ভব স্ট্যাবড্ টু ডেথ!

ডেড বডি কোথায়?

দোতলায়।

চলুন।

ঐ সময় হঠাৎ দূরে কোথা থেকে ক্ষীণ একটা কুকুরের ডাক যেন কানে এল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে থানা-অফিসার অরূপ মুখার্জীর।

ডাকটা সুবীর ও সুবিনয়ের কানেও এসেছিল।

অরূপ মুখার্জী বললেন, একটা কুকুরের ডাক শুনছি যেন! এ বাড়িতে কোন কুকুর আছে নাকি?

সুবিনয় বলে, হ্যাঁ স্যার, একটা আলসেসিয়ান কুকুর আছে।

কুকুরটা কার সুবিনয়বাবু?

মামার পোষা কুকুর।

মানে যিনি খুন হয়েছেন?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য! এ বাড়িতে একটা কুকুর ছিল তাহলে? তা কোথায় কুকুরটা?

সুবিনয় বললে, তাই তো, কুকুরটা কোথায়?

সুবিনয় ও সুবীর তখন দুজনেই জ্যাকির নাম ধরে ডাকতে শুরু করে, জ্যাকি জ্যাকি!

কিন্তু জ্যাকি আসে না। জ্যাকির দেখা পাওয়া যায় না।

সুবীর বলে, আশ্চর্য, সত্যিই এতক্ষণ আমাদের একবারও জ্যাকির কথা মনে পড়েনি। জ্যাকি কোথায় গেল?

একটা বাঘের মত কুকুর।

জ্যাকির ডাক আবারও শোনা গেল।

ওরা সকলে সিঁড়ি থেকে নেমে এল। একতলাটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির পিছনে মালির জন্য যে ঘর তৈরী করা হয়েছিল, অথচ কোন মালী না থাকায় এতদিন যে ঘরটা খালি পড়েছিল সেখানে সকলে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির পিছনে যে জায়গাটা খালি পড়েছিল সেখানেই ছিল ঘরটা। ঘরটার মধ্যে বাড়ি তৈরির সব জিনিসপত্র, কোদাল, শাবল, চুপড়ি বালতি, লোহার রড, বাঁশ, দড়ি স্তূপীকৃত করা ছিল এবং বাইরে থেকে তালা লাগানো ছিল। দেখা গেল সেই ঘরের তালা নেই, একটা দড়ির সাহায্যে কড়া দুটো দরজায় শক্ত করে বাঁধা আর সেই ঘরের ভিতর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে, দরজার গায়ে নখের আঁচড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ডাকটা এবারে বেশ স্পষ্ট।

অরূপ মুখার্জী থমকে দাঁড়ালেন দরজার সামনে এসে।

কুকুরটা আপনাদের চেনে তো! সুবীর ও সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, স্যার। সুবীর বললে।

তাহলে আপনারাই কেউ দরজাটা খুলুন তো।

সুবীরই এগিয়ে গিয়ে দরজাটার দড়ি খুলে দিল। ঘরটা অন্ধকার, একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ দরজাটা খুলতেই ওদের নাকে এসে যেন ঝাপটা দেয়।

জ্যাকি ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বের হয়ে এল দরজাটা খুলে দিতেই। কিন্তু তার তেজ ও গতির ক্ষিপ্রতা যেন নেই আর।

কেমন যেন একটা মিয়ানো ভাব।

কুকুরটা কিন্তু ওদের দিকে তাকালও না, একবার অরূপ মুখার্জীর সামনে এসে ওর গন্ধ শুঁকে সোজা ভিতরের দিকে চলে গেল।

সকলে ওরা অনুসরণ করে জ্যাকিকে।

জ্যাকি আগে চলেছে, ওরা তিনজন পিছনে পিছনে।

জ্যাকি ভিতরে ঢুকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে থাকে। পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে ওরা তিনজন।

জ্যাকি এসে একেবারে খোলা দরজাপথে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গগনবিহারীর শয়নঘরে প্রবেশ করল, ওরাও ঘরে গিয়ে ঢুকল।

জ্যাকি ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে ভূপতিত গগনবিহারীর মৃতদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক শুঁকলো দেহটা, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মৃতদেহের কাছেই একেবারে।

তারপরই হঠাৎ মুখ তুলে জ্যাকি কয়েকবার ডাকল। ডাকল ক্ষীণ, ক্লান্ত কিন্তু দীর্ঘায়ত। মনে মনে যেন প্রভুর মৃত্যুতে কাঁদছে।

আশ্চর্য, জ্যাকির চোখে সত্যিই জল! সত্যিই জ্যাকি কাঁদছে!

তিনজনেই সেই করুণ দৃশ্য দেখে একেবারে নির্বাক। বোবা যেন!

চার

যোগজীবন যখন ফোনটা পেলেন সে সময় তিনি একা ছিলেন না। ঘরের মধ্যে দুজন ছিলেন। তিনি আর কিরীটী।

যোগজীবনের খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস বরাবরই, লেকের কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করার পর থেকে প্রত্যহ খুব ভোরে রাত থাকতে উঠে বেড়াতে চলে যেতেন লেকে।

সারাটা লেক হেঁটে চক্কর দিতেন এবং সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে আসতেন আবার। কি গ্রীষ্ম, কি শীত—কখনও বড় একটা তাঁর ঐ রুটিনের ব্যতিক্রম হত না।

কিরীটীও তার নতুন বাড়ি গড়িয়াহাটায় চলে আসবার পর খুব ভোরে উঠে লেকে বেড়াতে যেতে শুরু করেছিল।

সেইখানেই অনেকের সঙ্গে আলাপ।

যোগেশবাবু, ধীরেনবাবু, মাস্টারমশাই প্রমোদবাবু, ফণীবাবু, দীনেশবাবু ও যোগজীবন

—সবারই রিটায়ার্ড লাইফ।

অবসর জীবন যাপন করছেন।

যোগজীবনের সঙ্গেই কিরীটীর একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

মধ্যে মধ্যে যোগজীবন আসতেন কিরীটীর গৃহে, কিরীটীও যেত যোগজীবনের গৃহে।

কিরীটীর মাথায় আবার নানা ধরনের ফুলের গাছের শখ চেপেছিল, যোগজীবনেরও ফুলগাছের শখ। যোগজীবন প্রায়ই গাড়ি নিয়ে এদিক-ওদিক কলকাতার বাইরে সব নার্সারীতে যেতেন ফুলগাছের সন্ধানে।

কিছুদিন আগে ক্রোটন ফুলের একটা চারা এনেছিলেন যোগজীবন। তাতে প্রথম ফুল ধরেছে—কথাটা লেকে বেড়াতে বেড়াতে শুনে কিরীটী যোগজীবনের সঙ্গে তাঁর গৃহে এসেছিল দেখতে টবে ফোটা ফুলটা।

ফুল দেখার পর কিরীটী বললে, এটা ক্রোটন নয় যোগজীবনবাবু।

নয়! কিন্তু নার্সারীর লোকটা যে বললে!

হয় সে ক্রোটন চেনে না, না হয় আপনাকে ঠকিয়েছে।

যোগজীবন হা হা করে হেসে ওঠেন, যাক গে, না জেনে ঠকেছি দুঃখ নেই।

ভৃত্য এসে ঐ সময় বললে, চা দেওয়া হয়েছে।

যোগজীবনের লেক থেকে বেড়িয়ে সর্বাগ্রে এক কাপ চায়ের প্রয়োজন হয়। তিনি কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন রায় সাহেব, চা খাওয়া যাক।

চলুন।

দুজনে বসে গল্প করতে করতে চা পান করছেন, ঐ সময় এল ফোন।

চাকর এসে ফোনের কথা বললে।

যোগজীবন শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ফোনে গগনবিহারীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তো একেবারে থ যোগজীবন! তাও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—খুন!

যোগজীবন মিনিট দশেক বাদে বসবার ঘরে ফিরে আসতেই কিরীটী যোগজীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটু বিস্মিতই হয়।

কি ব্যাপার যোগজীবনবাবু? ফোনে কোন দুঃসংবাদ ছিল নাকি? ইউ লুক ও, মাচ পেল অ্যাণ্ড ডিসটার্বড্! পক

যোগজীবন চেয়ারটার ওপর বসতে বসতে বললেন, সত্যিই দুঃসংবাদ রায় সঙ্গে আমার এক দীর্ঘদিনের বন্ধু, মাত্র কয়েক মাস আগে মিলিটারি থেকে রিটায়ার করে অ্যাভিন্যুতে বাড়ি করে বসবাস করতে এসেছিল, সে—

কি হয়েছে তাঁর?

হি হ্যাজ বিন কিল্ড!

কিল্ড! মানে হত্যা করেছে তাঁকে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, স্ট্যাবড্ টু ডেথ্!

কোথায়?

তার শোবার ঘরেই, আমাকে তার ভাইপো সুবীর এখুনি একবার যেতে বললে। আপনি বসুন, প্রস্তুত হয়ে আসি। ড্রাইভার তো এত তাড়াতাড়ি আসেনি, একটা ট্যাক্সি নিয়েই যাব ভাবছি।

যোগজীবন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী তার পকেট থেকে চুরুট ও দেশলাই বার করে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করল।

যোগজীবন মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এলেন, চলুন।

রাস্তায় বের হয়ে কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। এমনিই হয়। দরকারের সময় হাতের কাছে কখনই একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

চলুন না, কাছেই তো। হেঁটেই যাওয়া যাক, কিরীটী বললে।

চলুন।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন।

রাস্তায় তখনও একটা বড় লোক-চলাচল শুরু হয়নি। খুব বেশী হলে সাড়ে-ছটা হবে।

আপনার বন্ধুর বাড়িতে কে কে ছিল যোগজীবনবাবু?

ওর স্ত্রীর আগেই মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র ছেলে বিলেতে সেটেল্ড্ করেছে—এঞ্জিনিয়ার। বাড়িতে এক ভাগ্নে আর এক ভাইপো তাদেরই এনে রেখেছিল।

ভাড়া দেননি বুঝি?

না।

ফোন করেছিল একটু আগে আপনাকে আপনার বন্ধুর ভাইপোই না?

হ্যাঁ।

কি করেন ভদ্রলোক?

আমিই কিছুদিন আগে এক মারোয়াড়ী ফার্মে ভাল চাকরি করে দিয়েছি।

বয়স কত?

...শ-বত্রিশ হবে।

...বাহিত?

...। বিয়ে-থা করেনি সুবীর আজও।

...আর ভাগ্নে?

সুবিনয় সুবীর থেকে বছর দুই-তিনের বোধ হয় ছোট। কোন একটা নামকরা

ঔষধের প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ্, শুনেছি ভালই মাইনে পায়।

বাড়িতে চাকর-বাকর আছে কজন?

গগনের সঙ্গেই এসেছিল তার নেপালী ড্রাইভার বাহাদুর—ভৃত্য রামদেও। রামদেও লোকটা মিলিটারিতে চাকরি করত, খুব বিশ্বাসী এবং গগনের খুব প্রিয়। কেয়ার-টেকার ও দারোয়ান গর্জন সিং আর এদেশীয় ভৃত্য রতন ও কুক্ প্রিয়লাল। হ্যাঁ, আর একটি জীব আছে।

জীব?

একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর—জ্যাকি।

কুকুরটা কার?

গগনেরই। গগনের সঙ্গেই এসেছে। বাঘের মতন কুকুর।

আশ্চর্য!

কি বললেন?

বলছি অমন একটা কুকুর বাড়িতে, তবু ঐ রকম দুর্ঘটনা ঘটল।

আমিও তো তাই ভাবছি রায় সাহেব।

মানুষটি এমনিতে কেমন ছিলেন—মানে বলছি কোন রকমের ভাইস ছিল কি?

না। সে রকম কিছু আমি অন্ততঃ জানি না। অবিশ্যি এমনিতে একটু সেলফসেণ্টার্ড, লোকজনের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। তবে ইদানীং শুনতাম শমিতাদের ক্লাবে প্রত্যহ প্রায় যেত।

শমিতা কে?

আমার বোন।

বয়স কত?

বেশী নয়, বছর ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। ভবতারিণী কলেজে ইংলিশের প্রফেসার।

ক্লাবটার নাম কি?

মরালী সঙ্ঘ।

মরালী সঙ্ঘের নাম শুনে কিরীটী যোগজীবনের দিকে তাকাল, কারণ ক্লাবটার নাম সেও শুনেছিল। বালীগঞ্জ অঞ্চলেই ক্লাবটা। শহরের একদল ধনী প্রৌঢ় ও তথাকথিত, অভিজাত পরিবারের যুবক-যুবতী মিলে ক্লাবটা গড়ে তুলেছে। ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবাই। ক্লাবে কিরীটী শুনেছিল নানা ধরনের খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে চালোয়া মদ্যপানও চলে। মধ্যে মধ্যে আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করে।

সাধারণ স্তরের লোকেরা সেখানে প্রবেশ অধিকার পায় না।

আপনার বোন বুঝি ঐ ক্লাবের মেম্বার?

মেম্বার মানে—একজন প্রধান পাণ্ডা। লেখাপড়া আর ক্লাব নিয়ে তো আছে হৈ-চৈ করে! আমিও আপত্তি করিনি। থাক।

বিয়ে-থা হয়নি?

হয়েছিল, কিন্তু বছর দুই হল ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।

আর বিয়ে-থা করলেন না?

না। ভালবেসে বিয়ে করেছিল কিন্তু তাও টিকল না দু'বছরের বেশী।

কিরীটী কোন কথা আর বলে না। ইতিমধ্যে ওরা গগনবিহারীর বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল।

যোগজীবন বলেন, এই বাড়ি।

কিরীটী লক্ষ্য করল দুজন লাল পাগড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। তারা ওদের প্রবেশে বাধা দিল না।

বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা করুণ দীর্ঘায়ত কুকুরের ডাক ওদের কানে এল। কিরীটী বললে, কুকুরটা কাঁদছে।

যোগজীবন কিছু বললেন না।

দুজনে এগিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দায় উঠল।

ভৃত্য রতন ও বাহাদুর সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। যোগজীবনকে দেখে বাহাদুর সেলাম দিল, বাবুজী।

বাহাদুর?

সাব চলা গিয়া বাবুজী। বাহাদুরের গলায় কান্নার আভাস। চোখে জল।

কেইসে হুয়া কুছ পাতা মিলা বাহাদুর?

নেহি বাবুজী, অভিতক সমঝ মে নেহি আতা হ্যায় এইসা কেইসে হো সেকতা।

তুমি তো কাল রাত্রে বাড়িতে ছিলে?

জী।

রামদেওও কিছু জানে না? সেও কিছু বলতে পারছে না? যোগজীবন আবার প্রশ্ন করলেন।

রামদেওকো পাতাই নেহি মিলতা বাবুজী সুবেসে!

কেন, সে কোথায় গিয়েছে?

কা জানে কিধার গিয়া, আভিতক নেহি লৌটা।

ওর বৌ—জেনানা কোথায়?

উপরমে হ্যায়।

ওর বৌ তো পাশের ঘরেই থাকত, সেও কিছু বলতে পারছে না?

নেহি বাবুজী, বেচারী রোতা হ্যায় শুনকর।

কিরীটী ঐ সময় প্রশ্ন করে, রামদেওর বৌ এখানে থাকত নাকি ?

হ্যা। বেটার তৃতীয় পক্ষের বৌ, কিছুদিন হল এসেছে এখানে।

বয়স তো তাহলে খুব অল্প ?

হ্যা, ষোল-সতের হবে।

দেখতে কেমন ?

দেখতে মোটামুটি ভালই।

চলুন উপরে যাওয়া যাক, কিরীটী বললে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বারান্দায় পৌঁছতেই সুবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এই যে স্যার, আপনি এসে গিয়েছেন, যান ভিতরে গিয়ে দেখুন কাকা—কথাটা শেষ করতে পারে না সুবীর, কান্নায় যেন তার গলাটা বুজে আসে।

কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুবীরকে দেখছিল।

বেশ সুন্দরই চেহারা, তবে রোগা। গায়ের রং সুবীর বংশের ধারা অনুযায়ীই পেয়েছিল। রীতিমত ফর্সা। মাথাভর্তি চুল ব্যাকব্রাস করা, তারই মধ্যে দু-একটা রূপালী চুল চোখে পড়ে। চোখ দুটি বড় বড়, টানা টানা। উন্নত নাসা। ধারালো চিবুক। চোখে সৌখীন ফ্রেমের চশমা।

পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। ইতিমধ্যে সুবীর বাইরের বেশ বদলে ফেলেছিল।

কিরীটীই প্রশ্ন করে, বাইরে পুলিস দেখলাম, থানার ও. সি. এসেছে বোধ হয় !

হ্যা, মিঃ মুখার্জী।

অরূপ না ?

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সুবিনয় বাইরে এল ঐ সময় ঘর থেকে।

রায় সাহেব—এই সুবিনয়, গগনের ভাগ্নে।

কিরীটী তার অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নেয় সুবিনয়ের সর্বাঙ্গে।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। গায়ের রংটা একটু চাপা। মাথার চুল রুক্ষ, বিস্রস্ত। চোখে-মুখে একটা দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে যেন। পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত।

আপনি এসেছেন ! যোগজীবনের দিকে তাকিয়ে বলে সুবিনয়, যান ভিতরে যান, থানা-অফিসার ভেতরেই আছেন। কথাটা বলে সুবিনয় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকায়।

কিরীটী যোগজীবনকে বললে, চলুন সান্যাল মশাই, ভেতরে যাওয়া যাক।

হ্যা, চলুন।

দুজনে এগিয়ে গেল।

পাঁচ

মৃতদেহ পরীক্ষান্তে অরূপ মুখার্জী তখন ঘরের চারদিকে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল। যোগজীবন আগে ও পরে কিরীটী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

পদশব্দে চোখ তুলে তাকাতেই অরূপের সঙ্গে কিরীটীর চোখাচোখি হল, অরূপের চোখের তারা দুটো যেন আনন্দে চকচক করে ওঠে।

মিঃ রায়, আপনি!

নতুন থানায় বদলি হয়ে এসে অরূপ কিরীটী তার এলাকাতেই আছে জানতে পেরে নিজেই একদিন গিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করে এসেছিল।

কাজেই পরস্পর পরস্পরের কাছে তারা অপরিচিত নয়।

কিরীটী যোগজীবনকে দেখিয়ে বললে, হ্যাঁ অরূপ, উনি আসবার সময় আমায় ধরে নিয়ে এলেন, ফোনটা যখন যায় আমি ওঁর ওখানে বসে চা খাচ্ছিলাম।

খুব ভাল হয়েছে আপনি এসেছেন। কিন্তু উনি—ওঁর পরিচয়? অরূপ যোগজীবনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল।

যোগজীবন সান্যাল, রিটায়ার্ড লাইফ যাপন করছেন। কাছাকাছিই বাড়ি। গগনবিহারীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আই সী! আপনাকে বুঝি ফোনে সংবাদ দিয়েছিল কেউ, যোগজীবনকে প্রশ্ন করে অরূপ।

হ্যাঁ। ফোন পেয়েই তো আসছি।

কে ফোন করেছিল?

সুবীর, গগনের ভাইপো।

কিরীটী ইতিমধ্যে ভূপতিত মৃতদেহটার সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

মৃতদেহের সামনে তখন জ্যাকি বসে আছে।

সে তাকালও না।

পৃষ্ঠদেশে ছোরাটা আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে। খানিকটা বাঁদিক ঘেঁষে ছোরাটা বিদ্ধ করা হয়েছে। বোঝা যায় ঐ ছুরিকাঘাতেই সম্ভবতঃ মৃত্যু হয়েছে গগনবিহারীর।

একটু দূরে দামী খাট, উপরে আধুনিক ডিজাইনের শয্যা, শয্যার চাদর এলোমেলো, বালিশ দুটোও যথাস্থানে নেই। খাটের নীচে খানিকটা জায়গা জুড়ে মেঝেতে দামী একটা কার্পেট বিছানো, বাকি মেঝেটায় কোন কার্পেট নেই।

সাদা কালো ডিজাইনের মোজাইক টাইলসয়ের মেঝে ঘরে। ঝকঝকে পরিষ্কার মেঝে।

খাটের হাত পাঁচেক দূরে মৃতদেহটা উত্তর-দক্ষিণ ভাবে কোণাকুণি পড়ে আছে।

বড় সাইজের মিরার বসানো একটা গডরেজের স্টীলের আলমারির গা ঘেঁষে।

কিরীটী নীচু হয়ে বসল মৃতদেহের সামনে। চোখেমুখে মৃতদেহের যেন একটা সুস্পষ্ট যন্ত্রণার চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে আছে।

বুকের ছোরাবিদ্ধ রক্তাক্ত ক্ষতস্থান ছাড়া মৃতের ডানদিককার গালে একটা সরু লম্বা ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ল, ডান হাতটা মৃতের মুঠো করা।

হাতের পাতায় খানিকটা রক্ত জমে আছে কালো হয়ে।

কিরীটী মৃতদেহের বদ্ধ মুঠি খোলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। কি যেন একটা চকচক করছে মুঠির মধ্যে, ওর নজরে পড়ে। রাইগারমার্টিস সেট ইন করেছিল মৃতদেহে।

চকচকে বস্তুটি কোনমতে বদ্ধ মুঠি থেকে বের করতে গিয়ে ভেঙে গেল।

কিরীটী সেই ভাঙা বস্তুটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার দেখল ভাল করে জিনিসটা কি? ঠিক বুঝতে পারল না।

অরূপ পাশেই দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল, জিজ্ঞাসা করল, কি ওটা মিঃ রায়?

মনে হচ্ছে একটা ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো।

ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো!

তাই তো মনে হচ্ছে।

কিরীটী রেখে দিল পকেটের মধ্যে ভাঙা চুড়ির টুকরোটা।

হাতের মুঠোর মধ্যে কোথা থেকে এল ওটা?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হয়তো কোন পলাতকা প্রেয়সীর চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের হাতের মুঠোর মধ্যে!

কি বলতে চান মিঃ রায়?

কিরীটী কিন্তু অরূপ মুখার্জীর সে প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। সে তখন ঘরের চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে।

ঘরটা বেশ বড় সাইজের। দক্ষিণ ও উত্তরমুখী দুটো দুটো করে বড় সাইজের ডবল পাল্লার জানালা, জানালায় গ্রিলস বসানো। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। ঘরে দুটো দরজা, একটা পাশের ঘরে যাবার তার মধ্যে।

কিরীটী বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকল ঘর থেকে। ইটালিয়ান টাইলস দিয়ে বাথরুমের দেওয়ালের অর্ধেকটা মোড়া, মেঝে মোজাইকের। মস্ত বড় একটা বাথটব। আয়না বসানো দেওয়ালে। আয়নার নীচে কাঁচের সেলফ্। সেলফের উপরে সেভিং সেটস্—সেভিং ক্রিম্, ব্রাস, টুথপেস্ট, টুথব্রাস, টাংগ ক্লিনার, চিরুনি ও ব্রাস, সেভিং লোসন, ল্যাভেণ্ডার স্প্রে, নেইল কাটার সযত্নে সাজানো।

হুজ' সবই পরীক্ষা করে দেখল কিরীটী—দামী ও বিলিতি। ব্লু রংয়ের একটা বেসিন। টাওয়েল র‍্যাকে ব্লু রংয়ের একটা টার্কিশ টাওয়েল এলোমেলো ভাবে ঝোলানো। টাওয়েলটা তুলে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে নজরে পড়ল কিরীটীর ফিকে লালচে অনেকটা ব্রাউন রংয়ের ছোপ ছোপ দাগ টাওয়েলের মধ্যে।

কিরীটী ঝুঁকে পড়ে বেসিনটা দেখতে লাগল। বেসিনের কলটা ভাল করে বোধ হয় টাইট করা নেই, ক্ষীণধারায় জল পড়ে যাচ্ছিল তখনও।

বেসিনের সাইডে সাবান রাখবার জায়গায় সাবানটাও ঠিকভাবে রাখা নেই মনে হয় যেন। সাবানটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে দেখল কিরীটী, দামী গন্ধওয়ালা সাবান। সাবানটাও বিলিতি মনে হয়।

বাথরুমের ফ্লোরে এখানে ওখানে জল তখনও জমে আছে।

ব্র্যাকেটে একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলছে।

পুনরায় কাচের সেলফটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ল মাথার চিরুনির গায়ে কয়েকটা বড় বড় চুল আটকে আছে।

চিরুনি থেকে চুলগুলো ছাড়িয়ে একটা কাগজে মুড়ে কিরীটী পকেটে রেখে দিয়ে বাথরুম থেকে বের হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বাথরুমে মেথরদের যাতায়াতের যে দরজাটা তার পাল্লা দুটো ভেজানো থাকলেও ভিতর থেকে খিল দেওয়া নেই। খোলা।

কিরীটী দরজার পাল্লা দুটো টেনে খুলতেই নজরে পড়ল ঘোরানো লোহার সিঁড়িটা। ঐ সিঁড়িই মেথরদের বাথরুমে আসা-যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাথরুমের দরজাপথেই কিরীটীর নজরে পড়ে বাড়ির পিছন দিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, ঘাস ও আগাছায় ভর্তি। দূরে প্রাচীর ঘেঁষে একেবারে ছোট একটা ঘর।

চারিদিকে দেখে কিরীটী দরজাটা টেনে দিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এল আবার। ঘরের চারিদিক নজর করে আবার দেখে, একটা দামী সিঙ্গল খাট, একটা গডরেজের আলমারি, ওয়ারড্রোব, তার উপরে একটা বুদ্ধমূর্তি ও একটা কাঠের হাতী।

অরূপ!

কিছু বলছিলেন? কিরীটীর ডাকে ওর দিকে তাকাল অরূপ কথাটা বলে।

তোমার সব জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে?

না।

তাহলে শুরু করে দাও।

আপনি এখন চলে যাবেন?

না। তোমার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হোক, তারপর যাব।

তাহলে চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

ডেড বডি সরাবার ব্যবস্থা করেছ ?

করেছি, ফোন করে দিয়েছি।

পাশের ঘরে এসে সকলে বসল। ওটাই বসবার ঘর। চমৎকার ভাবে সাজানো। একপাশে ফোনও আছে।

যোগজীবনবাবু কাঁদছিলেন। চোখ দুটো তাঁর লাল হয়ে উঠেছিল। কিরীটী যে সোফাটায় বসে, যোগজীবনবাবু সে সোফাতেই কিরীটীর পাশ ঘেঁষে বসলেন।

রায় সাহেব! যোগজীবনবাবু রুদ্ধ গলায় ডাকলেন।

বলুন ?

এ কি হল বলুন তো! গগনকে এমন নিষ্ঠুরভাবে কে হত্যা করল ? যোগজীবন যেন কান্না রোধ করতে পারছিলেন না।

আমি বুঝতে পারছি সান্যাল মশাই বন্ধুর মৃত্যুতে খুব শক্‌ড্ হয়েছেন, তবে—

কি তবে ?

ওঁর মৃত্যুর—মানে অপঘাত মৃত্যুর জন্য আমার মনে হচ্ছে যেন উনিই দায়ী।

গগন নিজে দায়ী!

তাই তো আপাততঃ মনে হচ্ছে আমার।

কেন ?

কিরীটীর জবাবটা আর দেওয়া হল না, সুবিনয় এসে ঘরে ঢুকল।

অরূপ সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বসুন সুবিনয়বাবু।

সুবিনয় বসল।

আপনিই তো প্রথম দেখেন মৃতদেহ, তাই না ?

না মিঃ মুখার্জী, আমি না, বাহাদুর। সে-ই প্রথমে দেখে, দেখে আমাকে ডেকে আনে।

হুঁ। কাল রাত্রে আপনি তো বাড়িতেই ছিলেন ?

হ্যাঁ। কাল শনিবার ছিল, বেলা চারটে নাগাদ অফিস থেকে ফিরে আসি, তারপর আর বের হইনি। নীচে নিজের ঘরেই ছিলাম।

কখন শুতে যান ?

আমার বরাবর একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই অভ্যাস রাত্রে। দশটা নাগাদ শুয়ে পড়েছিলাম।

আর সুবীরবাবু ?

সে বিকেলেই সেজেগুজে বের হয়ে গিয়েছিল, আজ সকালে ফিরেছে। রাত্রে বাড়িতে ছিল না।

আর আপনার মামা গগনবাবু? তিনি কাল বের হননি কোথাও?

মামাও কাল বের হননি।

কেউ তাঁর কাছে এসেছিল?

হ্যাঁ। রাত তখন বোধ করি সাড়ে নটা কি পৌনে দশটা হবে—ঠিক সময়টা মনে নেই, আমার খাওয়া হয়ে যাবার পরই শমিতা দেবী এসেছিলেন।

কথাটা সুবিনয় শেষ করল একবার আড়চোখে কিরীটীর পার্শ্বে উপবিষ্ট যোগজীবনের দিকে তাকিয়ে।

অত রাত্রে শমিতা দেবী এসেছিলেন!

হ্যাঁ, প্রায়ই তো আসতেন। তবে ইদানীং হপ্তাখানেক আসছিলেন না, মামাও বের হতেন না সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে দেখছিলাম।

শমিতা দেবী কে? অরূপ প্রশ্ন করল।

যোগজীবনবাবুর বোন।

অরূপ যোগজীবনবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

যোগজীবনবাবু বললে, হ্যাঁ, আমার বোন। গগন ওকে ছোটবেলা থেকেই চিনত। তাছাড়া শমিতাদের মরালী সঙ্ঘের পেট্রোন ছিল গগন।

গগনবাবুর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের পরিচয় বলুন তাহলে?

হ্যাঁ, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের পরস্পরের।

আচ্ছা, শমিতা দেবী বিবাহিত, না অবিবাহিত?

জবাবটা দিল সুবিনয়ই, বিবাহ করেছিলেন তবে বছর দুই আগে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। মামাবাবুর সঙ্গে বেশ ভাল পরিচয়ই ছিল শমিতা দেবীর।

তা কখন শমিতা দেবী চলে যান আবার রাত্রে?

বলতে পারি না। আমি ঘুমোবার পর হয়তো চলে গিয়েছিলেন। বাহাদুর বলছিল—

কি বলছিল?

রাত এগারোটা নাগাদ নাকি কাল গিয়েছিলেন শমিতা দেবী।

আপনি জানতে পারেননি কখন গিয়েছেন?

না।

আপনি তাহলে জানতেই পারেননি কখন শমিতা দেবী চলে গেলেন? কিরীটীই প্রশ্নটা করে আবার।

না।

আচ্ছা সুবিনয়বাবু—

বলুন!

আপনার মামার একমাত্র ছেলে তো বিলেতেই সেটেল্‌ড্‌। শুনেছিলাম আর ফিরবে না?

সেই রকমই শুনেছি।

আপনার মামাকে তাঁর সম্পর্কে কখনও কিছু বলতে শুনেছেন?

না।

তিনি চিঠিপত্র লিখতেন না তাঁর বাবাকে?

না, শুনিনি কখনও।

তাহলে তো দেখা যাচ্ছে গগনবাবুর যা কিছু আছে, এই বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি টাকা-কড়ি সব কিছুর ওয়ারিশন আপনি ও সুবীরবাবুই?

তা আমি কি করে বলব কাকে তিনি সব কিছু দেবেন বা না দেবেন!

উইল-টুইল কিছু করেছিলেন?

মাসখানেক আগে শুনেছি উইল করেছিলেন মামাবাবু।

কার কাছে শুনলেন?

সুবীরদার মুখে।

তিনি কেমন করে জানলেন কথাটা?

জানি না।

জিজ্ঞাসা করেননি?

না।

অরূপ, সুবিনয়বাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

আপাতত না। আপনি সুবিনয়বাবু এখন যেতে পারেন। সুবীরবাবুকে পাঠিয়ে দিন এ ঘরে।

সুবিনয় চলে গেল, আর একটু পরেই সুবীর এসে ঘরে ঢুকল।

অরূপই প্রশ্ন শুরু করে, সুবীরবাবু কাল রাত্রে শুনলাম আপনি এ বাড়িতে ছিলেন না!

না।

কোথায় গিয়েছিলেন?

এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে বেলগাছিয়ায় গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরতে পারিনি। সকালে ফিরেই তো ব্যাপারটা জানতে পারলাম।

কিরীটী ঐ সময় বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় থানায় ফোন করেন!

ঠিক তখুনি ফোন করিনি, কিছুক্ষণ বাদে করি।

আচ্ছা সুবীরবাবু, শমিতা দেবীকে আপনি চিনতেন?

চিনতাম বৈকি। তিনি তো এখানে কাকার কাছে প্রায়ই সন্ধ্যায় আসতেন।

দিনের বেলায় আসতেন না?

হ্যাঁ, আসতেন।

আপনার কখনও কোন কৌতূহল হয়নি, কেন ঘন ঘন শমিতা দেবী আপনার কাকার কাছে আসতেন!

শুনেছিলাম ওঁদের ক্লাবের উনি পেট্রোন একজন। তা ছাড়া ওঁদের দীর্ঘদিনের পরিচয়।

দুজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?

সুবীর ইতস্তত: করে। কিরীটীর পার্শ্বে উপবিষ্ট যোগজীবনের দিকে তাকায়।

বলুন না! ওঁকে দেখে কোন সংকোচের আপনার কারণ নেই। যা বলতে চান বলুন।

আপনি যখন বললেন বলতে বলছি, ওঁর বন্ধু—আমার পূজনীয় কাকা, তা হলেও বলব তাঁর অল্প বয়সের স্ত্রীলোকদের ওপরে কেমন একটা দুর্বলতা ছিল, প্রশ্রয় ছিল।

আপনার চোখে কখনও কিছু পড়েছে?

না।

তবে? একথা আপনার মনে হয়েছিল কেন?

চোখে না পড়লেই কি সব কথা সব সময় অস্বীকার করতে পারি আমরা! সুবীর বললে।

তা অবিশ্যি ঠিক। তবু বুঝতেই পারছেন আমি আর একটু স্পষ্ট করে শুনতে চাই কথাটা আপনার মুখ থেকে।

সুবীর এবারে একধারে একটা বুক কেসের উপরে সাজানো ম্যাগাজিনগুলো দেখিয়ে বলে, ঐ ম্যাগাজিনগুলো একবার উল্টেপাল্টে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। সব নুড্ পিকচার্সে ভর্তি—সর্বক্ষণই ঐসব নিয়ে মশগুল থাকতেন কাকা।

কিরীটী উঠে গিয়ে সযত্নে রক্ষিত ম্যাগাজিনের থাক থেকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে সেটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিয়ে সোফায় এসে বসল।

দেখলেন?

হ্যাঁ। সব ম্যাগাজিনগুলোই অমনি জানলেন কি করে আপনি? আপনিও নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে আপনার কাকার অ্যাবসেন্সে ম্যাগাজিনগুলো উল্টেপাল্টে দেখেছেন! তাই কি?

না। ওসব নোংরা জিনিস আমি হাতে ধরি না।

ছয়

কিরীটী সুবীরের কথায় মৃদু হাসল।

আচ্ছা সুবীরবাবু, ঐ শমিতা দেবী ও তাঁর ক্লাবের ব্যাপার এবং ঐ ম্যাগাজিনগুলো ছাড়া আর কখনও কিছু আপনার কাকার ব্যাপারে চোখে পড়েছে?

কেন, ঐ যে রামদেওর যুবতী তৃতীয় পক্ষের বৌটা! সে তো সব সময়ই এ ঘরে

থাকত শুনেছি।

কিরীটী আবার মৃদু হাসল।

এসব কারণে আপনি মনে হচ্ছে আদৌ আপনার কাকার উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না!

সুবীর কিরীটীর কথার কোন জবাব দেয় না।

ভাল কথা, সুবিনয়বাবু বলছিলেন, আপনি নাকি তাঁকে বলেছিলেন আপনার কাকা উইল করেছেন?

শুনেছি।

আপনিও শুনেছেন?

হ্যাঁ, শোনা কথা আমারও।

কার কাছে শুনলেন?

রামদেওই বলেছিল।

রামদেও মানে সেই চাকরটা?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আপনার খুব কথাবার্তা হত, তাই না সুবীরবাবু?

মানে?

তার মুখ থেকেই সব খবরাখবর উপরের তলায় নিতেন আপনি!

ও ধরনের প্রবৃত্তি আমার নেই।

কিরীটী আবার মৃদু হাসল। তারপর বললে, ঠিক আছে। আপনার কাকার উপরে মনোভাবটা কেমন ছিল?

কেন, ভালই! হি্ লাইক্‌ড্ মি ভেরি মাচ।

সুবীরবাবু, এবার আর একটা প্রশ্নের আমার জবাব দিন।

বলুন?

আপনার কাকার হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ করব!

কেন রামদেওকে?

রামদেও!

হ্যাঁ, আপনিই তো একটু আগে বলছিলেন তার যুবতী স্ত্রীর প্রতি আপনার কাকার দুর্বলতা ছিল, রামদেও হয়ত সে কথা জানতে পেরে আক্রোশের বশে আপনার কাকাকে ছোরা মেরে পালিয়েছে!

বিচিত্র নয় কিছু।

বলছেন?

আপনিই তো তাই বলছেন।

আমি আপনার ওপিনিয়নটা নিচ্ছিলাম।

সুবীর যেন কেমন একটু বিব্রত বোধ করে।

অরূপ, তুমি আর ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও নাকি? কিরীটী বলে।

না আপনি যেতে পারেন। বাহাদুরকে পাঠিয়ে দিন।

বাহাদুর ঘরে এসে ঢুকল। কেঁদে কেঁদে বাহাদুরেরও চোখ দুটো ফুলে গিয়েছে।

বাহাদুর, কতদিন তুমি সাহেবের কাছে আছ? অরূপ প্রশ্ন করে।

কমসে কম দশ সাল।

কাফি বরষ?

জী সাব।

তোম বাংলা বাত সমঝতে?

জী। থোড়ী থোড়ী বলনে ভি সেকৃতা।

তোমার বাবুর কাছে এ বাড়িতে আসার পর কে কে আসত বলতে পার? অরূপই প্রশ্ন করে।

ঐ বাবুজী আসতেন, আর—

আর?

দিদিমণি আসতেন, ঐ বাবুর বহিন।

প্রায়ই আসতেন?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ থাকতেন?

তা দেড় ঘণ্টা দু' ঘণ্টা। কখনও তিন ঘণ্টাও থাকতেন।

কখন আসতেন?

রাতের বেলাতেই বেশি।

কালও এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

কখন?

রাত তখন সোয়া নটা হবে।

তুমি জানলে কি করে?

আমি রামদেওর মুখে শুনি। সে নীচে এসে আমায় বলে, আবার আজ সেই দিদিমণি এসেছে সাত রোজ বাদে।

সাত রোজ! তার আগে বুঝি আসেননি দিদিমণি?

না।

কি করে জানলে ?

রামদেওই বলেছিল, দিদিমণির সঙ্গে নাকি কি কথা-কাটাকাটি হয়েছিল খুব সাহেবের। তারপর সাত রোজ দিদিমণিও আসেননি, সাহেবও ক্লাবে যাননি।

হঠাৎ কিরীটী ঐ সময় যোগজীবনের দিকে ফিরে বললে, সান্যাল মশাই, আপনি কিছু জানেন ?

যোগজীবন মাথাটা নীচু করলেন।

অবিশ্যি আপনার বলতে আপত্তি থাকলে—

না, রায় সাহেব। একটু আগেও সুবীর যা বলছিল গগন সম্পর্কে আমিও ঐ ধরনেরই একটা রিপোর্ট পেয়েছিলাম।

কার কাছে ?

শমিতাই বলছিল।

কি বলেছিলেন তিনি ?

বিশেষ কিছু বলেনি, কেবল বলেছিল, তোমার বন্ধুটি যে দাদা এমন একটা ব্রুট, ফিল্‌দি ক্যারাকটার জানতাম না আমি।

আপনি কি বললেন ?

ইট ওয়াজ রাদার শকিং টু মি! বুঝতেই পারছেন রায় সাহেব, তবু আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যাপার কি ? কিন্তু শমি কিছু ভেঙে স্পষ্ট করে বলেনি আর।

আপনি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেননি কিছু ?

না।

কেন ?

আপনিই বলুন কেমন করে জিজ্ঞাসা করি!

আপনি আপনার বোনকে কিছু বলেননি ঐ কথাটা শোনার পর ?

হ্যাঁ, বলেছিলাম একটা কথা।

কি ?

গগনের বাসায় আর না যাওয়ার জন্য। তবে ঐ ঘটনার কিছুদিন আগে কথায় কথায় ও একদিন আমাকে বলেছিল, শীঘ্রই হয়ত ও আবার বিয়ে করতে পারে।

তাই নাকি! কাকে ?

বলেছিল সময় হলেই জানাবে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিনি কিছু আর।

তারপর বিয়ের কথায় কিছু বলেননি আপনি ?

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

কি বলেছিলেন ?

বলেছিলাম, ইফ ইউ রিয়েলি হ্যাভ সেটলড—ব্যাপারটা শেষ করে ফেল।

কি জবাব দিলেন তিনি ?

কোন জবাব দেয়নি।

তাহলে শমিতা দেবী গগনবাবুর ওপরে ঐ ধরনের remark pass করার ব্যাপারটা আর বেশী কিছু খুলে বলেননি আপনাকে স্পষ্ট করে ?

না।

কিরীটী এবার বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, বাহাদুর, রামদেওয়ের জেনানা সব সময় তোমার সাহেবের ঘরে থাকত শুনলাম, জান কিছু তুমি ?

আমিও দেখেছি বাবুজী।

আর কিছু দেখনি ?

হাসিমস্করা হত, কিন্তু ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগত না বাবুজী।

কেন ?

রামদেও ভীষণ রাগী লোক। সেরকম কিছু হলে ও সাহেবকে হয়ত খুনই করে দেবে।

আচ্ছা বাহাদুর—

জী!

তোমার সাহেবকে কে খুন করতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

কেমন করে জানব বাবুজী! একমাত্র পশুপতিনাথই জানেন।

কিরীটী এবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

জ্যাকিকে কে খাবার দিত বাহাদুর ? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

জ্যাকি সাহেব ও রামদেওর হাতে ছাড়া কারও হাতে খেত না। সাহেবকে ও বড় ভালবাসত বাবুজী, খুব চোট লেগেছে ওর দিলে।

রামদেও কতদিন ছিল তোমার সাহেবের কাছে ?

কমসে কম চোদ্দ সাল। মিলিটারিতে বরাবর সাহেবের ব্যাটম্যান ছিল শুনেছি। তারপর সাহেব যখন ছুটি নিয়ে আসেন, ওকেও ছুটি করিয়ে নিয়ে আসেন।

ঠাকুর প্রিয়লাল আর ভৃত্য রতন ওপরে আসত না ?

না বাবুজী, ওদের ওপরে আসবার কোন হুকুম ছিল না।

দাদাবাবুরা ?

দাদাবাবুরা আসত না ওপরে বড় একটা সাহেব না ডাকলে।

সাহেব ডাকতেন না ?

এক-আধদিন হয়ত ডাকতেন।

তোমার সাহেব খুব মদ খেতেন ?

হ্যাঁ। এক বোতল সাধারণতঃ দেড়দিন কি বড়জোর দু'দিনের বেশী কখনও যেত না।

যে দিদিমণি আসতেন তিনি ?

রামদেওর মুখে শুনেছি তিনিও নাকি খুব খেতেন সরাব।

আর রামদেওর স্ত্রী ?

কে, রুক্মিণী ?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ বাবুজী, ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খেত।

সুবিনয়বাবু, সুবীরবাবু ?

বলতে পারি না।

ঠিক আছে, তুমি এবারে রুক্মিণীকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও গে।

বাহাদুর চলে গেল।

অরূপ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, একটা কথা আপনাকে কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছি মিঃ রায়—

কি বল তো ?

ঐ ছোরাটার কথা—

মানে ঐ যে সাদা বাঁটের ছোরাটা যা দিয়ে গগনবাবুকে হত্যা করা হয়েছে ?

হ্যাঁ, ছোরাটা নাকি ওঁরই মানে গগনবাবুরই।

কে বললে ?

বাহাদুরই বলছিল। ছোরাটা ওঁরই শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে থাকত।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

ঐ সময় রুক্মিণী এসে ঘরে ঢুকল।

ছিপছিপে দেহের গড়ন, দেহে যৌবন যেন কানায় কানায় উপচে পড়ছে। দেহের প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি ঢেউ স্পষ্ট, মুখর। বেশভূষা আদৌ দেহাতী স্ত্রীলোকদের মত নয়, বরং অনেকটা শহরের আধুনিকাদের মত। মাথায় সামান্য ঘোমটা।

ঐ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মুখখানা। মুখখানা একটু ভোঁতা-ভোঁতা হলে কি হবে, দুটি চোখ যেন চকিতপ্রেক্ষণা। ইঙ্গিতপূর্ণ।

পাতলা দুটি ঠোঁটে ও ধারালো চিবুকে যেন একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

অরূপ জিজ্ঞাসা করে, কি নাম তোর ?

রুক্মিণী।

চাপা হাসির ঢেউটা যেন কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সারাটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আরও স্পষ্ট হল।

তোর মরদ রামদেও কোথায়?

হায় রাম! আমি কি করে জানব?

তুই জানবি না তো জানবে কে? তোরই তো জানবার কথা। তোর মরদ।

কে জানে, হয়তো বাজার গিয়েছে।

এত সকালে বাজার?

আর কোথায় যাবে তবে?

তা বাজারে গেলে এখনও ফিরছে না কেন?

আমি কি করে জানব?

জানিস না?

না।

এখানে তুই কি কাজ করিস? কি করতে হয় তোকে?

কিছুই করি না। আবার সেই চাপা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে গেল দুই ওষ্ঠে ও চিবুকে।

কিছুই করিস না?

না।

বসে থাকিস?

বসে থাকব কেন?

তবে? কাজ করিস না তো কি করিস সারাদিন? মাইনে দিত না তোকে তোর সাহেব?

মাইনে—বলতে বলতে গলার সেই চাপা হাসির ঢেউ সারা মুখে ওর ছড়িয়ে পড়ল। বললে, না, তবে সাহেব এখানে থাকতে দিত, জামাকাপড় খাওয়া দিত আর মধ্যে মধ্যে দু-চার টাকা বকশিশ দিত।

বকশিশ!

হ্যাঁ।

গয়না দিত না?

একটা হার দিয়েছে—আবার সেই চাপা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে গেল মুখে।

শুনলাম সাহেবের ঘরেই তুই সব সময় থাকতিস?

সাহেব ডাকলে আসতাম।

কখন ডাকত সাহেব? সন্ধ্যেবেলা?

হ্যাঁ, ডাকত।

রামদেও তোর মরদ জানত যে তুই সাহেবের ঘরে আসতিস ?

না।

জানত না ? সে তো পাশের ঘরেই থাকত ?

ওকে তো প্রায়ই সাহেব ঐ সময়টা এটা ওটা আনতে পাঠাতো—

আর সেই সময়ই বুঝি ডাকত তোকে তোর সাহেব ?

আবার সেই হাসির ঢেউ সারা মুখে ছড়িয়ে গেল।

সাহেব তোকে খুব পছন্দ করত বুঝি ?

বোধ হয়।

কেন, জানিস না ?

আবার সেই চাপা হাসির ঢেউ সারা মুখে ছড়িয়ে গেল।

তুই তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে তোর স্বামীকে না জানিয়ে তোর সাহেবের ঘরে আসতিস বল্ ?

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী হাতের বাহারে রেশমী চুড়িগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোর হাতের ঐ চুড়িগুলো তোকে তোর সাহেব কিনে দিয়েছিল বুঝি ?

না তো! ও তো আমার মরদ কিনে দিয়েছে।

কবে ?

এই তো সেদিন।

কাল রাত্রে বাইরের সেই দিদিমণি তোর সাহেবের কাছে এসেছিল জানিস ?

জানি তো।

কখন চলে যায় জানিস সেই দিদিমণি ?

অনেক রাতে।

কখন ?

আমি কি ঘড়ি দেখতে জানি ?

তুই তখন কোথায় ছিলি ?

আমার ঘরে।

আর রামদেও ?

সে নীচে ছিল।

নীচে ?

হ্যাঁ, ও ঐ সময়টা দারু পিত।

দারু ? কোথায় পেত দারু ?

সাহেবের আলমারি থেকে সরাত। আমিও নিয়ে দিতাম—মধ্যে মধ্যে—

সাহেব টের পেত না?

পাবে কি করে—চাবি তো ওর কাছেই থাকত দারুর আলমারির!

খুব দারু খেত বুঝি রামদেও?

মাঝে মাঝে খুব পিত। মাতোয়ালা হয়ে যেত।

কাল রাত্রে কোন গোলমাল বা চেঁচামেচি শুনেছিলি তোর সাহেবের ঘরে?

না।

কেন, তুই পাশের ঘরেই তো থাকিস?

কাল রাত্রে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অতঃপর বাকি ছিল দারোয়ান গর্জন সিং। তাকেও কিছু প্রশ্ন করে ওদের তখনকার মত কাজ শেষ হল।

সাত

মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে কিরীটীর নির্দেশমত সুবীর সুবিনয় বাহাদুর প্রিয়লাল ও অন্যান্য ভৃত্যদের আপাততঃ পুলিসের বিনানুমতিতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যেতে বলে বাড়িটা পুলিস পাহারায় রেখে অরূপ ও অন্যান্য সবাই বাড়ি থেকে বের হয়ে এল।

কিরীটী আর যোগজীবন পাশাপাশি হাঁটছিল।

সান্যাল মশাই!

বলুন।

শমিতা দেবীকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, অবিশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

আপত্তি হবে কেন? বলব শমিকে—

আমি বিকেলের দিকে যাব আপনার ওখানেই—উনি যদি সে সময় থাকেন।

বলে দেব থাকতে ঐ সময়।

যোগজীবনকে কিরীটীর মনে হল যেন বেশ কেমন একটু অন্যমনস্ক।

তাহলে এবারে আমি চলি—বলে কিরীটী উল্টো দিকে পা বাড়াতেই যোগজীবন ডাকেন, রায় সাহেব!

কিরীটী ঘুরে দাঁড়াল, কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ—একটা কথা।

বলুন।

আচ্ছা আপনি কি গগনের হত্যার ব্যাপারে আমার বোন শমিকে কোন রকম সন্দেহ করছেন?

দেখুন সান্যাল মশাই, ওকে আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত—তবে আপনাদের সকলের মুখ থেকে যেটুকু জানতে পারলাম তাতে করে—

কি রায় সাহেব ?

তার চরিত্রে কিছুটা স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আছেই।

না না—সে রকম যা আপনি ভাবছেন তেমন কিছু নয়। ক্লাব নিয়ে হৈ চৈ করে, একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করে ঠিকই, কিন্তু সে সত্যিই সেরকম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বলতে যা বোঝায় সে ধরনের মেয়ে নয়। তাছাড়া আজকালকার দিনে ওরকম তো প্রায়ই দেখা যায় বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

আপনি কিছু ভাববেন না সান্যাল মশাই—সত্যিই গতরাত্রের ব্যাপারের সঙ্গে যদি তার কোন সম্পর্ক না থাকে তো কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর একটা কথা—

কি ?

আপনি যদি চান তো আমি আপনার বন্ধুর হত্যার ব্যাপার থেকে একেবারে সরে দাঁড়াতে পারি।

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই। দৈবক্রমে ঘটনাচক্রে যখন আপনি ব্যাপারটার মধ্যে গিয়েই পড়েছেন, আপনার করণীয় অবশ্যই আপনি করবেন।

আমিও ঐ উত্তরটাই আপনার কাছে আশা করেছিলাম সান্যাল মশাই।

সত্য আর গরলকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না চিরদিন, একদিন না-একদিন সে প্রকাশ পড়েই—তাছাড়া শমিতা যেমন আমার সহোদরা বোন তেমনি গগনও ছিল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমার—হ্যাঁ, আমারও কিছু দোষ আছে বৈকি। গগন আর শমিতা সম্পর্কে আমার কানে ইদানীং কিছুদিন ধরে অনেক কথাই আসছিল, কিন্তু তবু আমি সতর্ক হইনি।

হওয়া বোধ হয় উচিত ছিল আপনার সান্যাল মশাই।

এখন বুঝতে পারছি উচিত ছিল। তবে বিশ্বাস করুন রায় সাহেব, এতটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

এবারে বাড়ি যান সান্যাল মশাই।

যোগজীবন বিদায় নিয়ে গৃহের দিকে চলা শুরু করলেন।

কিরীটীও তার গৃহের দিকে পা বাড়াল।

বেলা দশটা প্রায় হয়ে গিয়েছিল সেদিন কিরীটীর গৃহে ফিরতে। কৃষ্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর-বার করছিল—সুব্রতকেও ফোন করে আনিয়েছিল।

কিরীটী এসে যখন গৃহে প্রবেশ করল, জংলী তখন আবার কিরীটীর সন্ধানে চতুর্থবার

লেকের দিকে যাচ্ছিল। কিরীটীকে দেখে সে দাঁড়াল, বাবুজী কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?

কেন রে ?

মাইজী খুব ব্যস্ত হয়েছে—যাও। উপরে যাও।

দেড়তলার বসবার ঘরে ঢুকতেই সুব্রত বলে ওঠে, কি রে, কোথায় গিয়েছিলি ?

কেন ?

কেন মানে ? সেই সকাল সাড়ে তিনটেয় লেকে বেড়াতে গিয়ে আর পাত্তা নেই ?

কৃষ্ণা বলে, সত্যি—আশ্চর্য মানুষ তুমি !

কিরীটী সোফার উপর বসতে বসতে বললে মৃদু হেসে, হারিয়ে যাব না সে তো জানতেই প্রিয়ে—আর সেরকম কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটলেই আগে সে সংবাদ পেতে।

থাক। আর বাহাদুরিতে প্রয়োজন নেই। তা চা খেয়েছ, না তাও পেটে পড়েনি এখনও ?

পড়েছিল সেই ঘণ্টা তিনেক আগে এক কাপ, তাও সম্পূর্ণ নয়। এক কাপ পেলে মন্দ হত না।

কৃষ্ণা উঠে গেল।

সুব্রত আবার জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

আর বলিস কেন। গিয়েছিলাম অবিশ্যি একটি রেয়ার ফুল দেখতে—অবশেষে জড়িয়ে পড়লাম এক খুনের ব্যাপারে।

খুন ! কোথায় ? কে ?

ধীরে বন্ধু ধীরে। তারপর একটু থেমে কিরীটী বলে, নিহত হয়েছেন এক এক্স আর্মি কর্নেল। মৃত্যুর কারণ ছুরিকাঘাত—স্থান অনতিদূরে, সার্দান অ্যাভিন্যুতে।

তা তুই তো গিয়েছিলি লেকে বেড়াতে—

বললাম যে বেড়ানো শেষ হবার পর গিয়েছিলাম সান্যাল মশাইয়ের গৃহে একটা রেয়ার ফুল দেখতে।

সান্যাল মশাই কে ?

লেকের ভ্রমণবন্ধু—এক প্রৌঢ় রিটায়ার্ড ভদ্রলোক এবং যিনি নিহত হয়েছেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তারপর ?

সান্যাল মশাইয়ের ওখানে ফোন এল বন্ধুটি তাঁর নিহত। তখন তিনি—মানে তাঁরই অনুরোধে তাঁর সঙ্গে যাই।

চায়ের কাপ হাতে কৃষ্ণা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, তা সেখান থেকে একটা ফোন করে দিতে কি হয়েছিল ?

ক্ষমা করো দেবী—মনে পড়েনি।

তা মনে পড়বে কেন? খুনখারাপির গন্ধ পেলে কি আর কিছু মনে থাকে?

কিরীটী কৃষ্ণার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে কাপে চুমুক দিতে দিতে মৃদু মৃদু হাসে।

শোন, বস—খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

থাক তোমার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, আমার শোনার প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণা বলে।

প্রসীদ দেবী! তুমি মুখ ভার করলে এ অভাজনকে নিজগৃহেই যে পরবাসী হতে হবে। ঘটনাটা সত্যিই রোমাঞ্চকর। শোনই না।

না—ও শোনায় আমার কোন লোভ নেই।

বল কি? আমাকে যারা ভালবাসে তারা শুনলে যে তোমায় ধিক্কার দেবে। কিরীটী-কাহিনী শুনতে চায় না এমন মতিচ্ছন্ন যার হয়েছে তাকে—

সেই তো একঘেয়ে ব্যাপার। হয় টাকাপয়সা—না হয় প্রতিহিংসা—না হয় কোন এক স্ত্রীলোকের বা পুরুষের প্রেমের জ্বালা। বিয়ে হওয়া অবধি তোমার মুখে ঐসব শুনতে শুনতে—

থাক্ গিয়ে। তা ও ছাড়া আর ক্রাইম জগতে কি আছে বল? পাপিষ্ঠ-পাপিষ্ঠার দল ঐ পাকচক্রেই ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে যে অহরহ।

সুব্রত হাসছিল। এবারে বললে, নে, বল্ শুনি তোর এক্স আর্মি অফিসারের নিধন ব্যাপারটা।

তুইও সুব্রত—দাউ টু ব্রুটাস্! তুইও ব্যাপারটাকে লাইট করে নিচ্ছিস?

কিন্তু ব্যাপারটা বলবি তো?

কিরীটী অতঃপর সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করে যায়।

সব শুনে সুব্রত বলে, এ তো মনে হচ্ছে—

কি, বল্?

বিকৃত এক লালসার পরিণতি।

আমারও যেন মনে হচ্ছে তাই। কারণ লালসা বস্তুটা মানুষের অন্যতম রিপু হিসাবে—অর্থাৎ নারী-পুরুষের চরিত্রের অচ্ছেদ্য এক ধর্ম, ওটা বাদ দিয়ে মানুষ যেমন কোন যুগেই চলতে পারেনি এযুগেও পারবে না, এবং ভবিষ্যতেও বোধ হয় কখনও পারবেও না।

কথাটা শেষ করল সুব্রত, তাই খুনখারাপি হবেই। কিন্তু গগনবিহারীর অমন মতিচ্ছন্ন হল কেন?

আরে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দলই তো ঐ ধরনের বিকৃত লালসার বড় ভিকটিম হয়।

কিন্তু একটা ব্যাপার কেমন যেন আমার খটকা লাগছে কিরীটী। সুব্রত বললে।

ঐ অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা তো?

হ্যাঁ। হত্যাকারী কুকুরটাকে ম্যানেজ করল কি করে ?

সে আর এমন দুরূহ ব্যাপার কি ! আগে থেকেই হয়ত কুকুরটাকে সরিয়ে ফেলেছিল কৌশলে। তবে এও ঠিক, শেষ পর্যন্ত হয়ত ঐ কুকুরটাই হবে তার মৃত্যুবাণ। ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস—বলতে বলতে উঠে গিয়ে কিরীটী অরূপকে ফোনে ডাকল।

বালীগঞ্জ থানার ও. সি. কথা বলছি—সাড়া এল অপর প্রান্ত থেকে।

অরূপ—আমি কিরীটী। একটা কথা তখন তোমাকে তাড়াতাড়ি বলতে ভুলে গিয়েছি—

কি কথা ?

একজন ভেটারিনারী সার্জেনকে দিয়ে কুকুরটাকে একবার পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে পার ?

কেন পারব না ? অরূপ বললে।

হ্যাঁ দেখাও, আমার মনে হয় কুকুরটাকে খাবারের সঙ্গে কোন তীব্র ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আর একটা কথা, কুকুরটার উপরে যেন কন্‌স্টাণ্ট ওয়াচ রাখা হয়।

অরূপকে নির্দেশ দিয়ে কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

সারাটা দুপুর কিরীটী কোথাও বের হল না। নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে অ্যালসেসিয়ান কুকুর সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞের বই নিয়ে তারই মধ্যে ডুবে রইল।

বিকেলের দিকে যোগজীবনের ওখানে যাবে বলেছিল কিন্তু বেরুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সুব্রতকে কিরীটী বলে দিয়েছিল বিকেলে তার ওখানে চলে আসতে। দুজনে একসঙ্গে যোগজীবনের ওখানে যাবে।

সুব্রত যথাসময়েই এসে হাজির হয়েছিল।

কিন্তু সুব্রত এসে দেখল কিরীটী কি একটা বই নিয়ে তার মধ্যে ডুবে আছে, কাজেই তাকে আর বিরক্ত করেনি।

বইটা শেষ করে কিরীটী যখন উঠে দাঁড়াল বেলা তখন গড়িয়ে গিয়েছে—বাইরের আলো ম্লান হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামছে ধীরে ধীরে।

কি রে, বেরুবি না ? সুব্রত শুধাল।

হ্যাঁ, চল্।

সুব্রত তার গাড়ি এনেছিল। সেই গাড়িতেই চেপে দুজনে যোগজীবনের গৃহের দিকে রওনা হল।

গাড়িতে উঠে কিরীটী বললে, চল্ একবার থানায় ঘুরে যাই। রামদেওর কোন পাত্তা পাওয়া গেল কিনা জেনে যাই। আর অরূপ যদি থাকে তো তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

থানার সামনে এসে ওদের গাড়ি যখন থামল সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তখন। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। অরূপ থানাতেই ছিল।

অরূপের অফিস-ঘরে ঢুকে কিরীটী জিজ্ঞাসা করল, রামদেওর কোন খবর পেলে অরূপ ?

না।

খবরটা যে চাই।

প্রতাপগড়ে ওর দেশে খোঁজ নেবার জন্য ইউ. পি-র ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ফোন করে দিয়েছি। বেটার একটা ফটো পেলে সুবিধা হত।

রুক্মিণীর কাছে খোঁজ করে দেখো—পেতে পার।

দেখি, কাল একবার যাব। হ্যাঁ ভাল কথা, সুবীর চৌধুরী ফোন করেছিল।

কেন ?

সে বাইরে বেরুতে চায়। আমি বলে দিয়েছি আপাততঃ চার-পাঁচ দিন ঐ বাড়ির বাইরে কোথাও তার যাওয়া চলবে না।

তারপর ?

চেঁচামেচি করেছিল ফোনে। আমরা কি তাকেই গগনবিহারীর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছি নাকি ইত্যাদি।

কিরীটী মৃদু হাসে।

আমার কিন্তু মনে হয় মিঃ রায়—অরূপ বলে।

কি ?

ঐ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সুবীর চৌধুরী জড়িয়ে আছে।

কেন ?

আমার মনে হয় ঐ বরযাত্রী যাওয়ার ব্যাপারটা একটা তার অ্যালিবি মাত্র।

হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু হত্যা সে করবে কেন তার কাকাকে ? কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

কি আবার, গগনবিহারীর সমস্ত সম্পত্তির সেই-ই তো প্রকৃতপক্ষে লিগ্যাল উত্তরাধিকারী।

তা তো নাও হতে পারে অরূপ।

কিন্তু—

কিরীটী বলে, এমনও তো হতে পারে গগনবিহারী উইলে তাকে কিছুই দিয়ে যাননি। না অরূপ, গগনবিহারীর হত্যার সঙ্গে আর যাই থাক অর্থের কোন সম্পর্ক আছে বলে আপাততঃ আমার মনে হচ্ছে না।

তবে কি—

অবিশ্যি আমি নিজেও এখনো কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি। তবে আমার

মনে হয়, গগনবিহারীর হত্যার মূলে আছে অন্য কিছু—অর্থ নয়।

আপনি কি বলতে চান মিঃ রায় !

ঐ হত্যাকাণ্ডের আশেপাশে যারা ছিল—তাদের মধ্যে ভেবে দেখছ কি শমিতা আর রুক্মিণী যে দুটি মেয়ে গগনবিহারীর জীবনে এসেছিল—মনে করে দেখ তাদের দুজনেরই রূপ ও যৌবনের কথা। গগনবিহারী দুজনের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল।

তাহলে ?

সে-সব পরে বিচার করা যাবে। আপাততঃ তোমার হাতে যদি কোন জরুরী কাজ না থাকে তো চল, এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় ?

যোগজীবনবাবুর ওখানে।

সেখানে কেন ?

শমিতা দেবীর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি, চল না।

বেশ তো, চলুন।

অরূপ উঠে পড়ল।

আট

যোগজীবনবাবু তাঁর বাইরের ঘরেই বসেছিলেন একাকী।

কিরীটী আসবে বলেছিল তাই আর তিনি বেরোননি ঐ দিন বিকালে। কিরীটীরা যখন এসে পৌঁছল তখন সাতটা বেজে গিয়েছে।

আসুন রায় সাহেব। দেরী হল যে ? আপনি—

কথাটা যোগজীবন আর শেষ করেন না। কিরীটীর সঙ্গে সুব্রত আর থানা-অফিসার অরূপ মুখার্জীকে দেখে থেমে গেলেন।

কিরীটী বসতে বসতে বললে, অরূপকে সঙ্গেই নিয়ে এলাম সান্যাল মশাই, আইন মেনে চলাই ভাল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন যোগজীবন কিরীটীর মুখের দিকে।

বুঝতেই তো পারছেন, ব্যাপারটা খুব delicate হলেও শমিতা দেবীর সঙ্গে যখন গগনবাবুর পরিচয় ছিল এবং তাঁর গগনবাবুর গৃহে যাতায়াত ছিল, পুলিস তাঁকে নিয়েও টানাটানি করতে ছাড়বে না। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা যদি একটা ঘরোয়া পরিবেশে শেষ করে ফেলা যায় সব দিক দিয়েই ভাল হয়।

যোগজীবন কোন জবাব দেন না।

তাঁর সমস্ত মুখে যেন একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

কিরীটী বললে, তাই অরূপকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম।

উনিও—মানে মিঃ মুখার্জীও কি শমিকে প্রশ্ন করতে চান? যোগজীবন ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করেন।

না, না—উনি কেবল উপস্থিত থাকবেন। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আপনার ভগ্নী বাড়িতেই আছেন তো?

আছে।

গগনবাবুর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছে।

কে বলল? আপনি?

না—আমি বলিনি।

তবে?

সুবীর তাকে ফোনে জানিয়েছে।

কিরীটী যেন একটু চমকেই ওঠে কথাটা শুনে। বলে, কে? সুবীরবাবু?

হ্যাঁ।

কখন ফোন করেছিলেন তিনি?

সকালেই।

সকালে? কখন?

আমি ফোন পেয়ে চলে যাবার পরই।

কিরীটী যেন একটু অন্যমনস্ক। মনে হয় যেন কি ভাবছে সে। কিরীটী যোগজীবনের কথার পর আর কোন কথা বলে না।

একটু পরে আবার বলে, তাহলে চলুন, ওঠা যাক।

অ্যাঁ—হ্যাঁ, চলুন।

দোতলায় উঠে যোগজীবন তাঁর শয়নঘরে ওদের বসিয়ে শমিতার ঘরের দিকে পা বাড়ান।

বাড়িটা বেশ বড়। দোতলায় পাঁচটি ঘর, তিনতলায় তিনটি ঘর।

তিনতলাতেই একটি ঘর নিয়ে শমিতা থাকে।

একতলাটা ভাড়া দেওয়া একটি ঘর ছাড়া।

শমিতার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন যোগজীবন। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। একটু ইতস্ততঃ করলেন যোগজীবন, তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, শমি!

কোন সাড়া এল না।

আবার ডাকলেন একটু উঁচু গলাতেই, শমি ?

কে, দাদা ? সাড়া এল এবার অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে।

হ্যাঁ।

এস।

যোগজীবন অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, আলো জ্বালাসনি কেন ?

খট্ করে একটা শব্দ হল। ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল পরমুহূর্তেই। যোগজীবন দেখলেন শমিতা একটা আরাম-কেদারার উপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে।

সব সময়ই যে বেশভূষা ও প্রসাধন ছাড়া থাকে না তার আজ কোন বেশভূষা ও প্রসাধন নেই। পরনে সাধারণ একটা তাঁতের রঙিন শাড়ি। গেরুয়া রংয়ের হাতকাটা একটা ব্লাউজ গায়ে। মাথার চুল রুক্ষ, চিরুনি পড়েছে বলে মনে হয় না।

চোখেমুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। চোখ দুটো যেন ঈষৎ রক্তিম।

সামনে ছোট একটা ত্রিপয়ের উপরে কাঁচের গ্লাসে রক্তিম তরল পদার্থ। গ্লাসটার প্রতি নজর পড়তেই যেন যোগজীবন একটু থমকে গেলেন। গ্লাসের রক্তিম তরল বস্তুটি যে কী যোগজীবনের বুঝতে কষ্ট হয় না।

শমিতা ড্রিঙ্ক করে জানতেন তিনি, কিন্তু সে সব কিছুই ক্লাবে। ঘরে বসেও যে শমিতা ড্রিঙ্ক করতে পারে এটা যেন ধারণার অতীত ছিল যোগজীবনের কাছে।

হঠাৎ যেন একটা ক্রোধের উদ্রেক হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন যোগজীবন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, রায় সাহেব এসেছেন, আমার ঘরে বসে আছেন—তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোগজীবনের কণ্ঠস্বরটা যেন একটু রূঢ়ই শোনাল।

কি দরকার আমার সঙ্গে তাঁর ? শমিতা একটু যেন রুক্ষ স্বরেই প্রশ্নটা করল।

জানি না। তোমাকে তো সকালেই বলেছিলাম, তিনি আসবেন আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বাট্ আই ডোন্ট্ লাইক টু মীট এনিবডি অ্যাট দিস্ মোমেন্ট।

শোন, শুধু রায় সাহেবই নন—থানা-অফিসারও এসেছেন।

বাট্ হোয়াই ? কি চান তাঁরা আমার কাছে ?

চেঁচিও না, শোন ওঁরা জানতে পেরেছেন গগনের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল—

হোয়াটস্ টু দ্যাট—পরিচয় ছিল তাতে হয়েছে কি ?

তাছাড়া কাল রাত্রে তুমি ওখানে গিয়েছিলে—

ইটস্ এ ড্যাম লাই—মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা !

নিশ্চয়ই। গত সাতদিন ধরে তার বাড়ির ছায়াও মাড়াইনি আমি। একটা ডার্টি—ফিলদি স্কাউনড্রেল!

বিষ যেন উদ্গারিত হল শমিতার কণ্ঠ থেকে।

সত্যি—সত্যি শমি—তুই কাল গগনের বাড়িতে যাসনি?

সিওরলি নট।

তবে যে গগনের বাড়ির লোকেরা কেউ কেউ বললে, তোকে তারা যেতে দেখেছে গত রাত্রে গগনের ঘরে?

কে—কে বলেছে?

বললাম তো গগনের বাড়ির লোকেরা বলেছে।

মিথ্যে কথা। কাল আমি রাত আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। এভরিবডি নোজ্ দ্যাট—সবাই সেখানে তার সাক্ষী আছে।

কিন্তু—

ব্যাপার কি বল তো দাদা? তুমি কি বিশ্বাস করছ না আমার কথাটা?

শমিতা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

না, মানে—

ঠিক আছে, চল, তোমার থানার ও. সি. কি বলতে চায় শুনে আসি। আর তোমার রায় সাহেবেরই বা কি বলবার আছে শুনি।

চল্।

ভাই-বোনে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

পাশের ঘরে ঢুকে যোগজীবন বললেন, রায় সাহেব, এই আমার বোন শমিতা।

কিরীটী চোখ তুলে তাকাল, নমস্কার মিস সান্যাল। বসুন।

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন? শমিতা প্রশ্নটা করে বসল না। দাঁড়িয়েই রইল।

কিরীটী আবার বললে, বসুন।

না—বসলে হবে না। কি আপনি জানতে চান বলুন আমার কাছে!

রায় সাহেব—

যোগজীবনের কণ্ঠস্বরে কিরীটী তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। যোগজীবন বললেন, শমিতা বলছে কাল রাত্রে ও আদৌ ওখানে নাকি যায়ইনি।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শমিতাকে দেখছিল, যোগজীবনের কথায় ফিরে তাকাল না। কেবল প্রশ্ন করল, আপনি বলছেন কাল রাত্রে গগনবাবুর বাড়িতে যাননি?

না।

কিন্তু—

কি?

রামদেও আর সুবিনয়বাবুরা আপনাকে দেখেছে। কেবল তাই নয় রুক্মিণী আপনার গলা শুনেছে গগনবাবুর শোবার ঘরে। কিরীটী বললে।

রামদেও বলেছে? সুবিনয় বলেছেন তিনি আমাকে দেখেছেন কাল রাত্রে সেখানে?

সেই কথাই তো তারা তাদের জবানবন্দিতে বলেছে।

ইটস্ এ ড্যাম লাই। ডাকুন তো তাদের, আমি জিজ্ঞাসা করছি কখন তারা আমাকে দেখেছে?

নিশ্চয়ই—জিজ্ঞাসা করা হবে বৈকি। কিন্তু আপনি যে সত্যি সত্যিই কাল রাত্রে সেখানে যাননি তার কোন প্রমাণ আছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

নিশ্চয়ই।

কি প্রমাণ? কিরীটী শমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার প্রশ্ন করে।

কাল রাত্রে ক্লাবে আমাদের যারা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন কথাটা আমার সত্যি না মিথ্যে।

আপনি তাহলে বলছেন কাল রাত্রে ক্লাবেই ছিলেন? কিরীটীর গলার স্বর যেন অতিরিক্ত শান্ত—ঠাণ্ডা।

হ্যাঁ।

কখন ক্লাবে গিয়েছিলেন আর কতক্ষণই বা কাল রাত্রে সেখানে ছিলেন, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার?

নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি। আটটায় গিয়েছিলাম, রাত সাড়ে এগারোটায় ফিরে আসি।

বাড়িতে?

না।

তবে কোথায়?

সে কথা জানবার আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে, মিঃ রায়?

নচেৎ কথাটা আপনাকে আমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতাম না।

অ্যাম স্যরি মিঃ রায়, আপনার ঐ প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারছি না। দুঃখিত। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

গগনবিহারীবাবুর সঙ্গে আপনার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই নয় কি?

আলাপ-পরিচয় ছিল। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই দাদার বন্ধু হিসাবে তিনি আমাদের পরিচিত ছিলেন।

গগনবাবু আপনাদের ক্লাব মরালী সঙ্ঘের অন্যতম পেট্রোন ছিলেন, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ।

আপনি প্রায়ই তাঁর ওখানে যেতেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকতেন—কথাটা কি সত্যি ?

একসময় যেতাম, তবে ইদানীং যেতাম না। গত সাত-আটদিন একবারও যাইনি।

কেন ? ঝগড়া হয়েছিল কি ?

শমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, হ্যাঁ।

কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল ?

শমিতা যেন আবার মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর বললে, ক্লাবেরই কোন ব্যাপারে মতান্তর হয়েছিল।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, কিন্তু আমি যদি বলি মিস সান্যাল, আপনি সত্যি বলছেন না ?

হোয়াট্ ডু ইউ মীন্! রুক্ষ ও কঠিন শোনাল শমিতার কণ্ঠস্বর।

কথাটা আমার অস্পষ্ট নয়, আর দু'রকম অর্থও তার হয় না এবং আপনিও যে সেটা বুঝতে পারেননি তাও নয়। কিরীটীর গলার স্বরটা শান্ত কিন্তু কঠিন।

শমিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটীও কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকে শমিতার মুখের দিকে। তারপর বলে, আপনার বাঁ হাতের কব্জিতে একটা দেখছি প্লাস্টার লাগানো আছে। কি হয়েছে ওখানে মিস সান্যাল ? কেটে গিয়েছিল বোধহয় ?

কিরীটীর কথায় শমিতা যেন হঠাৎ কেমন একটু হকচকিয়ে যায়, মনে হল কিরীটীর। সঙ্গে সঙ্গে যেন তার প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারল না শমিতা।

একটু যেন বিব্রত—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য—পরক্ষণেই বলে, হ্যাঁ, সামান্য একটু কেটে গিয়েছিল, তাই একটু প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বলতে বলতে শমিতা যেন কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে হাতটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

কি করে কাটল ? কবে কাটল ?

ঠিক মনে নেই, পরশু-তরশু হবে।

আপনার হাতে সরু একজোড়া সোনার রুলি দেখছি। ঐ সোনার রুলি ছাড়া আর কিছু বোধ হয় আপনি কখনও হাতে পরেন না ?

না।

মিস সান্যাল, আপনি সুবীরবাবু ও সুবিনয়বাবুকে নিশ্চয়ই চেনেন, গগনবাবুর বাড়িতে যখন আপনার যাতায়াত ছিল ? কিরীটী প্রশ্নটা করে আবার তাকাল শমিতার মুখের দিকে।

সুবীরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সামান্যই আমার। শমিতা বললে।

সুবিনয়বাবুর সঙ্গে হয়নি? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না।

গগনবাবুর একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে আপনি জানেন নিশ্চয়ই?

জানি। জ্যাকি।

মধ্যে মধ্যে তাকে আপনি এটা-ওটা খেতে দিতেন!

না। আই হেট ডগ্‌স্‌।

গগনবাবু সেটা জানতেন?

তা জানতেন বৈকি। কিন্তু আপনার যা জিজ্ঞাসা করবার শেষ হয়েছে কি? মে আই লিফ দিস্‌ রুম? শরীরটা আমার ভাল নেই।

নিশ্চয়ই। আপনাকে এখুনি আমি ছেড়ে দোব। আর একটা প্রশ্নের জবাব দিলেই—

বলুন? কি প্রশ্ন আপনার?

আপনার সঙ্গে গগনবাবুর বিয়ে প্রায় সেট্‌ল্‌ হয়ে গিয়েছিল মিস্‌ সান্যাল, তাই নয় কি?

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক ও সকলের সেখানে যারা উপস্থিত তাদের চিন্তারও বাইরে ছিল যেন। সকলেই যেন শমিতার মুখের দিকে তাকায়।

বিশেষ করে যোগজীবনবাবু যেন বোবা। কিছুটা বিহ্বলও।

শমিতাও যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে যায়। তার মুখ থেকেও কোন শব্দ নির্গত হয় না। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্‌ করে।

কিন্তু হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেঙে খিলখিল করে হেসে ওঠে শমিতা। তারপর বলে, সত্যিই মিঃ রায়, আই মাস্ট অ্যাড্‌মিট আপনার কল্পনা-শক্তি আছে। একটা ওল্ড ভাল-চার! তার সঙ্গে বিয়ে?

হয়নি সেরকম কোন কথা তাহলে কখনও আপনাদের মধ্যে—মানে এনি আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং?

না মশাই—আমার তো কিছু মাথার গোলমাল হয়নি!

তাহলে—

কি তাহলে?

তাঁর সমস্ত কিছু আপনার নামে লিখে দিয়ে গেলেন কেন?

আমার নামে দিয়েছেন?

কেন, জানেন না আপনি কথাটা বলতে চান?

শমিতা হঠাৎ যেন আবার চুপ করে গেল। থমকে গিয়েছে যেন শমিতা।

কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তখনও শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে, শান্ত গলায় সে বলতে

থাকে, নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছিল বলেই আপনাকে তিনি তাঁর সব কিছু উইল করে দিয়েছেন।

থামুন থামুন—হঠাৎ যেন চিৎকার করে উঠল শমিতা। তারপরে ঝড়ের মতই যেন ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ওদের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন একটা হিমশীতল স্তব্ধতা নেমে এল। সবাই নিশ্চুপ—একেবারে যেন পাথর।

যোগজীবনবাবুর মুখখানা যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

কিরীটী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যোগজীবনবাবু, আজ যাই!

অ্যাঁ। চমকে উঠলেন যেন যোগজীবন।

আমরা যাই!

যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। চল অরূপ, চল সুব্রত।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল, আর যোগজীবন তখনও পাথরের মত বসে রইলেন।

নয়

রাত্রি তখন প্রায় সোয়া নটা হবেই।

কিরীটী অরূপ সুব্রত সুব্রতর গাড়িতেই চলেছিল থানায় অরূপকে নামিয়ে দেবার জন্য।

শমিতা কিরীটীর বিস্ময়কর উক্তির পর সহসা ঘর ছেড়ে ঝড়ের মত বের হয়ে যাবার পর সকলের মধ্যেই যে স্তব্ধতা নেমে এসেছিল, চলমান গাড়ির মধ্যেও সেই স্তব্ধতাই যেন সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অরূপই প্রথমে কথা বলল, মিঃ রায়, গগনবিহারী যে তাঁর উইলে শমিতাকেই সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন আপনি জানতে পারলেন কখন?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, জানতে তো এখনও আমি পারিনি!

তবে যে আপনি বললেন?

সম্পূর্ণ অনুমানের ওপরে নির্ভর করে অন্ধকারে একটা ঢিল নিক্ষেপ করেছিলাম মাত্র।

তবে কথাটা সত্যি নয়! অরূপের কণ্ঠে রীতিমত বিস্ময় যেন প্রকাশ পায়।

সত্যও হতে পারে—মিথ্যাও হতে পারে। অবশ্য সত্যি সত্যিই যদি তিনি উইল করে থাকেন। তবে আমার ধারণা—

কি?

আমার অনুমানটা হয়ত মিথ্যে নয়, নচেৎ ঐভাবে হঠাৎ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে মিস সান্যাল ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন না। শুধু তাই নয়, আরও আমার ধারণা, ওদের

পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিবাহের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

বলেন কি! অরূপ বললে, শমিতা সান্যালের মত একটি মেয়ে গগনবিহারীর মত এক বৃদ্ধকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন? এ যে আমি ভাবতেও পারছি না মিঃ রায়!

ভাবতে তো আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনেক কিছুই পারি না অরূপ। তবে অনেক কিছুই ঘটে এ সংসারে, আর ঘটছেও। তাই নয় কি?

কিন্তু—

সামান্য পরিচয়ে মিস সান্যালকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, ওঁরা হচ্ছেন সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক যাঁরা খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলভাবে স্বাধীনচেতা এবং যাঁদের কাছে নিরঙ্কুশভাবে জীবনটা ভোগ করাই একমাত্র লক্ষ্য। এবং তার জন্য তাঁরা অনেক কিছুই হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারেন। হয়ত বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে ঐখানেই মিস সান্যালের সংঘাত বেধেছিল—যার ফলে ডিভোর্স।

শমিতার শুনেছি যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁর অবস্থাও ভাল, বড় চাকরিও করেন, তাই হয়ত জীবনটাকে পুরোপুরি ভোগ করার জন্য সব চাইতে যে বস্তুটির বেশী প্রয়োজন—অর্থ—তার অভাব ছিল না। এবং শমিতার স্বামীর হয়ত আবার সেটা পছন্দ ছিল না। ফলে যা অবশ্যম্ভাবী ঐ ধরনের স্ত্রীলোকের পক্ষে—তাই হয়ে গেল।

সুব্রত ঐ সময় বলে, তোর বন্ধু যোগজীবনবাবুর অবস্থাও তো খারাপ বলে মনে হল না।

যোগজীবনবাবু! কিরীটী বললে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং সঞ্চয়ী ছিলেন। তাই হয়ত ঐ বাড়িটা করতে পেরেছেন। কিন্তু আজ তাঁর অবসর জীবন। শমিতা যে অর্থের সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষী সেরকম সচ্ছলতা যোগজীবনবাবুর কোথায়! থাকা সম্ভবও নয়।

শমিতা দেবীও তো চাকরি করেন।

তা করেন কিন্তু সেটা একান্ত দায়ে পড়েই। ভাইয়ের কাছ থেকে সেরকম অর্থ পাওয়া যাবে না বলেই। এবং তাই বা তার প্রয়োজনের পক্ষে কতটুকু? সেদিক দিয়ে ভেবে দেখ, গগনবিহারীর স্কন্ধারূঢ় হতে পারলে কত সুবিধা! সামান্য একটু যৌবনের ছলাকলা দিয়েই তাই হয়ত শমিতা প্রৌঢ় কামুক গগনবিহারীকে ধরাশায়ী করেছিল। অবিশ্যি গগনবিহারীকে করায়ত্ত করার আরও কারণ ছিল আমার মনে হয়।

কি? অরূপ প্রশ্ন করে।

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব তো হবেই না, ঐ সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশভাবে যে জীবনের সঙ্গে সে অভ্যস্ত সে জীবনও সে নিশ্চিন্তে চালিয়ে যেতে পারবে। ভোগের জীবনে এক-টানা ভেসে চলতে পারবে। কিন্তু ঐখানেই শমিতা ভুল করেছিল।

ভুল?

হ্যাঁ—গগনবিহারীর চরিত্রের সে সম্যক পরিচয় পাইনি। তার দিকে তার যে হাত

প্রসারিত হয়েছিল অনুরূপ ঘটনা ঘটলে যে সেই হাত দুটি আবার অন্যত্রও প্রসারিত হতে পারে সেটাই বুঝতে হয়ত পারেনি শমিতা। আর খটকা লাগছে আমার ঐখানেই।

খটকা?

হ্যাঁ, শমিতার মত মেয়ের সে কথাটা তো না বোঝার কথা নয়। তবে সে গোড়া থেকেই সতর্ক হল না কেন? কিংবা হয়ত এও হতে পারে, তার নিজের উপরে আত্মবিশ্বাসই তাকে শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হেনেছে।

বুঝলে অরূপ, কিরীটী একটু থেমে বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। এবং যেন, ঐ জটিলতার গিঁট খুলতে পারলেই তোমার কাছে বর্তমান হত্যারহস্যের সবটুকুই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিছুই আর ঝাপসা অস্পষ্ট থাকবে না, রহস্যাবৃতও মনে হবে না।

গাড়ি ইতিমধ্যে থানার কাছে এসে থেমে গিয়েছিল।

ওরা গাড়ির মধ্যে বসে কথা বলছিল।

আপনি কি বুঝতে পেরেছেন মিঃ রায়, গগনবিহারীর হত্যাকারী কে? হঠাৎ ঐ সময় প্রশ্ন করে অরূপ।

অনুমান করতে পেরেছি বৈকি কিছুটা।

তবে কি শমিতা দেবীই?

এটা সর্বৈব মিথ্যে নয় যে কোন কিছুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীই যেন কিছুটা হিংস্র হয়ে ওঠে ঠিকই এবং কাউকে হত্যা করতে হলে বিকৃত একটা মনোবলের প্রয়োজনও হয়। কিন্তু বর্তমান হত্যার ব্যাপারটা—অর্থাৎ যেভাবে নিহত হয়েছেন গগনবিহারী—সেটার কথা ভুললে তো তোমার চলবে না অরূপ। কে হত্যা করেছে তাকে সে কথাটা চিন্তা করার আগে তোমাকে চিন্তা করতে হবে কার পক্ষে সতরাত্রে গগনবিহারীকে হত্যা করা সম্ভব ছিল এবং হত্যার উদ্দেশ্যটাও সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে। নচেৎ ভুল পথে তুমি গিয়ে পড়বে। ভাল কথা, রামদেওর কোন সংবাদ পেলে?

না।

আর একটা কথা—

বলুন?

সুধীরবাবুর জবানবন্দিটা ও সেই সঙ্গে শমিতা দেবীর ও রুক্মিণীর জবানবন্দিটারও ভাল করে খোঁজখবর নাও। কারণ আমার ধারণা ওরা তিনজনেই মিথ্যে বলেছে।

শমিতা দেবী যে মিথ্যে বলেছেন সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু সুধীরবাবু আর রুক্মিণী—

কেউই সব সত্যি প্রকাশ করেনি।

রামদেওটার খোঁজ পেলে হয়ত অনেক কিছুই জানা যাবে।

খোঁজ পেলেও জেনো সেও হয়তো সহজে মুখ খুলবে না। শোন অরূপ, আরও একটা কাজ তোমায় করতে হবে।

বলুন।

ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ সত্যিই গগনবিহারী কোন উইল করে গিয়েছেন কিনা? তাঁর আইন-পরামর্শদাতা কে ছিলেন? তাঁর খোঁজ পেলে হয়তো তাঁর কাছেই খোঁজটা পাবে। সত্যিই যদি উইল একটা হয়ে থাকে তো জেনো এই হত্যা-মামলায় সেই উইলের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কিন্তু আর না। আজ চলি—রাত অনেক হল।

ভাবছি ঐ রুক্মিণীকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসব। ও মাগী নিশ্চয়ই জানে রামদেও কোথায় গিয়েছে বা আছে।

তাড়াহুড়ো করে কিছু করো না। ঘটনাকে তার স্বাভাবিক গতিতেই চলতে দাও। ঘটনার স্বাভাবিক গতি আপনা থেকে অনেক কিছুই জানিয়ে দেয়। ঘটনার ধর্মই তাই।

অতঃপর অরূপ গাড়ি থেকে নেমে গেল।

আর ওরা কিরীটীর গৃহের দিকে চলল।

যোগজীবন পাথরের মতই যেন বসেছিলেন।

কিরীটীর শেষ কথাগুলো ও শমিতার ঐ ধরনের ব্যবহার যোগজীবনকে যেন অকস্মাৎ একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল।

একমাত্র বোন ঐ শমিতা। বয়সেও তাঁর চাইতে অনেক ছোট ও বলতে গেলে সন্তানের মতই। চিরদিনই তাই একটু বেশী প্রশ্রয় ও ভালবাসাই সে পেয়ে এসেছে যোগজীবনের দিক থেকে। ভালবেসে নিজের পছন্দমত বিয়ে করেছিল শমিতা এবং সে বিবাহে তাই কোন বাধা দেননি যোগজীবন।

ভালবাসার বিবাহবন্ধনও টিকলো না, ডিভোর্স হয়ে গেল।

ঘর ভেঙে গেল।

প্রথমটায় ভেবেছিলেন যোগজীবন সব দোষটাই বুঝি শমিতার স্বামী অমলেন্দুরই। সে-ই নিশ্চয়ই মানিয়ে নিতে পারেনি—যার ফলে ভালবাসার বন্ধনটাও ছিঁড়ে গেল। তাছাড়া কে-ই বা আপনজনের দোষ দেখে বা দেখতে চায়! তাই শমিতার দিক থেকে যে কোন দোষ থাকতে পারে সেটা তিনি ভাবতেই চাননি।

ভুলটা ভাঙতে যোগজীবনের খুব দেরি হল না। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শমিতা তাঁর গৃহে এসে উঠবার পর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন অমলেন্দুর দোষ যতটুকুই থাকুক না কেন বিচ্ছেদের ব্যাপারে ঘর বেঁধে কোথাও সুখে বাস করবার মেয়ে

নয় শমিতা।

আত্মসুখপরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী জীবনের প্রতিই ঝোঁক বেশী শমিতার।

মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলেন যোগজীবন, কিন্তু তবু মুখে কিছু বলতে পারেননি।

শমিতা চাকরি করে। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ক্লাবে হৈ-হৈ করে কাটায়, সেখানে মদ্যপানও করে। কোনটাই তাঁর পছন্দ ছিল না, কিন্তু তবু বোনকে মুখ ফুটে কিছু বলেননি।

ইদানীং গগনবিহারীর সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতার কথাটাও যে কানে আসেনি তাঁর তাও নয়, সেটাও তাঁর কানে এসেছিল এবং তার জন্য শমিতার উপরে যতটা নয় তাঁর চাইতে বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন যোগজীবন গগনবিহারীর উপরেই।

ইচ্ছা হয়েছিল দু-একবার গগনকে কথাটা বলেন—গগন, ব্যাপারটা বড় দৃষ্টিকটু লাগছে—কিন্তু তাও বলেননি।

সমস্ত ব্যাপারটার কুশ্রীতা তাঁর রুচিবোধকে পীড়িত করলেও কেন যেন মুখ ফুটে কাউকেই কিছু বলতে পারেননি।

তাঁর সহজ সৌজন্য ও স্বাভাবিক রুচিবোধ তাঁকে নিরস্ত করেছে।

কিন্তু আজ কিরীটী যা স্পষ্ট করে সবার সামনে বলে গেল, তারপর লজ্জায় যেন মাথাটা আর তিনি তুলতে পারছিলেন না। কেবলই মনে হচ্ছিল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

একেই তো আত্মীয়স্বজনরা সব সময়েই নানা ধরনের ইঙ্গিত করে শমিতার চরিত্র সম্পর্কে এই ব্যাপার জানাজানি হবার পর তারা নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে এবার নিশ্চয়ই।

হঠাৎ চমক ভাঙল যোগজীবনের পদশব্দে। দেখলেন সাজগোজ করে শমিতা বের হয়ে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন যোগজীবন। ডাকলেন, শমি!

শমিতা ঘুরে দাঁড়াল।

এত রাত্রে কোথায় আবার বেরুচ্ছ?

দরকার আছে—শমিতা বললে।

যতই দরকার থাক এখন যেও না এই রাত্রে।

কি ব্যাপার বল তো দাদা? রাত্রে কি আজ আমি প্রথম বেরুচ্ছি? শমিতা একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই প্রশ্নটা করে।

যা বললাম তাই শোন। যোগজীবনের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

আমার কাজ আছে—বলে আর দাঁড়াল না শমিতা। সদর গেটের দিকে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল।

যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি যোগজীবন যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। কঠিন কণ্ঠে ডাকলেন, শোন শমিতা! দাঁড়াও!

শমিতা ঘুরে দাঁড়াল এবারে।

বারান্দার আলো শমিতার সর্বাঙ্গে পড়েছে। পরনে একটা দামী শাড়ি ও গায়ে একটা অনুরূপ ব্লাউজ। সাধারণতঃ যেভাবে বেশভূষা করে শমিতা বের হয় সেই রকমই বেশ-ভূষা, হাতে একটা ব্যাগ। পায়ে ফ্ল্যাট-হীল জুতো।

আমি বারণ করলুম বেরুতে তবু বের হবে?

কয়েক পা এগিয়ে এসেছেন যোগজীবন তখন ওর সামনে।

আমার কাজ আছে বললাম তো।

না। এখন তোমার বেরুনো হবে না! পূর্ববৎ কঠিন কণ্ঠস্বর যোগজীবনের।

শমিতা যোগজীবনের মুখের দিকে তাকাল। শমিতার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। সে শান্ত গলায় যোগজীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে বেরুতেই হবে।

না! তোমার অনেক উচ্ছৃঙ্খলতাই আমি সহ্য করেছি এতদিন, আর আমি সহ্য করব না। বেরুনো তোমার হবে না। আর আমার কথা অমান্য করে তুমি যদি বের হও তো জানবে—

বল। থামলে কেন? তাহলে কি?

আমার এখানে আর থাকা চলবে না।

শমিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েকটা মুহূর্ত তার গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হয় না। কেবল অপলক চেয়ে থাকে যোগজীবনের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, বেশ, তাই হবে। আমি এখুনি তোমার বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

শমিতা কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে পরক্ষণেই ফ্ল্যাট-হীল জুতোর খট্‌খট্ শব্দ তুলে উপরে চলে গেল।

তিনতলায় নিজের ঘরে ঢুকে একটা সুটকেস টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে কিছু জামাকাপড় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সুটকেসের মধ্যে ভরে আলমারি খুলে টাকা নিয়ে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল।

যোগজীবনের সামনে দিয়েই খট্‌খট্ করে ফ্ল্যাট-হীল জুতোর শব্দ তুলে শমিতা বের হয়ে গেল।

যোগজীবন দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি কথাও আর বললেন না।

শমিতার জুতোর শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

সহসা যোগজীবনের চোখের কোল দুটো যেন জ্বালা করে ওঠে। দরজাটায় খিল তুলে দিয়ে যোগজীবন এসে আবার বাইরের ঘরের সোফাটার উপর বসলেন।

যোগজীবনের মনে পড়ে স্ত্রী প্রভাবতীর কথা ঐ মুহূর্তে। বলতে গেলে শমিতা তাঁর সন্তানের বয়েসী—মা-বাবার শেষ বয়েসের সন্তান।

যোগজীবনের অনেক বছর পরে শমিতা জন্মেছিল। প্রভাবতী তখন বৌ হয়ে ওঁদের বাড়িতে এসেছেন—তাঁর একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে।

শমিতার জন্মের পরই তাঁর মা যে শয্যা নিয়েছিলেন, আর উঠে বসেননি। চার বৎসর রোগভোগের পর মারা গিয়েছিলেন। তার পরের বৎসর যোগজীবনের বাবারও মৃত্যু হয়।

স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন যশোদাজীবন। যোগজীবনের বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর শোকটা সামলে উঠতে পারলেন না।

শমিতার সকল দায়িত্ব এসে পড়ল ওঁদেরই উপর। বাচ্চা শমিতা মাত্র চার বছরের মেয়ে তখন।

যোগজীবনের নিজের প্রথমা কন্যা-সন্তানের চাইতেও দু বছরের ছোট বয়সে।

পিসি ভাইঝি একসঙ্গে মানুষ হতে থাকে। মাঝখানে প্রভাবতীর আর একটি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু মৃত। প্রভাবতীর আর কোন সন্তান হয়নি।

কন্যা সবিতার সঙ্গেই নামে নাম মিলিয়ে প্রভাবতী ছোট্ট ননদিনীর নাম রেখেছিলেন শমিতা।

সবিতার যখন সতেরো বছর বয়স তখন বিবাহ হয়ে গেল। লেখাপড়ায় তার মন ছিল না—লেখাপড়া সে করেওনি। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিল শমিতা। শমিতা তখন স্কুল-ফাইনাল পাস করে আই. এ. পড়ছে কলেজে।

বিবাহের পর সবিতাকে তার স্বামী সঙ্গে করে সুদূর মাদ্রাজ দেশে চলে গেল।

শমিতারও বিয়ের চেষ্টা করছিলেন যোগজীবন কিন্তু শমিতা বেঁকে বসল। বললে, না, বি. এ. পাস না করে সে বিবাহ করবে না।

প্রভাবতী বললেন, আহা থাক। সবিতার বিয়ে হয়েছে, কোথায় কোন্ দূর দেশে চলে গেছে। দু বছর তিন বছরের আগে আসবেও না। থাক, ওর বয়েসই বা এমন কি হয়েছে! পাস-টাস করুক, তারপর না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে।

শমিতা যখন এম. এ. পড়ছে সেই সময় হঠাৎ স্ট্রোকে প্রভাবতী মারা গেলেন। শমিতা এম. এ. পাস করল, তারপর এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিল।

যোগজীবন মধ্যে মধ্যে বিয়ের কথা বলতেন কিন্তু জোরজারি করতেন না। কারণ মৃত্যুর সময় প্রভাবতী স্বামীকে বলে গিয়েছিলেন, বিয়ের ব্যাপারে ওকে যেন চাপাচাপি না করা হয়। সেটাও এক কারণ ছিল আর শমিতা চলে গেলে একা পড়বেন, তাও এক কারণ ছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন শমিতা অমলেন্দুকে সঙ্গে করে এনে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তার এক সহকর্মী বান্ধবীর ভাই।

ভাল বংশের ছেলে, শিক্ষিত, ভাল চাকরি করে। দেখতেও সুশ্রী।

ইদানীং শমিতার ব্যাপারে একটু চিন্তিতই যেন হয়ে উঠেছিলেন যোগজীবন। শমিতার স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল। তার চাল-চলনে, বেশ-ভূষায়—সব কিছুতেই।

এমন কি বোনের বেশভূষার দিকে তাকাতেও যেন যোগজীবনের কেমন লজ্জা হত।

কিন্তু তবু কিছু তিনি বলেননি কোনদিন বোনকে।

কেমন যেন মায়া হয়েছে, কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করেছেন।

ঐ ঘটনার বছরখানেক আগে রিটায়ার করেছিলেন যোগজীবন কাজ থেকে।

শমিতা অমলেন্দুকে দেখিয়ে বললে, তাকে বিবাহ করবে। তারা পরস্পর পরস্পরকে কথা দিয়েছে।

যদিও এক জাত নয় তথাপি যোগজীবন সে বিবাহে অমত করেননি শমিতা সুখী হবে ভেবে।

বিবাহ হয়ে গেল।

শমিতা একদিন চলে গেল স্বামীর ঘরে।

কলকাতায় এক বনেদী অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে অমলেন্দু। কলকাতাতেই শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করে। মধ্যে মধ্যে দুজনে আসত যোগজীবনের সঙ্গে দেখা করতে।

যোগজীবন তখন নিজের বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শমিতা এসে মধ্যে মধ্যে দু'একদিন থাকত বলে তিনতলাটা ভাড়া দেননি। সেটা খালিই পড়ে ছিল।

দুটো বছরও গেল না বিবাহের পর, ডিভোর্স হয়ে গেল শমিতা ও অমলেন্দুর।

শমিতা যোগজীবনের কাছে ফিরে এল আবার এক শীতের মধ্যরাত্রে।

সেই সময়ই শমিতা মরালী সঙ্ঘ নামে ক্লাবটা গড়ে তোলে। এবং কিছুদিন পরে শমিতা আবার চাকরি নিল অন্য একটা কলেজে।

ডিভোর্স করে ফিরে আসবার পর যেন শমিতা আরও বেশী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে লাগল দিনকে দিন।

ক্লাব, পার্টি, হৈ চৈ, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সর্বক্ষণ ঐ সব নিয়েই মেতে রইল।

যোগজীবন মনে মনে ভাবলেন, আহা থাক। যাতে সুখী হয় তাই করুক।

কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যোগজীবনের সেদিন অমন করে রাশটা ছেড়ে না দিলে বোধ হয় এত বড় কলঙ্ক তাঁকে মাথায় নিতে হত না।

যাক চলে গিয়েছে, ভালই হয়েছে।

আর শমিতার মুখদর্শনও তিনি করবেন না।

দশ

শমিতা বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুদূর হাঁটতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। তখন রাত প্রায় দশটা।

ট্যাক্সিওয়ালা শুধায়, কিধার যায়গা মাঈজী?

গড়িয়া চল। শমিতা বললে।

ট্যাক্সিতে উঠেই মনে পড়েছিল বান্ধবী সর্বাণীর কথা। কলেজজীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল শমিতার, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বলতে বা সত্যিকারের বন্ধুত্ব বলতে একজনের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল—সর্বাণী।

এম. এ ফিফথ্ ইয়ারে পড়তে পড়তেই সর্বাণীর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল।

সর্বাণীর স্বামী শিশিরাংশু একজন অধ্যাপক। শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষটি। বেঁটে-খাটো রোগা। ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে শিশিরাংশু মামা-মামীর কাছেই মানুষ।

দুটো সাবজেক্টে এম. এ. পাস। দুটোতেই প্রথম শ্রেণী। কাজেই একটা অধ্যাপনার কাজ জুটিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তার।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল শিশিরাংশু।

কম ভাড়ায় বেশ খোলামেলা চার কামরার ভালো একটা দোতলা বাড়ির একতলাটা গড়িয়ায় পেয়ে শিশিরাংশু সেখানেই উঠে গিয়েছিল ভবানীপুরের ঘিঞ্জি ছোট ছোট দু'টো ঘর ছেড়ে দিয়ে।

দুটি বাচ্চা—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

কলেজ, ক্লাব, পার্টি, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে করতে হঠাৎ এক-আধদিন যখন একটা ক্লান্তি আসতো শমিতার—সে চলে যেত সর্বাণীর ওখানে। তিন-চার ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে আসত।

সর্বাণী বলেছে, কি রে, হঠাৎ সূর্য কোন দিকে উঠল?

শমিতা হাসতে হাসতে বলেছে, সূর্যোদয় আজ পর্যন্ত জীবনে কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে বলে মনে পড়ে না, কাজেই আজ যদি অন্য দিকে সূর্য উঠেও থাকে জানতে পারিনি।

তা এভাবে ছুটোছুটি না করে একটা বিয়ে কর্ না! সর্বাণী বলেছে।

কাকে রে? পাত্র হাতে আছে নাকি তোর? শমিতা বলেছে।

কি রকমটা চাই বল্? এখুনি খুঁজে এনে দেব। তোর জন্য আবার পাত্রের অভাব?

বলিস কি? আজকাল কি তুই তাহলে ঘটকীর প্রফেশন নিয়েছিস?

নেব ভাবছি—অন্ততঃ তোর জন্য। সর্বাণী জবাবে বলেছে।

আহা রে—মরে যাই! এমনি না হলে বন্ধু!

তারপর বিবাহের পর একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন গিয়েছিল শমিতা অমলেন্দুকে নিয়েই সর্বাণীর ওখানে।

সর্বাণী জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন লাগছে?

নো থ্রিল। তোর কথা শুনে মধ্যে মধ্যে ভেবেছি, না জানি কি একটা থ্রিল আছে বিবাহিত জীবনের মধ্যে।

বলিস কি?

সত্যি। আমি তো বুঝতে পারি না তোরা কি করে মশগুল হয়ে আছিস।

ন্যাকা!

না ভাই, একবর্ণও মিথ্যে বলছি না।

তাই বুঝি দেখা দিস না?

আগেই বা দেখা কত ঘন ঘন দিতুম যে আজ বিরলা হয়ে উঠেছি!

তারপরই হঠাৎ একদিন সর্বাণী জানতে পেরেছিল শমিতাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। জানতে পেরেছিল সর্বাণী শমিতার একটা চিঠিতেই। শমিতাই লিখেছিল তাকে—

সর্বাণী, ডিভোর্স হয়ে গেল অমলেন্দুর সঙ্গে। দাদার এখানে ফিরে এসেছি। চাকরির একটা সন্ধান করছি। কি রে, চিঠিটা পড়ে তোর খুব অবাক লাগছে তো!

কিন্তু তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, সাত-আট মাস বিয়ের পরে যেতে-না যেতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ শাসন আর বিধি-নিয়মের বন্ধনের চৌহদ্দির মধ্যে বিশ্রী ক্লান্তিকর একটা একঘেয়েমির মধ্যে থাকা আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। শুধু কি তাই, সর্বক্ষণই যেন একটা সন্দেহের কাঁটা কিচ্ কিচ্ করে বিঁধছে। তাই ও পাট চুকিয়ে দিলাম। দেখা হলে সবিস্তারে তোকে বলতেই হবে—তখনই শুনিস। এই পত্রে আর লিখলাম না। শুধু সংবাদটা দিলাম—ইতি তোদের

শমিতা সান্যাল

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সর্বাণী শমিতার চিঠিটা পড়ে। কোন জবাব দেয়নি সে চিঠির।

তারপর আরও দুটো বছর কেটে গিয়েছে। এই দু বছরে কিন্তু একদিনও দেখা-সাক্ষাৎ আর হয়নি ওদের।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে বসে ভাবছিল শমিতা—সেই চিঠির কোন জবাব দেয়নি সর্বাণী। সেও অবিশ্যি আর কোন চিঠি দেয়নি। যায়ওনি এই দু বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যে সর্বাণীদের ওখানে।

সর্বাণীর ওখানে তো সে চলেছে! সর্বাণী তাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! বিশেষ করে দুই বৎসরেরও অধিক সময় পরে হঠাৎ আজ রাত্রে যাই সে করুক একটা রাত্রির মত আশ্রয় কি সে তাকে দেবে না! দেবে নিশ্চয়ই। কাল সে যা হোক একটা থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে যেখানেই হোক।

প্রায় দশটা চল্লিশ নাগাদ শমিতার ট্যাক্সিটা এসে সর্বাণীদের বাড়ির দরজায় থামল। রাত্রের আহারাদি সর্বাণীদের তখনও হয়নি। শিশিরাংশু তখনও বাইরের ঘরে বসে তার কাগজপত্র নিয়ে কি সব লিখছিল, সর্বাণী ভিতরের ঘরে ছিল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে কলিং-বেলটা টিপতেই কলিং-বেলের শব্দে সর্বাণীই এসে দরজা খুলে দেয়, এবং বলাই বাহুল্য অত রাত্রে এত দিন পরে একটা সুটকেশ হাতে দরজার সামনে আবছা আলো-আঁধারিতে হঠাৎ শমিতাকে দেখে সে প্রথমটায় ঠিক চিনে উঠতে পারে না তাকে।

বলে, কে? কণ্ঠে সর্বাণীর একটা সংশয়।

সর্বাণী, আমি শমিতা—বললে শমিতা।

শমিতা! কি ব্যাপার? এত রাত্রে! সর্বাণী যেন কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলে।

সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়েই ঘরের মধ্যে পা দিল শমিতা।

কি ব্যাপার? শমিতার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে সর্বাণী। হাতে সুটকেশ, কোথা থেকে আসছিস?

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে শিশিরাংশুও উঠে এসেছিল, কে সবি!

কিন্তু পরক্ষণেই ঘরের আলোয় শমিতাকে দেখে শিশিরাংশু চিনতে পারে তাকে। বলে, একি শমিতা দেবী, এত রাত্রে?

হ্যাঁ। যাক চিনতে পেরেছেন তাহলে আপনি আমায়! আমার বান্ধবী তো চিনতেই পারেনি। বলতে বলতে শমিতা হাতের সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে একটা বেতের সোফার উপর বসে পড়ে বলে, শোন্ সর্বাণী, আজ রাতটা তোর এখানে আমি থাকতে চাই।

শিশিরাংশু বলে ওঠে, নিশ্চয়ই থাকবেন। আজকের রাতই বা কেন—যত দিন খুশি থাকুন না।

শিশিরাংশু উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানালেও সর্বাণী যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে শমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কোন কথাই বলে না। তার চোখে-মুখে অভ্যর্থনার কোন আনন্দই নেই যেন। শমিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যাপারটা এড়ায় না।

তাই সে একটু হেসে সর্বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আজকের রাতটা ভাই, কাল সকালেই চলে যাব।

শিশিরাংশুই আবার বলে, আপনি এত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন শমিতা দেবী ?

কিন্তু বেশী কিছু আর বলতে পারে না শিশিরাংশু, হঠাৎ তার স্ত্রীর মুখের দিকে নজর পড়ায়। একটু যেন বিব্রতই বোধ করে—বলে, সবি, ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। আমার সামান্য দেরি আছে।

শিশিরাংশু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শমিতা বললে, আমি বোধ হয় হঠাৎ এভাবে এই রাত্রে তোর এখানে এসে পড়ে তোকে একটু বিব্রত করলাম সর্বাণী, তাই না ?

কোথা থেকে আসছিস ? এতক্ষণে সর্বাণী আবার কথা বলে।

দাদার বাড়ি থেকে চলে এলাম।

চলে এলি মানে ?

সে-সব অনেক কথা। দু'কথায় শেষ হবে না। দাদার ওখান থেকে বের হয়ে কোথায় যাই এত রাত্রে ভাবতে গিয়ে তোর কথাই মনে পড়ল তাই সোজা তোর এখানেই চলে এলাম। অবিশ্যি কাল সকালেই চলে যাব।

চল্ ঐ ঘরে। বলে শমিতাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে সর্বাণী ঢুকল।

একটা আরাম-কেদারায় শমিতা বসল।

দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস ? সর্বাণী আবার জিজ্ঞেস করে।

না রে।

তবে ?

প্লীজ, সর্বাণী, এখন কোন কথা নয়। পরে তোকে সব বলব।

সর্বাণী আর কোন প্রশ্ন করে না। কেমন যেন একটু অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

একজন সোফায় বসে, অন্যজন অল্প দূরে দাঁড়িয়ে। কারো মুখেই আর যেন কথা নেই। ওদের দেখে মনে হয় কেউ যেন আর বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

যদিও দুজনেই মনে মনে চাইছিল একজন কেউ বলুক যা দুজনেই শুনতে চায়। অথচ দুজনের মধ্যে কি গভীর বন্ধুত্বই না ছিল একসময়!

মাত্র মাঝখানে দুটো বছরের অদর্শন। সময়টা কি এতই দীর্ঘ যে তাদের উভয়কে ঘিরে যে উত্তাপটা দুজনের মনের মধ্যে একসময় ছিল সেটা একেবারেই মিইয়ে গিয়েছে!

সর্বাণী!

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডাকল শমিতাই অবশেষে, কারণ সে সত্যিই যেন বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল।

কিছু বলছিলি ? সর্বাণী বান্ধবীর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

মনে হচ্ছে তোকে খুব অসুবিধায় ফেললাম, তাই না রে? কথাটা বলে সর্বাণীর মুখের দিকে চেয়ে শমিতা হাসবার চেষ্টা করে।

না, অসুবিধা কি? কথাটা যেন নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেই বলার মত করে বললে সর্বাণী।

তা ফেলেছি বৈকি। সত্যি, আমি ভেবেছিলাম—যাক গে, শুধু আজকে রাতটা তোদের বাইরের ঘরে সোফাটার উপরে বসেই আমি কাটিয়ে দিতে পারব। আমি ঐ ঘরেই যাচ্ছি, বুঝলি?

শমিতা উঠে দাঁড়াল সুটকেসটা হাতে নিয়ে এবং ধীরে ধীরে সত্যি সত্যিই একটু আগে যে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল সেই ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

তোকে ব্যস্ত হতে হবে না শমিতা। এক রাত্রের জন্য ব্যবস্থা হয়েই যাবে একটা। তুই বস্।

শমিতা সর্বাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, না রে, কিছু অসুবিধা হবে না আমার সত্যিই। তুই ব্যস্ত হোস না।

শমিতা পাশের ঘরটার মধ্যে চলে গেল। ঘরটার মধ্যে তখনও আলো জ্বলছিল। শমিতা একটু আগে যে সোফাটার উপর বসেছিল সেই সোফাটার উপরেই এসে বসল দরজাটা টেনে দিয়ে।

সর্বাণী তখনও পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরটা ছোট। একধারে একটি ডাইনিং টেবিল—তার পাশে ছোট একটা ফ্রিজ। খানচারেক চেয়ার আর ক্যাম্বিসের একটা আরাম-কেদারা। ঐ ঘরেরই সংলগ্ন একদিকে বাথরুম, অন্যদিকে কিচেন।

সামনে পাশাপাশি দুটো শোবার ঘর। একটাতে সর্বাণী তার মেয়েছেলেদের নিয়ে শোয়, অন্যটায় শিশিরাংশু শোয়।

খুশি হয়নি আদৌ সর্বাণী অত রাত্রে শমিতার আকস্মিক আবির্ভাবে। তার কারণও ছিল। শমিতা কথা বলছিল আর মুখ থেকে যে গন্ধটা বেরুচ্ছিল সেটা যে মদের গন্ধ সর্বাণীর সেটা বুঝতে দেরি হয়নি।

দুই বন্ধুর মধ্যে দেখাশুনা না হলেও ইদানীং দুই বৎসর সর্বাণী মধ্যে মধ্যে শমিতার বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল জীবনের খবর পেত এর-ওর মুখ থেকে। এবং শমিতা যে ক্লাবে ও হোটেলে গিয়ে পুরুষ-বন্ধুদের নিয়ে হৈচৈ করে মদ্যপান করে—খবরটা দিয়েছিল কিছুদিন আগে তারই আর এক বান্ধবী রমলা।

রমলা ঐ শ্রেণীর মেয়ে না হলেও, তার বড় চাকুরে স্বামী ও তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হোটেলে যেত ডিনার খেতে।

সে-ই দেখেছিল শমিতাকে।

বলেছিল, লেখাপড়ায় অত ভাল মেয়েটা, তার যে এতদূর অধঃপতন ঘটেছে ভাবতে পারিনি সর্বাণী। যেমন বিশ্রী পোশাক তেমনি নোংরা চালচলন। বরাবরই ও অবশ্যি একটু চপল ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল।

সত্যি বলছিস? সর্বাণী শুধিয়েছিল।

নিজের চোখেই যে দেখলাম রে! তাছাড়া কি এক ক্লাব করেছে মরালী সঙ্ঘ না কি—সেখানে শুনেছি একগাদা পুরুষ-মেয়ে জুটে মাঝরাত্তির পর্যন্ত বেলেল্লাপনা করে। আমার স্বামী সুহৃদ কি বলছিল জানিস?

কি?

ও একটা বেশ্যা। তা সত্যিই তো, বেশ্যা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! এক কালে তো তোর সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ছিল, আসে না এখানে?

না।

ছিঃ ছিঃ, ডিভোর্স করে স্বামীটাকে ছেড়ে এসে একটা স্বৈরিণীর জীবনযাপন করছে। ঐজন্যই বোধ হয় ডিভোর্স করেছে।

সর্বাণী কোন কথা বলেনি।

রমলার কথাগুলোই মনে পড়েছিল সর্বাণীর ঐ মুহূর্তে।

হঠাৎ শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে সর্বাণীর চমক ভাঙে, কই, তোমার বান্ধবী কোথায় সবি? এক কাজ কর। আমার ঘরটায় ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও বরং। খেয়েদেয়ে এসেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

না।

দেখ যদি না খেয়েদেয়ে এসে থাকেন—কিন্তু কোথায় তিনি?

বাইরের ঘরে।

যাও। দেখ খেয়ে এসেছেন কিনা।

ধীরে ধীরে কিছুটা চাপা গলায় সর্বাণী বললে, বোধ হয় খেয়েদেয়েই এসেছে।

তাহলেও একবার জিজ্ঞাসাটা করা দরকার। যাও।

ভাবছিলাম এক কাজ করলে হয় না? অন্য কথা পাড়ল সর্বাণী স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে।

কি?

যে ফোলডিং ক্যাম্প-খাটটা আছে সেটাই বাইরের ঘরে পেতে ওকে শোবার ব্যবস্থা করে দিলে হয় না?

না, না—সেটা ভাল দেখাবে না।

কেন? ভাল দেখাবে না কেন?

হাজার হোক তোমার সহপাঠিনী—বান্ধবী।

তাতে কি হয়েছে? কবে কলেজে কটা দিন একসঙ্গে পড়েছিলাম! এমন কি সম্পর্ক যে—কথাটা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই বোধ হয় শেষ করতে পারল না সর্বাণী।

কিন্তু তার গলায় যে চাপা উষ্মাটা প্রকাশ পেল সেটা সেই মুহূর্তে শিশিরাংশুর মত লোককেও যেন বিস্মিত করে দিয়েছিল।

সে বলে, আঃ সর্বাণী, কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি।

আঃ, চুপ কর। থামিয়ে দেয় শিশিরাংশু স্ত্রীকে। যাও, দেখ উনি কি করছেন।

স্বামীর কথায় সর্বাণীও যেন এতক্ষণে খানিকটা সংবিৎ ফিরে পায়। নিজের রূঢ় আচরণে খানিকটা থমকে যায়।

সর্বাণী ভেজানো দরজাটা ঠেলে পাশের ঘরে পা দেয়।

এগারো

ঘরে পা দিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ায় সর্বাণী।

ঘরটা অন্ধকার। আলো নেভানো।

একটু ইতস্তত করে সর্বাণী, অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্য। তারপরই মৃদুকণ্ঠে ডাকে, শমিতা!

কিন্তু কোন সাড়া আসে না অন্ধকারে।

হাত বাড়িয়ে সর্বাণী সুইচটা টিপে ঘরের আলোটা জেলে দিল। ঘরের আলোটা জলে উঠতেই ওর নজরে পড়ল বড় সোফাটার উপরে পা তুলে চোখ বুজে শুয়ে আছে শমিতা। মনে হল ঘুমোচ্ছে।

একটু ইতস্তত করল সর্বাণী। তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শমিতা, এই শমিতা?

কিন্তু সর্বাণীর ডাকে শমিতা চোখও খুলল না, সাড়াও দিল না।

এই শমিতা? ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? বেশ মেয়ে তো! এই শমিতা, ওঠ্!

তথাপি শমিতার কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সর্বাণী তথাপি কিছুক্ষণ শায়িতা শমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এক সময় ঘরের আলোটা আবার নিভিয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজাটা ভিতর থেকে টেনে দিল।

কি হল? শিশিরাংশু জিজ্ঞাসা করে।

ঘুমিয়ে পড়েছে। সর্বাণী বললে।

ঘুমিয়ে পড়েছে! কোথায়?

সোফাটার উপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ছিঃ ছিঃ, দেখ তো! কি ভেবেছেন!

কি আবার ভাববে? আর ভাবে ভাবুক। চল, তোমাকে খেতে দিই। বলতে বলতে সর্বাণী কিচেনে গিয়ে ঢুকল।

শিশিরাংশুকে খাবার পরিবেশন করে দিল, অথচ সর্বাণী বসল না টেবিলে।

শিশিরাংশু জিজ্ঞাসা করে, তুমি খাবে না?

ক্ষিধে নেই—তুমি খাও।

খেতে খেতে শিশিরাংশু একসময় বলে, কাজটা ভাল হল না সবি!

কেন?

তা নয় তো কি! একটা রাতের জন্য ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়িতে এলেন—তাছাড়া ঐভাবে কেউ ঘুমোতে পারে নাকি! এদিকে যা মশা—

তা আমি তো আর সোফায় শুয়ে রাত কাটাতে বলিনি।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল শিশিরাংশু, সর্বাণী!

কি?

মনে হচ্ছে তুমি যেন হঠাৎ উনি এভাবে তোমার বাড়িতে আসায় ঠিক সন্তুষ্ট হওনি!

নিশ্চয়ই হইনি।

কিন্তু কেন?

ওর সব কথা তুমি জান না, ইদানীং ও যেভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছিল—

কথাটা তোমার আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সর্বাণী।

পরে বলব, এখন খেয়ে নাও।

কিন্তু—

আচ্ছা, তুমি কি কিছুই টের পাওনি?

কি টের পাব?

কেন, কোন গন্ধ পাওনি ওর মুখে?

কিসের গন্ধ?

ওর মুখ থেকে ভভভড় করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল যখন ও কথা বলছিল! গন্ধ পাওনি তুমি?

সে কি! কই, আমি তো—

আশ্চর্য! তোমার নাকে গন্ধ গেল না? সি ইজ ড্রাঙ্ক! আমার সারাটা গা এখনও বমি-বমি করছে। স্নান না করে আমি শুতে পারব না।

শিশিরাংশু আর কোন কথা বলে না।

একসময় তারপর পাশের ঘরের আলো নিভে গেল। সর্বাণী ও তার স্বামীর কথা আর শোনা যায় না। আরও কিছু পরে শমিতা উঠে বসল সোফাটার ওপরে অন্ধকারে ধীরে ধীরে।

এতক্ষণ ধরে অন্ধকারে মশার কামড়ে চোখ-মুখ জ্বালা করছিল শমিতার। বাকি রাতটুকু ঘুম হবে না। মশার কামড়ের জ্বালা না থাকলেও অবিশ্যি ঘুম আসত না শমিতার চোখে।

দাদা যে তাকে অমন স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের উপরেই বলে দিতে পারে তার বাড়িতে আর শমিতার স্থান হবে না ভাবতে পারেনি ও। কাল সকালেই যেখানে হোক একটা ব্যবস্থা থাকার করে নিতেই হবে তাকে। কিন্তু কোথায়? সেটাই ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না শমিতা।

সর্বাগ্রে তাকে একবার সমরেশের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কিন্তু সমরেশের কথা মনে পড়তেই মনটা যেন কেমন একটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে শমিতার। তার প্রতি সমরেশের মনোভাবটা জানতে শমিতার বাকি নেই।

আজ যদি সমরেশের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সমরেশ তার দুর্বলতার সুযোগটা পুরোপুরিই নেবে। সমরেশের বাহুবন্ধনে তাকে ধরা দিতেই হবে। অথচ মনের দিক থেকে এতটুকু সাড়া না মিললেও, সমরেশ ছাড়া এই মুহূর্তে আজ কারো কথাই তার মনে পড়ছে না যে আজ তাকে বাঁচাতে পারে।

আর একজন অবিশ্যি পারত, কিন্তু তার নাগাল আর পাওয়ার তার কোন উপায়ই নেই।

না, অসম্ভব মশা। বসবারও উপায় নেই। শমিতা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে অন্ধকারেই পায়চারি শুরু করল।

সর্বাণী সারাটা রাত ঘুমোতে পারেনি। শমিতার কথাই ভেবেছে। শমিতা এক সময় তার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী ছিল। কিন্তু আজ যেন শমিতাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না।

আশ্চর্য! শমিতার প্রতি এমন যে একটা বিতৃষ্ণা তার মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছে কখনও সে জানতেও পারেনি। কিছুতেই যেন সর্বাণী মন থেকে শমিতাকে ক্ষমা করতে পারছিল না। এমনিই বিচিত্র মানুষের মন বটে! যাকে একদিন সর্বতোভাবে সমস্ত মন দিয়ে কামনা করেছে, আজ তারই প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটা যেন শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

বাকি রাতটুকু শয্যায় ছটফট করে—ভোরের আলো একটু জানলাপথে দেখা দিতেই সর্বাণী উঠে পড়ল শয্যা ছেড়ে।

হাত-মুখ ধুয়েই চায়ের জল চাপাল। এক কাপ চা তৈরী করে বাইরের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে পা দিয়েই সর্বাণী থমকে দাঁড়াল। ঘর শূন্য। শমিতা নেই—তার সুটকেসটাও নেই। বাইরের দরজাটা ভেজানো। বুঝতে দেরি হয় না সর্বাণীর, শমিতা চলে গিয়েছে।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সামনের সেণ্টার-টেবিলটার ওপরে। একটা কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে, একটা বই দিয়ে চাপা দেওয়া। এগিয়ে গিয়ে ভাঁজ-করা কাগজটা তুলে নিল সর্বাণী।

যা ভেবেছিল তাই। শমিতা চিঠি লিখে রেখে গেছে একটা। ঘরের মধ্যে তখনও ঝাপসা-ঝাপসা অন্ধকার।

আলোটা জ্বেলে চিঠিটা পড়তে থাকে সর্বাণী।

সর্বাণী,

চলে যাচ্ছি ভাই। কাল রাত্রে এসে তোকে যে এতখানি বিব্রত করব ঠিক বুঝতে পারিনি, বুঝলে নিশ্চয়ই আসতাম না। আমাদের পুরনো দিনের বন্ধুত্বটার যে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বুঝতে পারি নি রে। যাওয়ার সময় তোকে মুখে বলে যেতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করিস। তোকে কাল রাত্রে বলতে পারিনি, দাদা আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলায়ই অত রাত্রে কোথায় যাই ভাবতে গিয়ে তোর কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ায় তোর কাছেই এসেছিলাম। তোর স্বামীকে এ চিঠিটা দেখাস না—ছিঁড়ে ফেলিস। আর হয়ত জীবনে দেখা হবে না।

ইতি—শমিতা

বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা হাঁটবার পরই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল শমিতা।

ট্যাক্সিতে বসে-বসেই মনে পড়ল আজ অনেক দিন পরে আবার স্বামী অমলেন্দুর কথা। বছর দুই আগে এক শীতের রাত্রে সেই যে একবস্ত্রে বের হয়ে এসেছিল শমিতা অমলেন্দুর বাড়ি থেকে, তারপর আর কখনও অমলেন্দুর কথা মনে পড়েনি।

অমলেন্দুও আর কোন খোঁজ করেনি তার—সেও করেনি অমলেন্দুর। অমলেন্দুপর্বটা যেন সে জীবনের পাতা থেকে একেবারে মুছেই দিয়েছিল।

কিন্তু অমলেন্দু কোন খোঁজখবর না নিলেও, অমলেন্দুর খবর মধ্যে মধ্যে ও কিন্তু পেত। তাদের ডিভোর্স হয়ে যাবার কিছুদিন পরেই অমলেন্দুর বাবা মারা যান, তার মাস কয়েক পরেই ভায়ে ভায়ে অমলেন্দুরা আলাদা হয়ে যায়।

পৈতৃক গৃহ ছেড়ে অমলেন্দু মিডলটন স্ট্রীটে একটা বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছে, সংবাদটা পেয়েছিল শমিতা সমরেশের কাছেই। সমরেশ একদিন অমলেন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দু বইয়ের ব্যবসা শুরু করেছিল।

অমলেন্দু যে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি সে খবরটাও পেয়েছিল শমিতা।

চলমান ট্যাক্সিতে বসে অমলেন্দুর কথা হঠাৎ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় অমলেন্দুর কাছে গেলে কেমন হয়! কোন হোটেলে গিয়ে উঠবার মতো টাকা তার হাতে নেই। একটা কোন বোর্ডিংই তাকে খুঁজে নিতে হবে, কিন্তু সেও সময়ের প্রয়োজন।

একবার মনে হয়, অমলেন্দু কিছু ভাববে না তো। মনে মনে হাসবে না তো! কিন্তু অমলেন্দু সে-প্রকৃতির মানুষ নয়। মনে মনে সে যাই ভাবুক তার স্বাভাবিক শিষ্টাচারবোধ মুখে তাকে কিছু প্রকাশ করতে দেবে না।

তাছাড়া সেও আর চিরকালের জন্য কিছু সেখানে থাকতে যাচ্ছে না। তার বর্তমান সঙ্কটের সময় কিছুদিনের জন্য একটা আশ্রয় চায় মাত্র সে তার কাছে।

বিশেষ করে কিরীটী রায়ের শ্যেনদৃষ্টির সামনে থেকে সে আপাততঃ কিছুদিন দূরে দূরে থাকতে চায়, গগনবিহারীর ব্যাপারটা যতদিন না মিটে যায়, সে একটা নিভৃত কোটর চায় যেখানে সে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতে পারে নিশ্চিন্তে।

হ্যাঁ, আজ সে আত্মগোপন করতেই চায়।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা ভয়ের অনুভূতি তাকে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। বুকটার মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে।

কিরীটী কি তাকে সন্দেহ করেছে! তার চোখের সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখের সামনে ভেসে উঠে যেন তাকে তীক্ষ্ণ শলাকার মত বিদ্ধ করছিল। আচ্ছা, সত্যিই গগনবিহারী উইল করেছিল নাকি?

আশ্চর্য, মানুষের কি লোভ! কামুক লম্পট গগনবিহারী ভেবেছিল তার অর্থ দিয়েই শমিতাকে করায়ত্ত করতে পারবে। আর সেই—সেই কারণেই হয়ত তাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিল ঐ রাত্রে।

কিন্তু আশ্চর্য, এসব পাগলের মত আবোলতাবোল কি সব সে ভাবছে!

কিধার যায়গা মাঈজী?

ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ডাকে হঠাৎ যেন শমিতা চমকে ওঠে।

গাড়ি তখন গড়িয়াহাটা ব্রিজটা ক্রস করছে, নীচ দিয়ে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন চলে যাচ্ছে—তার শব্দ ওর কানে আসে। ওর সমস্ত স্নায়ু যেন ঝিমঝিম করে ওঠে।

শমিতা তাড়াতাড়ি বলে, মিডলটন স্ট্রীট চল।

ড্রাইভার আর কোন কথা বলে না—যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল তেমনিই চালাতে থাকে।

সবে প্রত্যূষের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার আলোগুলো এখনও নেভেনি। রাস্তা একপ্রকার খালি বললেই হয়।

মধ্যে মধ্যে পাশ দিয়ে এক-আধটা খালি বাস, মিল্ক ভ্যান বা প্রাইভেট গাড়ি চলে

যাচ্ছে। দু'একজন পথিক চোখে পড়ে। শমিতার যেন কেমন শীত-শীত করে।

গাড়ি ক্রমে রামকৃষ্ণ কালচারাল মিশন—গোলপার্ক পার হয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে চলেছে।

হঠাৎ কি যেন আবার মনে হয় শমিতার। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। কেউ—কোন গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে না তো? পিছনে পিছনে একটা গাড়ি আসছে না?

কার গাড়ি? তার ট্যাক্সিটাকেই ফলো করছে নাকি?

নাঃ, শমিতা কি পাগল হয়ে যাবে নাকি! এসব কি সে ভাবছে! এসব কিসের প্রতিক্রিয়া? ভয়? কিরীটী রায়ের সেই দুটো চোখের দৃষ্টি! তীক্ষ্ণ শলাকার মত অন্তর্ভেদী!

পাশ দিয়ে একটা খালি ট্রাম চলে গেল পার্ক সার্কাসের দিকে। বলবে কি শমিতা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে মিডলটন স্ট্রীট নয়, অন্য কোথাও সে চলুক! কিন্তু কোথায়?

কেন, সোজা হাওড়া স্টেশনে! তারপর সেখান থেকে ট্রেনে চেপে দূরে—অনেক দূরে—আসানসোল, ধানবাদ, গোমো, গয়া, মোগলসরাই. বেনারস ছাড়িয়ে আরও দূরে।

কিন্তু তারপর?

সমস্ত শহরটা এরকম আশ্চর্যরকম ফাঁকা ফাঁকা কেন? শহরের এত লোকজন কোথায় গেল? আচ্ছা ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা কিছু ভাবছে না তো! ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা যদি বলে দেয়!

শমিতা আবার একটু নড়েচড়ে বসল। কপাল বুকের কাছে পিঠে ঘাম জমছে। হাত দুটো কেমন যেন অবশ। হাত তুলে একবার নিজের মুখে হাতটা বুলিয়ে নিল শমিতা। কোন সাড় নেই মুখে।

হাওয়ায় কয়েকগাছি চূর্ণকুন্তল চোখে-মুখে এসে পড়ছে। হাত দিয়ে ওড়া চুলগুলো ঠিক করে দেবার চেষ্টা করল শমিতা, কিন্তু পারল না—হাতের আঙুলগুলোও যেন কেমন অবশ হয়ে গিয়েছে।

কেমন যেন অনড় হয়ে বসে থাকে শমিতা। একসময় ট্যাক্সিটা ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে মিডলটন স্ট্রীটে এসে ঢুকল।

কেতনা নাম্বার মাঈজী?

ইধারই রোখ।

ড্রাইভার ট্যাক্সি থামাল। শমিতা ট্যাক্সি থেকে নামল সুটকেসটা নিয়ে। হাতের ব্যাগ খুলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল। ট্যাক্সিটা মিটার তুলে সোজা বের হয়ে গেল চৌরঙ্গীর দিকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শমিতা। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলল।

নতুন একটা সাততলা বিরাট ম্যানসন। গেটটা খোলাই। মনে পড়ল শমিতার, কে যেন বলেছিল নতুন একটা ম্যানসনের কোন একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে অমলেন্দু।

কোর্টইয়ার্ড দিয়ে এগুতেই একজন দারোয়ানকে নজরে পড়ল। দারোয়ানকেই ও শুধায়, ইধার মিঃ এ. মল্লিক কোন্ ফ্ল্যাটমে রহতা হ্যায় দারোয়ানজী ?

মিঃ মল্লিক !

হ্যাঁ।

চারতলা—আঠার নাম্বার ফ্ল্যাট।

সিঁড়ি কিধার হ্যায় ?

সিধা যাইয়ে বাঁয়ে তরফ—লিফ্‌ট্ সিঁড়ি দুই হ্যায়।

শমিতা আর দারোয়ানের দিকে তাকাল না। সুটকেসটা হাতে এগিয়ে গেল।

অটোমেটিক লিফ্‌ট্। একজন সুট-পরিহিত ভদ্রলোক লিফ্‌ট দিয়ে নেমে এল। শমিতা লিফটে ঢুকে থার্ড ফ্লোরের বোতামটা টিপে দিল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আপনা হতেই লিফ্‌ট উঠতে লাগল।

চারতলায় এসে লিফ্‌ট্ থামল। দরজা আপনা হতেই খুলে যেতে শমিতা করিডরে পা দিল।

বারো

আঠার নম্বর ফ্ল্যাট।

ফ্ল্যাটের দরজায় অমলেন্দুরই নেমপ্লেট রয়েছে। ডক্টর অমলেন্দু মল্লিক। ডি লিট্।

তাহলে এই ফ্ল্যাটই।

কোনমতে অবশ হাতটা তুলে কলিং-বেলের বোতামটা টিপল শমিতা। বার-দুই বোতাম টিপতে দরজা খুলে গেল। সামনেই নজরে পড়ে সাজানো-গোছানো একটা ড্রইংরুম।

দরজার মুখোমুখি একেবারে দেওয়ালে অমলেন্দুর একটা এনলার্জড ফটো। ভুল হয়নি তাহলে তার—অমলেন্দুরই ফ্ল্যাট।

মধ্যবয়সী একটি বিহারী ভৃত্য দরজা খুলে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করে, কিসকো মাংতা ?

মল্লিক সাব হ্যায় ?

জী। অভিতো নিদ যাতা হ্যায়।

ওঃ, তা—

আপ কিধার সে আতে হে ?

এই মানে—কানপুর।

কানপুর!

হ্যাঁ।

আইয়ে, বৈঠিয়ে।

শমিতা এগিয়ে গিয়ে একটা সোফার উপর বসল। স্যুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে দিল।

ভৃত্য দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অন্দরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে—এতক্ষণে যেন একটা দুর্নিবার লজ্জা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। সমগ্র পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটা যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

ছিঃ ছিঃ, ঝোঁকের মাথায় এ একটা কি কাজ সে করে বসল! শেষ পর্যন্ত মরতে এখানে সে আসতে গেল কেন? একটু পরেই অমলেন্দু হয়ত এই ঘরে এসে ঢুকবে।

তারপর?

তারপর কি একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি তার চোখে-মুখে ফুটে উঠবে না?

বলবে না কি, ও, তাহলে তুমি! তা মিস শমিতা সান্যাল এখানে আবার কি প্রয়োজনে? দাদা বুঝি শেষ পর্যন্ত গলাধাক্কা দিল? জানতাম দেবে। কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি রূপ-যৌবন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। আর বুঝি কাউকে গাঁথতে পারলে না মিস সান্যাল!

শমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে সোফার পাশ থেকে স্যুটকেসটা তুলতে যাবে হঠাৎ একটা চপ্পলের আওয়াজ কানে এল শমিতার। একেবারে দরজার গোড়াতেই। থপ্ করে আবার বসে পড়ল শমিতা।

পরক্ষণেই ঘরের ভারী পর্দাটা তুলে অমলেন্দু এসে ভিতরে প্রবেশ করল। শমিতার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই অমলেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্ময়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হল একটি মাত্র শব্দ, তুমি!

শমিতা চেয়ে থাকে অমলেন্দুর দিকে।

সদ্য বোধ হয় অমলেন্দুর ঘুম ভেঙেছে। গায়ে একটা ড্রেসিং-গাউন—মাথার চুল বিস্রস্ত।

শমিতা নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়াচ্ছিল আবার কিন্তু অমলেন্দু বাধা দিল। বস, বস —বলতে বলতে আরও দু'পা সামনের দিকে এগিয়ে এল অমলেন্দু।

ব্যাপারটা যেন তখনও তার সদ্য-ঘুম-ভাঙা মস্তিষ্কে ঠিক প্রবেশ করছে না। শুধু আকস্মিক নয়, অভাবিতও ব্যাপারটা তার কাছে। শমিতা তার গৃহে!

কি ব্যাপার বল তো? ইউ লুক্ সো শ্যাবি! মনে হচ্ছে যেন কোন দীর্ঘ পথ ট্রেন-

জানি করে আসছ—কোথা থেকে আসছ ?

অমলেন্দু—

চল চল—তা এখানে বসে আছ কেন ? বুধনটা বলল কে একজন মাইজী এসেছে কানপুর থেকে। আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি ! চল চল, ভিতরে চল। অমলেন্দুর কণ্ঠস্বরে যেন একটা সাদর আগ্রহ অভ্যর্থনার আত্মীয়তার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এস।

শমিতা উঠে দাঁড়াল।

শমিতাকে নিয়ে অমলেন্দু শয়নঘরে গিয়ে ঢুকল তার। একপাশে এলোমেলো শয্যা, একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে একটা ডিভান—অন্যপাশে একটা টেবিলের ওপরে একরাশ বই কাগজপত্র ছড়ানো।

মাথার কাছে টেলিফোন, সিগারেট প্যাকেট, অ্যাশট্রে, লাইটার, ছোট একটা টেবিল-ক্লক।

বস। ডিভানটা দেখিয়ে দিল অমলেন্দু।

শমিতা সত্যিই আর দাঁড়াতে পারছিল না। পা দুটো যেন কাঁপছিল। শমিতা ডিভানটার উপরে বসে পড়ল।

এত সকালে—নিশ্চয়ই তোমার চা খাওয়া হয়নি শমিতা ? এই বুধন—বুধন !

প্রভুর ডাকে বুধন এসে ঢোকে, জী।

চা হয়েছে ?

জী হাঁ—চা রেডি।

এই ঘরে নিয়ে আয়।

বুধন চলে যাবার পর অমলেন্দু আবার শমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, হাত-মুখ ধোয়া হয়নি এখনও বলেই মনে হচ্ছে। ঐ যে বাথরুম, যাও।

শমিতা একটা কথাও বলে না। যন্ত্রচালিতের মত উঠে বাথরুমে ঢোকে।

অমলেন্দু প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। শমিতা! শমিতা হঠাৎ এল কেন আবার ? মনে হচ্ছে শমিতা খুব চিন্তিত, ক্লান্ত। শমিতার কোন খবরাখবর না নিলেও, এই দুই বৎসর তার সম্পর্কে সকল সংবাদই অমলেন্দুর কানে এসেছে। বিশেষ করে মরালী সঙ্ঘের ব্যাপারটা।

শমিতা ইদানীং রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছে। তার সম্পর্কে নানা ধরনের রসালো কেচ্ছা সবই তার কানে এসেছে।

কিন্তু অমলেন্দু কান দেয়নি সে-সব কোন সংবাদে। এককালে শমিতা তার স্ত্রী ছিল। তারপর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে তো আর কোন সম্পর্ক নেই। তবু—

তবু কেন যেন মধ্যে মধ্যে অমলেন্দুর মনের ভিতরটা কি এক বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে অমলেন্দু তাকে ভুলতে পারেনি।

ঐ ভুলতে না পারাটাও কি তার কাছে কম লজ্জা মনে হয়েছে!

বুধন ট্রেতে চা নিয়ে এল।

একটু পরেই শমিতা বাথরুম থেকে বের হয়ে এল। চোখে মুখে ও কপালের চুলে চূর্ণ জলকণা লেগে আছে। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়ানো, শমিতা আবার ডিভানটার উপরে এসে বসল।

অমলেন্দুই চা তৈরী করে এক কাপ এগিয়ে দিল শমিতার দিকে, নাও।

হাত বাড়িয়ে শমিতা চায়ের কাপটা নেয়। হাতটা যেন কাঁপছে।

অমলেন্দু নিজের কাপটা হাতে তুলে নেয়। নিঃশব্দে দুজনে কিছুক্ষণ চা পান করে। কারও মুখেই কোন কথা নেই, দুজনেই মনে মনে ভাবে, ও আগে কথা বলুক। শমিতা ভাবে, ওরই তো জিজ্ঞাসা করার কথা। কেন আবার হঠাৎ এলাম!

অমলেন্দু ভাবে, নিশ্চয়ই শমিতা বলবে কিছু। তার বলবার কিছু নিশ্চয়ই আছে, আর সেই জন্যই হয়ত এসেছে। কিন্তু দুজনেই বুঝতে পারে মনে মনে, মধ্যিখানে দুঃ বৎসরের ব্যবধানে দুজনে দুজনের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

অত্যন্ত সহজ ছিল যা একদিন আজ তা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে কখন যেন।

এক সময় চা শেষ হল বাক্যহীন স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে।

অমলেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। বুধন ঐ সময় ঐদিনকার সংবাদপত্রটা রেখে গেল ওদের সামনে। অমলেন্দু হাত বাড়িয়ে সংবাদপত্রটা তুলে নিল। প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় হেডলাইনগুলো চোখ বুলিয়ে তৃতীয় পৃষ্ঠাটা খুলতেই অমলেন্দুর চোখে পড়ল গগনবিহারীর নিহত হবার সংবাদটা।

অমলেন্দু যেন চমকে ওঠে। কারণ গগনবিহারীর সঙ্গে শমিতার ইদানীংকার ঘনিষ্ঠতার সংবাদটা সে পেয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। গগনবিহারীকে তার শয়নগৃহে মৃত রক্তাপ্লুত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে পৃষ্ঠে ছুরিকাবিদ্ধ। কাউকেই এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। গগনবিহারীর বহুদিনের ভৃত্য রামদেওর কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

অমলেন্দু একবার আড়চোখে তাকাল পাশেই উপবিষ্ট শমিতার দিকে, তারপর আবার সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করল।

কিন্তু পড়তে পারল না। কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের উপরে রেখে উঠে দাঁড়াল। আমি একটু বেরুব শমিতা।

বেরুবে, কোথায় ?

একটা বই আজ বেরুবার কথা। শেষ ফর্মাটা কাল রাত্রে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল। একবার প্রেসে যেতে হবে, সেখান থেকে একবার প্রফেসার চৌধুরীর ওখানে যাব। বুধন রইল—তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

শমিতা অমলেন্দুর প্রশ্নের জবাব দেয় না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে অমলেন্দু স্নান করে সাজগোজ করে যখন বের হয়ে গেল, শমিতা তখনও তেমনি ডিভানটার উপরে বসে আছে।

আশ্চর্য !

অমলেন্দু তো তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করল না! কেন সে হঠাৎ এখানে এসেছে, তার কিছু বলার আছে কিনা!

কি করবে সে ? চলে যাবে ?

কিন্তু কোথায় যাবে ? কলেজে একবার যেতে হবে বটে, তাছাড়া থাকবার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে। অমলেন্দুর এখানে সে থাকতে পারে না। অমলেন্দুই বা তাকে থাকতে দেবে কেন ? কি সম্পর্ক আজ আর তার সঙ্গে ?

বেলা দুটো নাগাদ অমলেন্দু ফিরে এল।

ঘরে ঢুকে দেখে শমিতা তার শয্যায় শুয়ে গভীর নিদ্রাভিভূত। স্নান করে অন্য একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরেছে। ভিজে চুলের রাশ বালিশে ছড়িয়ে আছে।

ঘর থেকে বের হয়ে এসে অমলেন্দু বুধনকে ডাকল।

বুধন, মাইজী খেয়েছে ?

না।

খায়নি ?

না। দুবার তিনবার ডাকতে এসে দেখি মাইজী ঘুমাচ্ছেন। আপনার খানা দেব টেবিলে ?

হ্যাঁ, দে।

বুধন চলে যাচ্ছিল, তাকে আবার ডাকল অমলেন্দু, শোন্। দুজনের খানাই দে টেবিলে।

বুধন ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল।

অমলেন্দু এসে শয্যার পাশে দাঁড়াল। ডাকল, শমিতা!

কোন সাড়া নেই শমিতার।

শমিতা, ওঠ। খাবে না ?

শমিতার ঘুম ভাঙে না।

অমলেন্দু একটু ইতস্তত করে, তারপর শিয়রের ধারে বসে ওর ভিজে চুলের উপরে হাত রেখে ডাকে মৃদুকণ্ঠে, শমিতা, শমিতা ওঠ।

উঁ!

ওঠ। চল—টেবিলে খাবার দিয়েছে।

শমিতা এবারে উঠে বসে, তুমি? কখন এলে?

এই আসছি—চল, টেবিলে খাবার দিয়েছে। যাও বাথরুম থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো।

শমিতা শয্যা থেকে উঠে বাথরুমের দিকে পা বাড়ায়।

খাবার টেবিলে বসে শমিতা বলে, একটা কথা বলব ভাবছিলাম অমল—

বল।

আমি যদি কটা দিন তোমার এখানে থাকি, তোমার কি খুব অসুবিধা হবে?

অমলেন্দু কোন জবাব দেয় না।

অবিশ্যি বেশী দিন নয়, একটা থাকবার ব্যবস্থা হলেই—

যতদিন খুশি এখানে থাকতে পার শমিতা। অমলেন্দু মৃদু গলায় জবাব দেয়।

না, না—বেশী দিন তোমাকে বিরক্ত করব না।

বিরক্তির তো কিছু নেই—

তোমার তো অসুবিধে হতে পারে!

অসুবিধা আবার কি?

হবে না?

কেন, অসুবিধা হবে কেন? হয়ত তোমারই অসুবিধা হতে পারে।

আমার?

হ্যাঁ—এখানে থাকতে—

না, অমলেন্দু তা নয়—

তবে কি?

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

কি?

না, কিছু না। তারপর একটু থেমে বলে, বুধন—তোমার চাকর কি ভাববে!

ও কেন ভাবতে যাবে?

ভাববে না বলছ?

না। তাছাড়া এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে?

তবুও হয়ত ভাববে—কে আমি—কোথা থেকে হঠাৎ এলাম—

ওকে বললেই হবে—

কি বলবে ?

তুমি আমার চেনা বন্ধু।

বন্ধু !

হ্যাঁ—কলকাতায় এসে আমার এখানে উঠেছে। তা ছাড়া ও কি ভাববে-না-ভাববে সে-কথা ভেবে তুমি এত সংকুচিতই বা হচ্ছ কেন ? তোমার কোন অসুবিধা না হলে তুমি থাকতে পার। কিন্তু তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না।

খিদে নেই—

তবে জোর করে খেও না।

আচ্ছা অমলেন্দু !

কি ?

তুমি তো একবারও জিজ্ঞাসা করলে না, আমি হঠাৎ কেন এলাম এতদিন পরে ?

তুমি যখন বলনি, নিশ্চয়ই বলবার মত কিছু নেই—তাই জিজ্ঞাসাও করিনি।

না অমলেন্দু, আছে।

কি ?

বলবার অনেক কথা আছে, কিন্তু ভাবছি কি বলব ? কেমন করে বলব ?

এখন ওসব কথা থাক শমিতা।

তুমি জান কিনা জানি না—দাদার বন্ধু গগনবিহারী চৌধুরী নিহত হয়েছেন—

জানি আমি।

জান ?

হ্যাঁ।

কেমন করে জানলে ?

আজ খবরের কাগজে সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে।

কি—কি লিখেছে তাতে ?

লিখেছে—কোন সন্ধান করা যায়নি এখনও হত্যাকারীর—পুলিস হত্যাকারীর অনুসন্ধান করছে—আর বিখ্যাত সত্যান্বেষী কিরীটী রায় পুলিসকে ঐ ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছেন। পুলিস না পারলেও ঐ ভদ্রলোক যখন ব্যাপারটার মধ্যে মাথা গলিয়েছেন, খুনী ধরা পড়বেই !

পড়বেই !

হ্যাঁ, দেখে নিও। অসাধ্যসাধন করতে পারেন ঐ ভদ্রলোক। ওঁর অনুসন্ধানী

দৃষ্টিতে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

শমিতার বুকটার মধ্যে থেকে একটা ভয়ের স্রোত তার মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে যেন নামতে থাকে। গলাটা শুকিয়ে ওঠে।

হঠাৎ শমিতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি চলি।

কোথায়? বিস্ময়ে অমলেন্দু শমিতার মুখের দিকে তাকায়, সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

বস বস শমিতা, মনে হচ্ছে তুমি যেন অত্যন্ত এক্সাইটেড্ হয়ে পড়েছ—সকাল থেকেই দেখছি তুমি অত্যন্ত চিন্তিত!

আমি যাই—

কি হয়েছে শমিতা, আমাকে সব খুলে বল।

কি—কি বলব?

তোমার যদি কোন চিন্তার কারণ থাকে তো বস। আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

কি সাহায্য তুমি আমাকে করবে?

ব্যাপারটা না জানলে কি করে বলি! বস—হোয়াই ইউ আর সো মাচ্ ডিস্টার্বড! অমলেন্দু একপ্রকার যেন জোর করেই শমিতাকে বসিয়ে দিল আবার চেয়ারটায়।

অমলেন্দু!

বল।

একটা কথা তুমি জান না—

কি?

গগনবিহারীর সঙ্গে আমার একসময় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

জানি আমি।

জান?

হ্যাঁ।

কেমন করে জানলে?

জেনেছি।

তেরো

সুবীর যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

থানার ও. সি'র কড়া নির্দেশ, আপাততঃ তারা কেউ বাড়ি থেকে পুলিসের

বিনানুমতিতে বের হতে পারবে না।

পরের দিন দুপুরের দিকে সুবীর সুবিনয়ের ঘরে এসে বলে, দিস ইজ সিম্প্লি টরচার সুবিনয়!

সুবিনয় চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। সুবীরের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

সুবীর আবার বলে, এভাবে আমাদের এখানে বাড়ির মধ্যে নজরবন্দি করে রাখার মানেটা কি? কাকার মৃত্যুর ব্যাপারে কি ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে নাকি? ডু দে সাসপেক্ট আস!

কিছু তো সেটা অস্বাভাবিক নয় সুবীরদা। মৃদু কণ্ঠে সুবিনয় জবাব দেয়।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

ভেবে দেখ না।

কি ভাবব?

আমরা কজন ছাড়া তো এ বাড়িতে কেউ পরশু রাত্রে ছিলাম না! কাজেই আমাদের ওপরে যদি পুলিসের সন্দেহ পড়েই—

আমরা আমাদের কাকাকে হত্যা করেছি! হাউ ফ্যান্টাসটিক! বাট হোয়াই? কেন—আমরা তাকে হত্যা করতে যাব কেন!

আজ সকালে মিঃ সেন—মামার সলিসিটার এসে কি বললেন শুনেছ তো তুমি! মামার সম্পত্তি ও টাকাকড়ি নেহাত কম নয়!

কোম্পানীর শেয়ার, ইনসুরেন্স, নগদ টাকা ব্যাঙ্কের ও এই বাড়ি সব মিলিয়ে লাখ দুয়েকের বেশী—

তাই সেই অর্থের জন্য আমরা কাকাকে হত্যা করেছি!

না করলেও লোকে তাই ভাববে সহজেই, কেননা ঐ ধরনের ঘটনা তো বিরল নয়।

তার জন্য হত্যা করবো তাকে? ওর যা-কিছু তো সব আমরাই পেতাম।

না।

তার মানে?

আর দুটো দিন দেরি হলে কিছুই পেতাম না। শুনলে না মিঃ সেন বলছিলেন মামা একটা উইল করেছিলেন। তাঁর সব কিছু শমিতা দেবীকে দেবার মনস্থ করেছিলেন এবং সেই উইলে এমন কি তাঁর একমাত্র ছেলেকেও বঞ্চিত করে—

দ্যাট বিচ্! দ্যাট হারলট! সুবীর বললে, ঐ মেয়েমানুষটাই যত নষ্টের মূল।

সুবিনয় মৃদু হেসে বললে, মামা তাকে বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন।

কি করে বুঝলে?

আমার তাই ধারণা।

খুব হয়েছে। হি গট হিজ রিওয়ার্ড। কিন্তু তাই যদি হয় তো আমাকে তারা এভাবে নজরবন্দী করেছে কেন? আমি তো আর সেরাত্রে এ বাড়িতে ছিলাম না।

তাতেই বা কি?

তার মানে?

পুলিস হয়ত ভাবতে পারে—

কি? কি ভাবতে পারে?

কোন এক ফাঁকে নিমন্ত্রণ-বাড়ি থেকে এসে—

ডোণ্ট টক ননসেন্স!

তা তুমি ছটফট করছ কেন সুবীরদা? কটা দিন আমাদের নজরবন্দী করে রাখলেই বা ওরা। চিরদিন তো কিছু আর আমাদের এভাবে রাখতে পারবে না।

কিন্তু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোন ভদ্রলোক চব্বিশ ঘণ্টা এভাবে বাড়ির মধ্যে নজরবন্দী হয়ে থাকতে পারে?

উপায় কি বল! আচ্ছা সুবীরদা?

কি?

রামদেওটা হঠাৎ কোথায় গেল বল তো?

আমার মনে হয় কি জান সুবিনয়!

কি?

ঐ ব্যাটারই কাজ। টাকাপয়সার ব্যাপার নয়—ওর তৃতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী ঐ রুক্মিণীর সঙ্গে কাকার নটঘট দেখে ও বেটা নিশ্চয়ই ক্ষেপে গিয়েছিল। তারপরই শেষ করে দিয়েছে সুযোগমত কাকাকে।

কিন্তু—

সুবীর বলে, তুমি দেখে নিও সুবিনয়, আমি যা বলছি তাই। ঐ বেটাই দিয়েছে মামাকে খতম করে। তারপর গা ঢাকা দিয়েছে।

অবিশ্যি অসম্ভব নয় কিছু।

কাকার যেমন রুচি। একটা চাকরের বৌ, তাকে নিয়েও কিনা—

তুমি কি সত্যিই মনে কর সুবীরদা, মামার সঙ্গে রুক্মিণীর কোন একটা অবৈধ সম্পর্ক হয়েছিল?

হয়েছিল মানে! চব্বিশ ঘণ্টাই তো ঐ মাগীটা কাকার ঘরে থাকত।

কি জানি! আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

লক্ষ্য করে দেখেছ ইদানীং ঐ মাগীটার বেশভূষা—হ্যাকন-ঢ্যাকন—

ওদের কথা শেষ হয় না, বাহাদুর এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী!

কি হয়েছে ?

জ্যাকি তো কিছু খাচ্ছে না। আজ দুদিন থেকে সাহেবের ঘরের সামনে বসে আছে, ওঠে না।

বেচারী! অবোধ প্রাণী—প্রভুর শোকটা ভুলতে পারছে না কিছুতেই। সুবিনয় বলে।

কি করব বাবুজী ? না খেয়ে থাকলে তো ও মরে যাবে।

সুবীরদা ?

কি ?

তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না।

আমি ? আমার হাতে ও খেয়েছে নাকি কোনদিন ?

চেষ্টা করে একবার দেখতে ক্ষতি কি ?

বাইরে ঐ সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল একজোড়া। সুবিনয় আর সুবীর দরজার দিকে তাকাল। অরূপ ও কিরীটী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। অরূপের হাতে একটা ঝোলা।

সুবীর অরূপের দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে অরূপবাবু! আমাদের আর এভাবে কতদিন খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখবেন বলুন তো ?

জবাব দিল কিরীটী, আপনারা যে মুহূর্তে সব সত্যি কথা অকপটে বলবেন তখুনি পুলিসপ্রহরা এখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে সুবীরবাবু!

কি বলতে চান আপনি ?

বলতে চাই, সব সত্য কথা এখনও আপনারা স্পষ্ট করে বলছেন না কেন ?

কোন্ কথাটা আমার বলিনি ? সুবীর বলে।

সে-রাত্রে আপনি রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন সুবীরবাবু ?

বলেছি তো আমার বন্ধুর বোনের বিয়েতে—

আপনার বন্ধু অরিন্দমবাবু বলেছেন—

কি বলেছেন ?

রাত সাড়ে নটা নাগাদ আপনি বরযাত্রীদের দেখাশোনা করবার জন্য দুটো বাড়ির পরের বাড়িতে যেখানে বরযাত্রীরা উঠেছিল সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে আপনি পাঁচ-দশ মিনিটের বেশী ছিলেন না।

কে বললে ?

আমরা খবর পেয়েছি।

বাজে কথা। আমি রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। সুবীর দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

না। ছিলেন না।

আপনি যদি জোর করে বলেন মশাই যে আমি ছিলাম না—

জিতেনবাবুকে আপনি চেনেন? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

কোন্ জিতেন? কে সে?

জিতেন ভৌমিক। আপনার অফিসের সহকর্মী।

হ্যাঁ, চিনি।

তিনি আপনাকে সেরাত্রে দশটা থেকে সোয়া দশটার সময় পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে দেখেছে। কি, কথাটা মিথ্যে?

সুবীর চুপ।

আপনি হোটেল থেকে কখন বের হয়ে যান?

সুবীর চুপ।

কি সুবীরবাবু, জবাব দিচ্ছেন না কেন?

হ্যাঁ, আমি হোটেলে গিয়েছিলাম।

কেন?

ড্রিঙ্ক করতে।

বেশ। কিন্তু সেরাত্রে হোটেল থেকে কখন আপনি বের হয়ে যান?

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

না। তার আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন। কিরীটী শান্তকঠিন গলায় প্রতিবাদ জানায়। বলুন, কখন বের হয়ে গিয়েছিলেন হোটেল থেকে?

মনে নেই।

বেশ। তাহলে বলুন এবার হোটেল থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

বিয়েবাড়িতে।

না। আবারও আপনি সত্য গোপন করছেন। থাক—বলে কিরীটী অরূপের দিকে তাকিয়ে বললে, অরূপ, জুতোজোড়াটা তোমার ঝোলা থেকে বের কর তো!

কিরীটীর নির্দেশে অরূপ ঝোলা থেকে একজোড়া কালো রংয়ের ক্রেপ্ সোলের জুতো বের করল। সুবীর আর সুবিনয় জুতোজোড়ার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জুতোর সোলে কাদা শুকিয়ে আছে।

ঐ জুতোজোড়া কোথায় পাওয়া গিয়েছে জানেন সুবীরবাবু? এই বাড়ির পিছনে একটা গাছের নীচে বাগানের মালির ঘরটার কাছে যে ঘরে জ্যাকিকে আটকে রাখা হয়েছিল—এ জুতোর ছাপও সেই ঘরটার কাছেই বাগানের মাটিতে পাওয়া গিয়েছে। ধর্মের কল কেমন বাতাসে নড়ে দেখুন! সেদিন দুপুরের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে বাগানের মাটি নরম হয়ে গিয়েছিল এবং মাটিতে জুতোর ছাপ যেমন পড়েছে তেমনি জুতোতেও কাদা লেগেছে।

সুবিনয় ও সুবীর দুজনের কারো মুখেই কোন কথাই নেই। দুজনেই যেন একেবারে বোবা।

কিরীটী ওদের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, আপনারা কেউ চিনতে পারছেন এ জুতো-জোড়া, সুবিনয়বাবু?

না

সুবীরবাবু, আপনি?

না।

বাহাদুর! তুমি চিনতে পারছ?

জী সাব্।

কার এ জুতো?

সাহেবের।

গগনবাবুর?

জী হাঁ।

অরূপ, এবার কোটটা বের কর।

অরূপ ঝোলা থেকে একটা কালো টেরিউলের প্রিন্স কোট বের করল।

বাহাদুর, এ কোটটা কার জান?

জী।

কার?

সাহেবের।

সুবীরবাবু, সুবিনয়বাবু—এটাও বাগানে পাওয়া গিয়েছে এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই কোটের গায়ে ও হাতায় রক্ত শুকিয়ে ছিল। সে রক্ত কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে গগনবিহারীর রক্ত বলে।

এতক্ষণে সুবিনয়ই কথা বলে, আপনি এসব কথা আমাদের বলছেন কেন মিঃ রায়? আপনার কি ধারণা আমাদেরই মধ্যে কেউ মামাকে হত্যা করেছি?

না। সেজন্য নয়।

তবে?

আচ্ছা আপনারা সেরাত্রে এ ব্যাপারে কোন চিৎকার বা চেঁচামেচি শোনেননি?

না। তাছাড়া সেরকম কিছু হলে জ্যাকি কি ডাকত না? চুপ করে থাকত?

পুয়োর জ্যাকি ওয়াজ ড্রাগড্! তাকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কোন ওষুধ খাইয়ে আগে থাকতেই নিস্তেজ করে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু সে তো কারো হাতে খায় না। সুবিনয় বলে, জ্যাকি তো মামা ও রামদেওর

হাতে ছাড়া আর কারো হাতেই খেত না।

খেত না ঠিকই। আর সেই যুক্তিতেই হয়ত হত্যাকারী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার সুযোগ খুঁজবে। কিন্তু একটা কুকুরকে কোন কৌশলে একটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নিস্তেজ করা এমন কিছুই কষ্ট নয় সুবিনয়বাব।

আমার মনে হয়—

কি বলুন?

আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তো রামদেওই সে কাজ করেছিল। তার পক্ষেই সেটা বেশী সম্ভব ছিল।

তা ঠিক।

এবং নিশ্চয়ই এখনও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি?

না। তাহলেও তাকে খুঁজে বের করতে পুলিসের অসম্ভব হবে না।

তাই তো আমি ভাবছি, রামদেও নামক রংয়ের তাসটি যখন হঠাৎ টেবিলের উপর এসে পড়বে তখন সত্যিকারের হত্যাকারীর যে বাঁচার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

চোদ্দ

সুবীর বলে ওঠে ঐ সময়, আমি হলপ করে বলতে পারি মিঃ রায়, রামদেওই কাকাকে সেরাত্রে হত্যা করেছে। আপনারও কি তাই মনে হয় না!

হোয়াই ইউ আর সো সার্টেন সুবীরবাবু? কিরীটী মৃদু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে।

কারণ কাকার সঙ্গে রামদেওর যুবতী স্ত্রীর ইল্লিসিট্ কনেকশন ছিল।

সেই কারণেই আপনাদের মনে হয় সে হত্যা করেছে তার মনিবকে?

নিশ্চয়। কে সহ্য করতে পারে—মানে কোন্ পুরুষ সহ্য করতে পারে বলুন নিজের স্ত্রীকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী হতে দেখলে রাতের পর রাত?

আপনার ভুলও তো হতে পারে সুবীরবাবু?

ভুল! না, ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। অন্ততঃ আমি রামদেও হলে তো পারতাম না।

খুন করতেন, তাই না?

খুন? সুবীর যেন চমকে ওঠে।

হ্যাঁ—খুন। সুবিনয়বাবু, আপনি?

জানি না।

যাক সে কথা। আপনারও কি সুবীরবাবুর মতই মনে হয় কাজটা রামদেওরই?

সুবীরদা যা বলেছে তাই যদি হয়—

সুবীরদার কথা থাক্। আমি আপনার কথা জানতে চাইছি।

মানুষ মনের ঐ অবস্থায়—

হত্যাও করতে পারে। আচ্ছা শমিতা দেবী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা সুবিনয়বাবু ?

তাঁকে তো আমি চিনি না। মানে তাঁর সঙ্গে আমার তো কোন আলাপ-পরিচয় নেই।

চেনেন না—মানে তাঁর সঙ্গে হয়ত আপনার কোন আলাপ-পরিচয় নেই সত্যি, কিন্তু দেখেছেন তো তাঁকে বহুবার। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছেনও।

এখানে তিনি প্রায়ই আসতেন। কখনও-সখনও দেখেছি।

আপনার মামার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

ছিল বলেই শুনেছি।

শোনেননি তাঁকে আপনার মামা বিবাহ করবেন বলে স্থির করেছিলেন ?

না।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে গগনবিহারীবাবুর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে, কথাটা কার কাছ থেকে শুনেছিলেন ?

সুধীরদাই বলেছে।

আর কারো মুখে কথাটা শোনেননি ?

রামদেওর মুখেও শুনেছি।

রামদেওর সঙ্গে তাহলে আপনার ঐ সব আলোচনাও হত ?

কি বললেন ?

বলছি হঠাৎ রামদেও সেকথা আপনাকে বলতে গেল কেন ? আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কখনও ?

ঐ -মানে কথায় কথায় হঠাৎ একদিন বলেছিল রামদেও।

হুঁ। রামদেও তাহলে আপনাদের ঘরে আসত ?

তা মধ্যে মধ্যে আসত বৈকি।

রামদেওর স্ত্রী রুক্মিণী আসত না ?

না।

ভাল কথা সুবিনয়বাবু, আপনি আমার প্রশ্নের জবাবে পুলিসের কাছে জবানবন্দীতে বলেছেন—সেরাত্রে শমিতা দেবী নাকি রাত সাড়ে নটা পৌনে দশটা নাগাদ এ বাড়িতে এসেছিলেন !

হ্যাঁ।

আপনি তাঁকে আসতে দেখেছিলেন, না কারো মুখে শোনা কথা ?

দেখেছি।

কেমন করে দেখলেন ? কোথায় দেখেছিলেন ?

আমি সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে মাথার যন্ত্রণার জন্য শুয়ে ছিলাম, তারপর রাত্ত সোয়া নটা নাগাদ প্রিয়লাল ডাকতে আসে খাবার জন্য—

রাত্রে বুঝি খাওয়াদাওয়া তাড়াতাড়ি সারতেন ?

না। সেদিন বিকেলে এসে কোন জলখাবার খাইনি, তাই ঠাকুর আমাকে একটু আগেই খাবার জন্য ডাকতে এসেছিল।

তারপর ?

খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ঢুকে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই সময়ই শমিতা দেবীকে একটা ট্যাক্সিতে এসে গেটের সামনে নামতে দেখি।

সেরাত্রে কোন জ্যোৎস্না ছিল না, অন্ধকার রাত্রি—আপনার এ ঘর থেকেও গেটটা বেশ দূর, ঠিক কি করে চিনলেন যে তিনি শমিতা দেবীই ?

মনে হল। তাছাড়া অত রাত্রে তিনি ছাড়া আর স্ত্রীলোক কে মামার কাছে আসতে পারে ?

যুক্তির মধ্যে আপনার কোন ফাঁক নেই দেখতে পাচ্ছি। কিরীটী মৃদু হেসে কথাটা বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। আচ্ছা সুবিনয়বাবু, আপনি মরালী সঙ্ঘের নাম শুনেছেন ?

শুনেছি।

কার কাছে—আপনার মামার কাছে, না শমিতা দেবীর কাছে ?

ওদের কারো কাছেই না। তবে শুনেছি। ঠিক কার কাছে শুনেছি মনে পড়ছে না।

গেছেন কখনও সেখানে ?

না।

ব্যারিস্টার সত্যেন ঘোষালকে চেনেন ?

না।

তিনি মরালী সঙ্ঘের একজন বড় পেট্রন। নামটা তাঁর শোনেননি তাহলে কখনও ?

না।

আমি কিন্তু ভেবেছিলাম শুনেছেন।

কেন ?

কারণ শমিতা দেবীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

থাকতে পারে, কিন্তু সেকথা আমি জানব কি করে ?

জানা স্বাভাবিক, কারণ শমিতা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল।

আ—আমার ?

হ্যাঁ। আপনি মিথ্যে বলছেন যে তাঁর সঙ্গে আপনার কোন পরিচয় ছিল না।

শমিতা দেবী আপনাকে ঐ কথা বলেছেন ? সুবিনয়ের কণ্ঠস্বরে একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ

পায়—যেটা সে চাপা দিতে সক্ষম হয় না।

কিরীটী শান্ত গলায় বলে, যেমন করেই হোক আমি জেনেছি কথাটা। বলুন সত্যি কি না?

সেরকম কিছু জানাশোনা নেই, তবে—

তবে?

আমার এক বন্ধুর সুপারিশে আমার লেখা একটা নাটক ওঁরা বছরখানেক আগে ওঁদের মরালী সঙ্ঘ থেকে নিউ এম্পায়ারে অভিনয় করেন। সেই সময় দু-চার দিন আমি রিহার্শাল দেখতে গিয়েছি। সেই সময়ই দু-চারদিন দু-চারটে কথা হয়েছিল।

বন্ধুটির নাম কি?

মনোজিৎ ঘোষাল। ঐ ব্যারিস্টার সত্যেন ঘোষালের ছোট ভাই।

তবে একটু আগে যে বললেন ব্যারিস্টার সত্যেন ঘোষালকে আপনি চেনেন না?

মনোজিৎ আমার বন্ধু হলেও তার দাদার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।

হুঁ। তাহলে আপনি একজন নাট্যকারও?

দু-চারটে নাটক লিখেছি।

আপনার মামাবাবু জানতেন কথাটা?

কোন্ কথা?

যে আপনার সঙ্গে শমিতা দেবীর পূর্ব হতেই পরিচয় ছিল?

না। জানতেন না।

শমিতা দেবীও কখনও বলেননি?

বলতে পারি না। তবে ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যে তাঁকে বলতেই হবে!

তা ঠিক। আচ্ছা সুবিনয়বাবু, এবারে আমার আর একটা কথার জবাব দিন।

বলুন?

শমিতা দেবীর প্রতি আপনার কোন দুর্বলতা ছিল?

না, না—এসব কি বলছেন আপনি!

লজ্জার কি আছে এতে? সী ওয়াজ্ ভলাপচুয়াসলি সেক্সি! যে কোন পুরুষের পক্ষেই তাকে দেখে—বিশেষ করে তার সাহচর্যে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই তো স্বাভাবিক। আপনার মনেও সেরকম দুর্বলতা যদি কখনও জেগেও থাকে, আপনাকে নিশ্চয়ই তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। কখনও কোন দুর্বলতা তাঁর প্রতি আপনার জাগেনি বলতে চান? কাম্ অন্—আউট উইথ্ ইট্!

না—না—

ঘরের মধ্যে অন্যান্য সকলে নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে কিরীটী ও সুবিনয়ের প্রশ্নোত্তর

শুনছিল। কিরীটী যে তার আলোচনার ধারাটা কোন্ দিকে নিয়ে চলেছে—সত্যি কথা বলতে কি অরূপ বা সুবীর কেউই বুঝতে পারছিল না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাকপটু কিরীটী যে কোন্ কৌশলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে কেমন করে সুবিনয়কে একেবারে কোণঠাসা করে এনেছিল ওরা সত্যিই প্রথমটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ কিরীটীর শেষ প্রশ্নে অরূপ যেন সজাগ হয়ে ওঠে।

আপনার চোখমুখ, দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠস্বরই বলছে সুবিনয়বাবু—শমিতা দেবীর প্রতি আপনার একটা দুর্বলতা ছিল। অবচেতন মনে তাঁকে ঘিরে আপনার একটা আকাঙ্ক্ষাও ছিল হয়ত।

সুবিনয়ও যেন এতক্ষণে হঠাৎ কিরীটীর শেষ প্রশ্নে সজাগ হয়ে ওঠে। শান্ত গলায় বলে, না। আপনি যদি তা ভেবে থাকেন তো মিঃ রায় সেটা আপনার ভুল।

ভুল কিরীটী রায় করেনি সুবিনয়বাবু। যাক্ গে সেকথা। অরূপ!

অরূপ কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, বলুন?

ওঁদের দুজনকে আর নজরবন্দী করে রাখার তোমার প্রয়োজন নেই। সুবীরবাবু, সুবিনয়বাবু—আপনারা ফ্রি।

সুবীর বললে, ধন্যবাদ।

চল অরূপ, একবার গগনবাবুর শোবার ঘরটা ঘুরে যাওয়া যাক। কিরীটী অরূপের দিকে ফিরে বললে।

চলুন।

দুজনে ওরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ওরা দুজনে সুবীর ও সুবিনয় যেন প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কারো মুখেই কোন কথা নেই। হঠাৎ সুবীর বলে একসময়, তাহলে তোমার সঙ্গে শ্রীমতীর আলাপ ছিল সুবিনয়?

ডোণ্ট টক্ ননসেন্স্ সুবীরদা!

কিন্তু সত্যি বল তো ব্যাপারটা কি? কিরীটীবাবু যা বলে গেলেন—কেমন কেমন যেন মনে হল—

সুবীরদা, তোমারও কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আহা, চটছ কেন সুবিনয়! ব্যাপারটা যদি ঘটেই থাকে সেটা তো এমন কিছু অঘটন নয়। বরং বলতে পার স্বাভাবিকই।

ঐ সব কথা উচ্চারণ করাও পাপ সুবীরদা।

পাপ! কেন?

তুমি জান ওঁর প্রতি মামার কি মনোভাব ছিল—

ও, এই কথা! তা কাকার তো সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছিল। না হলে ঐ বয়সে ঐ সব কেচ্ছা কেউ করে!

ভালবাসার কোন বয়স নেই সুবীরদা।

ওটাকে ভালবাসা বলে না সুবিনয়, ওটা বিকৃত যৌন-লালসা ছিল কাকার। শ্রদ্ধেয় এবং গুরুজন হলেও কথাটা না বলে আমি পারলাম না।

ওসব আলোচনা থাক সুবীরদা। আমার সত্যিই ভাল লাগছে না।

আমি রাজীবকে বিলেতে সব লিখব।

না, না সুবীরদা। তাছাড়া রাজীবদা একদিন সব নিজে থেকেই জানতে পারবে।

তবু আমাদেরও তো কৃতজ্ঞতা বলে একটা বস্তু আছে—

কৃতজ্ঞতা!

নয়? ভেবে দেখ মামা যদি আমাদের এভাবে আশ্রয় না দিতেন?

আশ্রয় আবার কি? আমরা কিছু ভেসে যাচ্ছিলাম না। বরং এখানে এসে থাকার জন্য মিথ্যে খানিকটা লজ্জার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে গেলাম।

লজ্জা!

নয়? ভেবে দেখ, কাকার ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে? সবাই একদিন জানবে।

তা জানে জানুক। তাহলেও আমাদের দিক থেকে আমরা কেন অকৃতজ্ঞ হব।

তোমার যুক্তি আমি মেনে নিতে পারছি না সুবিনয়। আমি আর এখানে থাকছি না।

তুমি চলে যাবে সুবীরদা?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেন?

এখানে থাকার আর কোন অধিকার নেই বলে।

সুবিনয় আর কোন কথা বলে না।

পনের

কিরীটী আর অরূপ দোতলায় উঠে গগনবিহারীর শয়নঘরটার তালা খুলে প্রবেশ করল। ঘরটাতে সেই দিন থেকেই তালা দেওয়া ছিল। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের আলোটা জ্বলছে।

অরূপ দেখতে পায়নি আলোটা। বুঝতে পারেনি কারণ ঘরে জানলায় জানলায় পর্দা টাঙানো থাকলেও পিছনের কাচের সার্সী দিয়ে যে আলো পর্দা ভেদ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিল সেটা পর্যাপ্ত।

কি ব্যাপার মিঃ রায় ?

ঘরের আলোটা জ্বলছে—

তাই তো !

সেদিন এনকোয়ারীর শেষে যখন ঘরে তালা-বন্ধ করে যাও, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাওনি অরূপ ?

গিয়েছিলাম তো। আমি নিজে নিভিয়ে দিয়েছি ঘরের আলো।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে মৃদু কণ্ঠে বললে, গত দুদিনের মধ্যে ঘরে কেউ এসেছিল—

আপনার তাই মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ। এবং যে এসেছিল সে তাড়াতাড়িতে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

কে ? কে আসতে পারে ?

কিরীটী অরূপের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ঐ শয়নঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার জন্য মধ্যবর্তী দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ। দরজার কপাটে হাত দিয়ে ঠেলল কিরীটী। কিন্তু খুলতে পারল না।

ভিতরের দিককার ছিটকিনিটা আটকানো।

কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, অরূপ !

বলুন ?

সেদিন যাবার সময় এই দরজার ছিটকানিটা কি তুলে দিয়ে গিয়েছিলে ?

ঠিক মনে পড়ছে না। অরূপ বলে।

সম্ভবত দাওনি। মনে হচ্ছে এটা খোলাই। দেখা যাচ্ছে দরজাটায় দুদিক থেকেই আটকাবার ব্যবস্থা আছে। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে ওপাশ থেকে দরজাটা খুলে দাও তো।

অরূপ চলে গেল। একটু পরেই ছিটকিনি নামাবার শব্দ হল অন্য ঘর থেকে এবং দরজাটা খুলে গেল।

পাশের ঘরটাই গগনবিহারীর বসবার ঘর।

বসবার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

এখন বুঝতে পারছ অরূপ, কাল বা পরশু কোন একসময় রাত্রে কেউ গগনবাবুর শোবার ঘরে ঢুকেছিল !

মৃদু গলায় কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই কথাগুলো বললে কিরীটী।

রাত্রে এসেছিল ?

হ্যাঁ, এ ঘরের আলোটাই তার সাক্ষী।

কথাটা বলতে বলতে কিরীটী আবার মধ্যবর্তী দরজাপথে শয়নঘরে এসে ঢুকল। অরূপও ওর পিছনে পিছনে আসে।

অরূপ!

বলুন?

ঐ আলমারির চাবিটা কোথায়?

সেদিন তো কোন চাবি পাইনি।

গগনবিহারীর আলমারি ওয়ার্ড্রোব ও দরজার চাবি নিশ্চয়ই ছিল?

থাকাই তো উচিত।

তবে পাওনি কেন?

চাবির ব্যাপার সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কেউ বলতে পারল না।

সুবীর ও সুবিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তাঁরা কি বলেন?

সুবীরবাবু বলেছিলেন, গগনবিহারী নাকি তাঁর চাবির রিংটা সর্বদা নিজের কাছেই রাখতেন। হি ওয়াজ ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট হিজ কীজ।

তবে চাবির রিংটা কি হল?

তারপর একটু থেমে বলে, চাবির রিংটা যে পাওয়া যায়নি তা তো তুমি আমাকে বলনি অরূপ?

তদন্তের রিপোর্টে অবিশ্যি নোট করা আছে ডাইরীতে—তবে আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এখন তাহলে মনে হচ্ছে চাবিটা যে সরিয়েছিল সে-ই হয়ত কাল বা পরশু কোন এক সময় রাত্রে এই ঘরে এসেছিল। ভাল কথা, আর একটা খবর শুনেছ?

কি?

গত পরশু রাত থেকে শমিতা দেবী নিরুদ্দিষ্ট।

সে কি. কে বলল?

তাঁর দাদা যোগজীবনবাবু।

কিরীটী অতঃপর সেরাত্রের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে গেল।

মিঃ রায়!

বল?

আচ্ছা ঐ শমিতা দেবীই কি—সেরাত্রে—

গগনবিহারীকে হত্যা করেছে কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক সেরাত্রে কোন একসময় শমিতা দেবী এই ঘরে এসেছিল।

কিন্তু তিনি তো ভেইমেণ্টলি—

অস্বীকার করেছেন। ঠিকই। তাহলেও যে প্রমাণ সে রেখে গিয়েছিল ঘরে এবং যে প্রমাণ সে তার দেহে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল—সেই দুটোর যোগফল যে দুয়ে দুয়ে চার সেটা তো আর অস্বীকার করতে পারবে না! কিন্তু কথা হচ্ছে, কখন এসেছিল সে? কত রাত্রে? এবং তখন আর কেউ এ ঘরে ছিল কিনা? শোন অরূপ, শমিতা দেবীকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে—যেমন করেই হোক।

যদি কলকাতা ছেড়ে তিনি চলে গিয়ে থাকেন?

না, তা যায়নি। আর যাবেও না আমার ধারণা। অন্ততঃ গগনবিহারীর মৃত্যুর ব্যাপারটার উপর একটা সমাপ্তির যবনিকা না নেমে আসছে যতক্ষণ।

গগনবাবুর বন্ধু মানে ঐ যোগজীবনবাবু—ওর দাদা কি বলছেন?

তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। কে—কে ওখানে? কথাটা বলতে বলতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুই ঘরের মধ্যবর্তী আধভেজানো দরজাটার দিকে ছুটে যায়, দড়াম করে ঠেলে দরজাটার কপাট দুটো খুলে ফেলে কিরীটী। চকিতে একটা রঙিন বস্ত্র যেন মনে হল পাশের ঘরের বাইরে যাবার দরজাপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটী ছুটে যায় সেই দরজাটার দিকে এবং চেঁচিয়ে ওঠে, রুক্মিণী!

রুক্মিণী দাঁড়াল না। সে তার ঘরে ঢুকে গেল। রুক্মিণীর অপস্রিয়মাণ শাড়ির অঞ্চল-প্রান্তটা অরূপেরও নজরে পড়ল। কিরীটী এগিয়ে গেল রুক্মিণীর ঘরের দিকে—কারণ বসবার ঘরের পরের ঘরটাই রুক্মিণী ও রামদেওর ঘর।

রুক্মিণী তাড়াতাড়িতে দরজাটা বন্ধ করতে পারেনি। কিরীটী খোলা দরজাপথে রুক্মিণীর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অরূপও। দুজনেই দেখতে পেল শয্যার উপর রুক্মিণী শুয়ে, চোখে-মুখে আঁচল চাপা। তার বুকের কাছটা ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে।

কিরীটী নিঃশব্দে মুহূর্তকাল শায়িত রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় ডাকল, রুক্মিণী!

রুক্মিণী সাড়া দেয় না।

রুক্মিণী, উঠে বস। হিন্দীতেই কিরীটী বলে, আমি জানি তুমি জেগে—উঠে বস।

শির মে বহুৎ দরদ বাবুজী। কোঁকাতে কোঁকাতে রুক্মিণী বলে। ওঠে না—চোখও মেলে না।

ওঠ—ওঠ বলছি।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের নির্দেশে রুক্মিণী আর শুয়ে থাকে না। উঠে বসে খাটের উপর। ঐ ঘরটাও বেশ সাজানো-গোছানো।

একপাশে একটা কাঠের আলমারি, দেওয়ালে একটা প্রমাণ-আরশি। বড় সাইজের একটা খাট। একটা আলনা। তার উপরে শাড়ি ও জামা ভাঁজ করা। গোটা-দুই প্যান্ট ও শার্টও আছে। একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক।

কেয়া বাত বাবুজী! কোঁকাতে কোঁকাতে রুক্মিণী আবার বলে।

পাশের ঘরে গিয়েছিলে কেন?

হায় রাম! আমি তো শুয়েছিলাম শির দরদ করছিল বলে। আমি তো যাইনি।

মিথ্যে কথা বলে কোন লাভ নেই। বল, কেন গিয়েছিলি?

হায় রাম! সাচ্ বলছি বাবুজী—

যাসনি তুই?

গঙ্গামাঈকি কসম বাবুজী—

চাবিটা কোথায়

চাবি?

হ্যাঁ। তোর সাহেবের আলমারির চাবি। কোথায় আছে বের করে দে।

সে হামি কি জানি?

তোর কাছেই আছে। বের কর্। নাহলে দারোগা সাহেব এখুনি তোকে থানায় ধরে নিয়ে যাবে।

রুক্মিণী চুপ করে থাকে।

অরূপ যাও, নীচে যে সেপাই পাহারায় আছে তাকে আন। ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতঘরে বন্দী করে রাখ।

রুক্মিণী তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে, কেন বাবুজী—হামার কি কসুর হল?

তুই তোর সাহেবের আলমারির চাবি চুরি করেছিস।

না।

আবার ঝুট্ বলছিস?

নেহি—ঝুট্ নেহি—

ওর ঘরটা সার্চ কর তো অরূপ!

পাওয়া গেল না। রুক্মিণীর ঘরের সব কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন চাবি পাওয়া গেল না। কিন্তু চাবি না পাওয়া গেলেও, রুক্মিণীর ট্রাঙ্কের মধ্যে বেশ ভারি ওজনের একজোড়া সোনার বালা, কিছু দামী প্রসাধন দ্রব্য, গোটা-দুই দামী শাড়ি ও একটা ছোট টিনের কৌটোর মধ্যে পাওয়া গেল একশো ও দশ টাকার নোট মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজারের মত টাকা।

ঐ টাকা কার? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হায় রাম! কার আবার—আমার!

তুই তো মাইনে পেতিস না—অত টাকা তুই কোথায় পেলি?

আমি—আমি—কেমন থতমত খায় রুক্মিণী।

বল্, কোথায় পেলি? তোর সাহেব তোকে দিয়েছিল—তাই না?

না। রামদেও আমার মরদ—

আবার ঝুট্ বলছিস! সাহেবের সঙ্গে তোর গোপন আশনাই ছিল—সাহেব তোকে দিয়েছে।

রুক্মিণী চুপ।

শোন্, এখনও সব কথা খুলে বল্—না হলে এখুনি তোকে থানায় পাঠাব।

গঙ্গামাঈকী কসম্—আমি কিছু জানি না বাবুজী। তোর গোড় লাগি—

রামদেও—তোর মরদ কোথায়?

কেমন করে জানব?

তুই জানিস সে কোথায়?

না, জানি না।

রামদেওর কোন ফটো আছে?

আছে। ছিল তো ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে।

কোথায়? তোর বাক্সের মধ্যে তো পাওয়া গেল না?

তবে আমি জানি না।

ঠিক আছে। অরূপ ওকে নিয়ে গিয়ে হাজতে রাখ। আর খবরের কাগজে রামদেও ও শমিতার নামে বিজ্ঞাপন দাও তাদের বর্ণনা দিয়ে।

রুক্মিণী চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়, তাকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুবীর আর সুবিনয় এসে সিঁড়ির নীচে দাঁড়ায়।

সুবীর জিজ্ঞাসা করে, ওকে অ্যারেস্ট করলেন নাকি দারোগাবাবু?

হ্যাঁ। অরূপ জবাব দেয়।

আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ও মাগীই যত নষ্টের গোড়া। সুবীর বলে।

সুবিনয় কিন্তু কোন কথা বলে না।

সে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ষোলো

ঐ ঘটনার চারদিন পরে।

অরূপ থানায় তার অফিস-ঘরে বসেছিল, বেলা তখন সকাল দশটা হবে।

হাতে ধরা একটা ভাঁজকরা সংবাদপত্র। শমিতা এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

আপনিই তো এ থানার ও. সি. মিঃ মুখার্জী?

হ্যাঁ মিস সান্যাল, আসুন!

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আমি নিরুদ্দিষ্ট বলে, কি ব্যাপার? এসবের অর্থ কি?

বসুন মিস সান্যাল!

না! আমি বসতে আসিনি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার উদ্দেশ্যটা জানতে এসেছি। বলুন কি ব্যাপার?

কিরীটী রায়ই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন, কারণ তাঁরই নির্দেশে ডি. সি. বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন!

বেশ, আমি তাহলে তাঁর কাছেই যাচ্ছি।

যেতে হবে না, আমি তাঁকে ফোনে ডাকছি। বসুন আপনি।

না। আমি সেখানেই যাচ্ছি।

বসুন, বসুন—ব্যস্ত হবেন না মিস সান্যাল! মনে হচ্ছে বিজ্ঞাপনটা কাগজে দেওয়ায় আপনি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

তা যদি হয়েই থাকি, খুব অন্যায় হয়েছে কি? কোথায় কে খুন হয়েছে সেই ব্যাপারের সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে কাগজে কাগজে ঐ ধরনের বিজ্ঞাপন দিলে সেটার অর্থ যে কি দাঁড়ায় নিশ্চয়ই সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না?

নিশ্চয়ই না।

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ দুজনেই দরজার দিকে ফিরে তাকাল।

মিঃ রায়! আপনি এসে গেছেন ভালই হল। আমি আপনাকে আসবার জন্য ফোন করার কথা ভাবছিলাম। অরূপ বলে।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে অমলেন্দুবাবুর ফোনে জানতে পারলাম শমিতা দেবী তাঁর কাছেই আছেন, তাই এসেছিলাম অরূপ তোমাকে নিয়ে তাঁর ওখানে যাব বলে, তা দেখছি উনি নিজেই এসে গিয়েছেন। কিন্তু মিস সান্যাল, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন। কিরীটী বললে।

না। বসবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি কেন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সেটা জানতে পারলেই আপাতত খুশি হব। একটু যেন কঠিন কণ্ঠেই কথাগুলো বলে শমিতা।

আপনি তাহলে বিজ্ঞাপনটা দেখেই এসেছেন? কিরীটী শুধায় শমিতাকে।

হ্যাঁ। নচেৎ আপনি কি মনে করেন সোস্যাল ভিজিট দিতে এসেছি থানায়?

নিশ্চয়ই না। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা তো দিন তিনেক হল বের হয়েছে। আপনি তাহলে আরও আগে আসেননি কেন জানতে পারি কি?

স প্রশ্নের জবাব আমি দিতে প্রস্তুত নই।

শ, দেবেন না। কিন্তু প্রশ্নটা স্বাভাবিক বলেই করেছিলাম।

স কথা রেখে এখন বলুন কেন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন? আপনি কি মনে করেন

ই

আমিই সে রাত্রে গগনবিহারীকে হত্যা করেছি?

যদি সেটা ভাবিই তাহলে কি খুব অন্যায় হবে মিস সান্যাল? শান্ত গলায় কিরীটী উচ্চারণ করল।

কিরীটীর স্পষ্টোক্তিটা হঠাৎ যেন শমিতাকে স্তব্ধ করে দেয়। শমিতা কয়েক সেকেণ্ড কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আই সী! তা হঠাৎ আমাকে সন্দেহ করলেন কেন জানতে পারি কি?

প্রথমতঃ আপনি পুলিসের কাছে যে জবানবন্দি দিয়েছেন সেদিন এবং আমাকেও যা বলেছেন সেটা অকপট সত্য নয়।

মানে!

মানে আপনি খুব ভালভাবেই সেটা জানেন এবং দ্বিতীয়তঃ আপনার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া—

নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছি এ ধারণা আপনার হল কেন?

ব্যাপারটা সাদা চোখে বিচার করতে গেলে তাই কি মনে হয় না? ভয় পেয়ে আপনি হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন?

গা-ঢাকা দিয়েই যদি থাকি, নিশ্চয়ই তাহলে আজ নিজে এখানে আসতাম না!

যাক সে-সব কথা। কয়েকটা প্রশ্নের আমার জবাব দেবেন কি?

কি প্রশ্ন?

এক নম্বর, সেরাত্রে মানে দুর্ঘটনার রাত্রে, আপনি রাত পৌনে দশটা নাগাদ মরালী সংঘ থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

কোথায়ও আমি বের হইনি ঐ সময়, বের হয়েছিলাম রাত সাড়ে বারোটায়।

না। পৌনে দশটায় বের হয়ে আবার রাত বারোটা নাগাদ আপনি ক্লাবে ফিরে যান। এবং সে প্রমাণও আমাদের হাতে আছে।

প্রমাণ?

হ্যাঁ। আপনি ব্যারিস্টার সত্যেন ঘোষালের গাড়ি চেয়ে নিয়ে, বিশেষ কাজ আছে একটু—বলে রাত পৌনে দশটা নাগাদ ক্লাব থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ক্যান ইউ ডিনাই ইট্?

শমিতা যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

বলুন? কোথায় গিয়েছিলেন সে রাত্রে?

বাড়িতে গিয়েছিলাম একটা জরুরী কাগজ আনতে ক্লাবের—

আবার সত্য গোপন করছেন! আপনি যে কোথায় গিয়েছিলেন আমি জানি।

কোথায় ? কেমন যেন থতমত খেয়ে কথাটা উচ্চারণ করল শমিতা।

গগনবিহারীর ওখানে।

ইট্‌স এ ড্যাম লাই !

না—ইট্‌স এ ফ্যাক্ট। এবং সুবিনয়বাবু আপনাকে দেখেছেন। বলুন কেন গিয়েছিলেন ?

আমি যাইনি।

গিয়েছিলেন। নাউ টেল্ মি হোয়াই ?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

জানি। কিন্তু কেন ? সাতদিন পরে হঠাৎ কেন গিয়েছিলেন তাঁর কাছে ?

গগনবাবু আমাকে ক্লাবে ফোন করেছিলেন বিশেষ কারণে একবার দেখা করার জন্য।

দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ?

না !

কেন ?

আমি ঘরে ঢুকে দেখি—

কি ?

হি ওয়াজ ডেড! সারা মেঝেতে রক্ত।

আমারও অনুমান তাই। কিন্তু সত্যি কথাটা যদি সেদিন বলতেন তবে হয়ত কটা দিন আমাদের অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হত না। হত্যাকারীকে আগেই স্পট আউট করা সম্ভবপর হত।

আপনারা বিশ্বাস করবেন না তাই বলতে সাহস পাইনি।

হুঁ। আচ্ছা এবারে বলুন, গগনবাবু যে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে আপনাকে দিতে মনস্থ করেছিলেন তা আপনি জানতেন, তাই না ?

জানতাম। কারণ ঐ লম্পটা আমাকে ঐ সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে—

বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বোধ হয় ?

না।

তবে ?

হি ওয়ানটেড টু এন্‌জয় মি। আর সেটা বুঝতে পেরেই—

ঝগড়া করে বের হয়ে এসেছিলেন সাতদিন আগে !

হ্যাঁ।

আর সুবিনয়বাবু ?

সুবিনয় !

হ্যাঁ। তাঁর আপনার প্রতি দুর্বলতা ছিল, না ?

হি ইজ্ অ্যান ইম্‌বেসাইল ফুল, একটা নীরেট গর্দভ। ছুটো হেসে কথা বলতাম বলে তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার প্রেমে আমি মজে গিয়েছি।

আর সত্যেন ঘোষাল?

হি ইজ্ এ গুড ফ্রেণ্ড অফ মাইন্।

তাঁর প্রতি আপনার কোন দুর্বলতা ছিল না?

কোনদিনও না। আর কিছু আপনার জানবার আছে?

আছে।

আর কি জানতে চান বলুন?

সেকথা জিজ্ঞাসা করবার আগে আপনাকে নিয়ে একবার গগনবাবুর বাড়িতে আমরা যেতে চাই।

গগনবিহারীর ওখানে! বাট্ হোয়াই? কেন?

সবার সামনে একটা মোকাবিলা হওয়া আমাদের সকলেরই প্রয়োজন, তাই—

মোকাবিলা! কিসের?

সেখানে গেলেই সব জানতে পারবেন। আপত্তি আছে?

না। চলুন।

এখন নয়।

তবে কখন?

আজ রাত ঠিক দশটায়।

রাত দশটায়?

হ্যাঁ। আসতে পারবেন না?

পারব। কিন্তু—

বলুন?

আপনি কি এখনও আমার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না?

না পারলে নিশ্চয়ই এখন আপনাকে ছেড়ে দিতাম না আমরা। আর আপনাকে আটকাব না, এখন আপনি যেতে পারেন।

শমিতা বের হয়ে যাচ্ছিল, কিরীটী পশ্চাৎ থেকে আবার ডাকল, একটা কথা শমিতা দেবী—

বলুন?

অমলেন্দুবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

কেন? তাকে দিয়ে কি হবে?

আপনারা দুজনেই জানেন আপনারা পরস্পর কেউ আপনাদের এখনও ভুলতে পারেন

নি। ভুল-বোঝাবুঝি যদি একটা অতীতে হয়েই থাকে সেই ভুলটারই জের টেনে চলতে হবে বাকী জীবনটা তারই বা কি মানে আছে!

শমিতা আর কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে বার হয়ে যায়।

শমিতা ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাবার পর কিরীটী বললে, সত্যি অরূপ, যোগজীবনবাবুর কাছে যেন আমি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ করছিলাম ঘটনাচক্রে ব্যাপারটার সঙ্গে আকস্মিক ভাবে জড়িয়ে যাওয়ায়।

আপনি কি জানতেন যে শমিতা দেবী হত্যাকারী নয়?

জানতাম।

জানতেন?

জানতাম বৈকি। নচেৎ প্রথম দিনই তোমাকে বলতাম ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য।

কিন্তু জানলেন কি করে যে উনি সে-রাত্রে গগনবিহারীর ঘরে গিয়েছিলেন?

মনে পড়ে তোমার, মৃতের হাতে একটুকরো কাচের চুড়ি পেয়েছিলাম?

মনে আছে বৈকি।

সেই ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো ও শমিতা দেবীর ডান হাতের কব্জীতে প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা গোপন ক্ষতচিহ্নটাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল সে-রাত্রে শমিতা দেবী গগনবিহারীর ঘরে গিয়েছিল।

কাচের চুড়িটা যে ওর হাতেই ছিল তার প্রমাণ কি?

যোগজীবনবাবুই বলেছিল, দুর্ঘটনার দিন দুই আগে শমিতার এক বান্ধবী কাশী থেকে কিছু কাচের চুড়ি এনে ওকে দেয়। সেগুলো তার হাতেই ছিল। অবিশ্যি প্রশ্ন করে সংবাদটা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে যোগজীবনবাবুর কাছ থেকে।

কিন্তু তাই যদি হয় তো—শমিতা দেবী যা বলে গেলেন তা কেমন করে সত্য হয়? উনি তো ঘরে ঢুকে তাঁকে মৃত দেখেছিলেন!

না—দেখেনি।

তবে?

গগনবিহারী তখনও বেঁচেই ছিলেন। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো—

কি?

তার উপস্থিতিতেই গগনবিহারী নিহত হন।

তবে নিশ্চয়ই শমিতা দেবী হত্যাকারীকে দেখেছিলেন সে-রাত্রে?

সম্ভবত দেখেনি।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়।

সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে আজ রাত্ দশটায়। যে ঘরে হত্যা হয়েছিল সেই ঘরেই

হত্যাকারীকে আমার ধারণা আজ রাত্রে আমরা খুঁজে পাব। যা হোক, তুমি কিন্তু প্রস্তুত হয়ে যেও অরূপ।

যাব। কিন্তু—

আর কিন্তু নয়—রাত দশটায় আজ। চলি এখন।

কিরীটী উঠে পড়ল।

সতের

রাত দশটায়।

সেই গগনবিহারীর গৃহে। তাঁর শয়নকক্ষ—যে কক্ষে কয়েক রাত্রি আগে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত যোগজীবনবাবু, অমলেন্দুবাবু, শমিতা দেবী, সুবীর, সুবিনয়, বাহাদুর, কিরীটী, অরূপ ও ডাঃ অধিকারী—কিরীটীর পরিচিত একজন ডাক্তার।

কিরীটী সম্বোধন করে বলে, আপনারা সকলেই হয়ত একটু অবাক হয়েছেন কেন এভাবে সকলকে আপনাদের আমরা এ সময় এই ঘরে আসতে বলেছিলাম কথাটা ভেবে। আসতে বলেছিলাম এই কারণেই যে—কিরীটী একটু থেমে আবার বলে, আমরা মানে অরূপবাবু, গগনবিহারীর হত্যাকারী কে জানতে পেরেছেন। হি ওয়ান্টস্ টু আনমাস্ক হিম্ বিফোর অল্ অফ ইউ!

সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

একটা ভয়—একটা সন্দেহ যেন সকলেরই দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সব কথা বলবার আগে শমিতা দেবী, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, সে রাত্রে গগনবাবুর টেলিফোন পেয়ে এ-ঘরে পা দেবার পর কী আপনি দেখেছিলেন –কী হয়েছিল বলুন?

আমি তো সকালেই বলেছি।

আপনি বলেছেন গগনবাবুকে আপনি মৃত দেখেন। কিন্তু তা তো নয়। হি ওয়াজ স্টীল লিভিং—তখনও তিনি বেঁচেই ছিলেন এবং সে-সময় তিনি ফুল্লি ড্রাঙ্কড্। বদ্ধ মাতাল। কি, তাই নয়?

শমিতা বোবা। পাথর।

বলুন? আমার কথা কি মিথ্যে?

না, তিনি বেঁচেই ছিলেন।

এবং আপনার উপস্থিতিতেই হি ওয়াজ স্ট্যাব্‌ড।

হ্যাঁ। কিন্তু আমি—আমি হঠাৎ ঘর অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় বুঝতে পারিনি কে তাকে

ছোরা মেরেছিল।

সব বলুন।

ঘরে ঢুকতেই গগনবাবু বলেন তাঁকে বিয়ে করার জন্য—বিয়ে করলে সব সম্পত্তি তিনি আমার নামে লিখে দেবেন।

শমিতার বিবৃতি।

শমিতা ঝড়ের মতই এসে ঘরে ঢুকেছিল, ফোন করেছিলেন কেন?

শমি, এস। গগনবিহারী দু হাত বাড়িয়ে দেন শমিতার দিকে।

ডোণ্ট টাচ মি।

ডোণ্ট বি ক্রুয়েল মাই ডার্লিং। আই লাভ ইউ। আই ওয়াণ্ট ইউ—বলে টলতে টলতে গিয়ে গগনবিহারী দু হাতে জাপটে ধরেন শমিতাকে বুকের উপরে।

দুজনে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। তারপরই হঠাৎ গগনবিহারী একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠেন। ঠিক ঐ সময় ঘরের আলোটা দপ্ করে নিভে যায়।

গগনবিহারীর আলিঙ্গন শিথিল হয়ে যায়। তিনি মাটিতে পড়ে যান। কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর স্তব্ধ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা। তারপর একসময় আলোটা জলতেই তার নজরে পড়ে—রক্তের স্রোতের মধ্যে গগনবিহারী পড়ে। ঘরময় কাচের চুড়ি। শমিতার ডান হাতের কব্জীতেও কেটে গিয়েছে, শমিতা ভয়ে তাড়াতাড়ি ভাঙা চুড়িগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে যখন পালাতে যাবে সিঁড়িতে রামদেওর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

শমিতা থামল।

তারপর? কিরীটী শুধায়।

আমি প্রথমে বাড়ি যাই। সেখান থেকে আবার ক্লাবে ফিরে যাই। এর বেশী কিছু আর আমি জানি না। বিশ্বাস করুন—

অরূপ!

বলুন।

রামদেওকে নিয়ে এস এ ঘরে।

অরূপ বের হয়ে গেল।

রামদেও! অর্ধোস্ফুট কণ্ঠে সুবীর বলে।

হ্যাঁ। সুবীরবাবু, দুর্ভাগ্য খুনীর, রামদেও ধরা পড়েছে পরশু রাত্রে মোকামা জংশনে। বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলে, উঁহু সুবিনয়বাবু, দরজার দিকে এগুবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। দি ক্যাট্ ইজ অলরেডি আউট অফ দি ব্যাগ! তাছাড়া এ বাড়ির চারদিকে পুলিশ!

অরূপ এসে ঘরে ঢুকল রামদেওকে সঙ্গে নিয়ে। মাত্র কটা দিনেই লোকটার চেহারা যেন শুকিয়ে গিয়েছে। একমুখ দাড়ি, রুক্ষ চুল, মলিন বেশ, চোখের কোলে কালি। বিষণ্ণ, ক্লান্ত।

অরূপ, তুমি সঙ্গে করে যে লৌহবলয় এনেছ—সে দুটি আমাদের সুবিনয়বাবুর হাতে আপাতত পরিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত কর।

কিরীটীর কথায় অরূপ যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

সুবিনয় বলে ওঠে, এসবের মানে কি কিরীটীবাবু? আপনার কি ধারণা আমিই মামাকে হত্যা করেছি?

ধারণা নয় সুবিনয়বাবু—ইটস্ এ ক্রুয়েল ফ্যাক্ট! কই অরূপ—

অরূপ এগিয়ে সুবিনয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

সুবীর বলে ওঠে ঐ সময় এতক্ষণ পরে, সুবিনয় তুমি! তুমিই তাহলে কাকাকে খুন করেছ?

এ মিথ্যে—মিথ্যে সুবীরদা। চেঁচিয়ে ওঠে সুবিনয়, ইট ইজ প্রিপ্রোস্টারাস!

কিরীটী এবারে রামওদেওর দিকে তাকাল, রামদেও!

রামদেও কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

ডাঃ অধিকারী?

বলুন।

সঙ্গে আপনার সিরিঞ্জ ও পেথিডিন অ্যাম্পুল একটা এনেছেন তো—যা আনতে বলেছিলাম?

হ্যাঁ।

রামদেওকে একটা পেথিডিন ইনজেকশন দিন।

সবাই নির্বাক।

ডাঃ অধিকারী কিরীটীর নির্দেশে রামদেওকে একটা পেথিডিন ইনজেকশন দিয়ে দিলেন।

মিনিট কয়েক পরেই রামদেওর চেহারার পরিবর্তন হয়।

চোখের মণি দুটো চকচক করতে থাকে।

রামদেও? কিরীটী আবার ডাকে।

জী!

বল সে রাত্রে তুমি কেন পালিয়েছিলে? আমি বলছি তুমি তোমার সাহেবকে খুন করনি—তুমি নির্দোষ।

আমি খুন করিনি।

বললাম তো, আমি তা জানি।

আমিও সে রাত্রে বার বার বাবুজীকে (সুবিনয়কে দেখিয়ে) বলেছিলাম, আমি কিছু জানি না, আমি খুন করিনি—কিন্তু উনি বললেন, উনি দেখেছেন আমাকে খুন করতে সাহেবকে। পুলিসকে উনি বলে দেবেন। সেই ভয়েই আমি পালাই।

আঠারো

কিরীটী বলছিল।

রুক্মিণীর যৌবন তিনজনকে আকর্ষণ করেছিল। প্রৌঢ় গগনবিহারী আর যুবক সুবিনয় ও সুবীর। তবে সুবীর ভীতু প্রকৃতির। কিন্তু রুক্মিণী গভীর জলের মাছ। সে কারও কথা কারও কাছে না বলে দুজনকেই নিয়ে খেলিয়েছে। রামদেও মিলিটারি ফেরতা রগচটা লোক—ব্যাপারটা কোনক্রমে জানতে পারলে ছোরা বসিয়ে দেবে বুকে। তাই সুবিনয় কৌশলে রামদেওকে পেথিডিনে অ্যাডিক্ট করে ক্রমশঃ তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে। সুবীর ভীতু প্রকৃতির আগেই বলেছি—সে বেশীদূর অগ্রসর হবার সাহস পায়নি—কাজেই সুবিনয়ের আরও সুবিধা হয়ে যায়।

তারপর? অরূপ জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু গোপন প্রেমের যা শেষ পরিণতি—শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। গগনবিহারী ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিলেন। এবং সে জানাটা আদৌ তাঁর পক্ষে আনন্দের হয়নি। আর কেউ না—তাঁরই আশ্রিত এবং তাঁরই ভাগ্নে তার লালসার ভোগে ভাগ বসাচ্ছে জানতে পেরে নিশ্চয়ই ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। ফলে তিনি সুবিনয়কে ডেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

কবে? অরূপ প্রশ্ন করে।

কিরীটী বললে, যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে সেইদিন সকালে।

জানলেন কি করে?

ঠাকুর প্রিয়লালের কাছে। ঐদিন সকালে অফিস যাবার আগে খেতে বসে সুবিনয় বলেছিল প্রিয়লালকে, পরের দিনই সকালে সে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তারপর?

কিন্তু সুবিনয় মুখে যাই বলুক রুক্মিণীর উগ্র রূপ ও যৌবন যার স্বাদ সে পেয়েছিল সেটা ভুলে যাওয়া বা সে লোভ দমন করা সুবিনয়ের পক্ষে তখন আর সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া জগতে বিশেষ একশ্রেণীর নারী আছে যারা পুরুষকে একেবারে কুক্ষিগত করে ফেলে তাদের যৌন আবেগ দিয়ে, একবার কোন পুরুষ তার বাহুবন্ধনে ধরা দিলে। সুবিনয়েরও হয়েছিল তাই—ঐ রুক্মিণীও হচ্ছে সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক। তাই শেষ পর্যন্ত রুক্মিণীকে হারাবার ভয়ে সুবিনয় ডেসপারেট হয়ে ওঠে।

ওরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল।

অরূপ বলে, আশ্চর্য! মানুষটাকে দেখে একবারও মনে হয় না ঐ প্রকৃতির—

ওরা হচ্ছে বর্ণচোরা আম। তাই তো প্রথমটায় আমার ধোঁকা লেগেছিল। কিন্তু তিনটে ব্যাপার আমার মনকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। এক নম্বর, জ্যাকিকে ওষুধ দিয়ে নিস্তেজ করে ফেলা। আর দু নম্বর, সে-রাত্রে সুবিনয়ের গৃহে উপস্থিতি। এবং শেষ তিন নম্বর, যে ভাবে গগনবিহারীকে আমূল ছোরা বিঁধিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেটা কোন শক্তিশালী লোক ছাড়া সম্ভব ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার অ্যানালিসিস শুরু করি। প্রথমত কার কার পক্ষে গগনবিহারীকে হত্যা করা সম্ভব ছিল ভাবতে গিয়ে এবং সমস্ত ব্যাপারটা ও গগনবিহারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছিল চারজনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল—রুক্মিণী, শমিতা, রামদেও ও সুবিনয়। রুক্মিণীকে বাদ দিয়েছিলাম হিসাব থেকে এই কারণে যে তার কাছে গগনবিহারী ছিল স্বর্ণডিম্বপ্রসবকারী হংস। কাজেই সে গগনবিহারীকে হত্যা করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ঐভাবে আমূল ছোরা বিঁধিয়ে তার মত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে হত্যা করাও সম্ভব ছিল না। তারপর শমিতা। গগনবিহারীর হাতের মুঠোয় ভাঙা চুড়ি ও শমিতার হাতের ক্ষত যদিও উভয়ের মধ্যে একটা স্ট্রাগলের সম্ভাবনা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল কিন্তু সেও নারী। একই কারণে রুক্মিণীর মত তাকেও আমি হিসাব থেকে বাদ দিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর রামদেও। গগনবিহারীকে এত বোকা ভাবতে পারি না যে তিনি রামদেওর চোখের উপরেই তার বৌকে সম্ভোগ করবেন। তাছাড়া সে গগনবিহারীকে হত্যা করলে তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকেও বাদ দিত না। তাকেও ঐ একই সঙ্গে শেষ করে দিত। তাহলে বাকি থাকে সুবিনয়। সন্দেহটা সুবিনয়ের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার চেহারা, তার উপস্থিতি সে রাত্রে ও সে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ্—সব মিলিয়ে আমার মনকে সজাগ করে তোলে। তারপর জ্যাকিকে ওষুধ দিয়ে নিস্তেজ করা—রামদেও ধরা পড়বার পর সেও অ্যাডিক্টেড জানতে পেরে আমার কোন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। অবিশ্যি তার আগেই শমিতা দেবীর কিছুটা সত্য বিবৃতিও সেদিন থানায় আমার সন্দেহকে ওর ওপরে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। যাক, এবারে আসল ঘটনায় আসি।

কিন্তু একটু থেমে আবার শুরু করল, সুবিনয় সম্ভবত রুক্মিণীর মুখেই গগনবিহারী ও শমিতার সব ব্যাপারটা ও ঝগড়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল আর সেইটাই সে শেষ মুহূর্তে কাজে লাগায়।

কি ভাবে? অরূপ শুধায়?

সুবিনয়ই ফোন করেছিল শমিতাকে ক্লাবে। গগনবিহারী নয়। আমার ধারণা—

কারণ সে শমিতার উপরে দোষটা চাপাবার জন্য তাকে অকুস্থলে টেনে নিয়ে আসে। শমিতা আসতেই তারপর যা যা ঘটেছিল সেও শমিতার মুখেই তোমরা শুনেছ। যখন দুজনে ঝটাপটি চলেছে তখন পশ্চাৎ দিক থেকে সুবিনয় গগনবিহারীকে ছোরা মেরেই ঘর ছেড়ে যাবার আগে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়। কাজেই শমিতা সুবিনয়কে দেখতে পায়নি। সব ব্যাপারটা রুক্মিণী জানতে পেরেছিল অবিশ্যি, কিন্তু সেও ভয়ে মুখ খোলেনি। গগনবিহারীর কোট ও জুতোটা আগে থাকতেই সরিয়ে রেখেছিল সুবিনয়। একটা গায়ে ও একটা পায়ে দিয়ে হত্যা করেছিল যাতে পুলিসের কুকুর ও জ্যাকিকেও ধোঁকা দিতে পারে। সর্বশেষে পেথিড্রিনে অ্যাডিক্টেড, সম্পূর্ণ তার হাতের কব্জাতে, রামদেওকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ আটঘাট বেঁধেই—প্ল্যান করে সব কিছু করেছিল সুবিনয়, কিন্তু এত করেও সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না, সে নিজের ভুলের ফাঁদেই নিজে আটকে পড়ল।

*

হ্যাঁ। এমনিই হয়। সবার চোখের আড়ালে একজন যিনি সর্বক্ষণ চোখ মেলে বসে আছেন তাঁকে ফাঁকি দেওয়া শেষ পর্যন্ত যায় না। সুবিনয়ও পারল না। ভুলের কথা বলছিলাম না! প্রথম ভুল সে করেছিল জ্যাকিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। যদিও তা পুরোপুরি সম্ভবপর হয়নি। দ্বিতীয় ভুল রামদেওকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিয়ে। পাছে নিজে ধরা পড়ে যায় এবং সে যে রামদেওকে পেথিড্রিনে অ্যাডিক্টেড করেছে সেটা কোনক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

রামদেওকে খুন করে ফেললেই তো একেবারে ল্যাঠা চুকে যেত! অরূপ বলে।

তা যেত— কিরীটী বলে, কিন্তু তখন আর সেটা হয়ত সম্ভবপর ছিল না। অবিশ্যি সে যদি আগে রামদেওকে শেষ করত, তবে চট্ করে হয়ত রামদেওর প্রবলেম তার সামনে এসে দাঁড়াত না। কিন্তু সেরকম পরিকল্পনা হয়ত ওর মাথায় আসেনি। রামদেও পুরোপুরি তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল বলে রামদেওর ব্যাপারটা পরে কোন এক-সময় মেটাবে মনে করে রামদেওকে তখনও হয়ত শেষ করেনি। এবং তৃতীয় ও মারাত্মক ভুল যেটা করেছিল সুবিনয় সেটা হচ্ছে গগনবিহারীর জামা ও জুতো চুরি করে হত্যার সময় সেটা ব্যবহার করে। ঐ দুটো বস্তুই আমাকে স্থিরনিশ্চিত করেছিল হত্যাকারী ঐ বাড়িরই কেউ, যার পক্ষে ঐ দুটি বস্তু হাতানো সম্ভবপর ছিল। সর্বশেষে ঐ দুটি বস্তুর ব্যবহার থেকেও আমার যে কথাটি মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে হত্যাকারী রামদেও নয়—হয় সুবিনয়, না হয় সুবীর—দু'জনের একজন।

তাহলে যত নষ্টের মূল রুক্মিণীই দেখতে পাচ্ছি! অরূপ বলে।

হ্যাঁ। রুক্মিণী নয়, বল বনমরালী। গগনবিহারীর সাধের বনমরালীই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হল।

কিরীটী থামল।

পরের দিন প্রত্যূষে লেকে দেখা হল যোগজীবনবাবুর সঙ্গে কিরীটীর। এই কদিন ভদ্রলোক লজ্জায় বেড়াতেও আসেননি লেকে সকালে বোধ হয়।

রায় সাহেব!

যোগজীবনের ডাকে কিরীটী ফিরে তাকায়।

শমিতা দেবীর খবর কি সান্যাল মশাই?

সে অমলেন্দুর ওখানেই আছে।

মিটে গিয়েছে তাহলে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

যাক। পাশ থেকে যোগেশবাবু বলে উঠলেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ!

ফণীবাবু বললেন, আজকালকার পোলাপান কি যে ভাবে আর কি যে করে—

কিরীটী শেষ করে কথাটা, বোঝাই যায় না!

সকলে হেসে ওঠে।

সুভদ্রা হরণ

এক

এক এক সময় দেহে ও মনে কিরীটীর এমন একটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিত যখন সে হয়ত দিনের পর দিন তার বসবার ঘরটা থেকে বেরুতই না। কেউ এলে দেখা পর্যন্ত করত না। দেহ ও মনের ঐ নিষ্ক্রিয় ভাবটা কোন কোন সময় একনাগাড়ে এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত চলত। ও যেন ঐ সময়টায় শামুকের মতই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখত।

বছর তিনেক আগেকার কথা—কিরীটীর সেই সময় ঠিক ঐ অবস্থা চলছিল।

সময় তখন গ্রীষ্মকাল।

একে শহরে প্যাচপ্যাচে বিশ্রী গরম—তার উপরে সারা শহর জুড়ে চলেছে সে সময় প্রচণ্ড এক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবাধ খুনোখুনি। একে অন্যকে হত্যা করাটা যেন এক শ্রেণীর রাজনৈতিক আশ্রয়পুষ্ট বেপরোয়া কিশোর যুবকদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

কাউকে রিভলভারের গুলি চালিয়ে, কাউকে পাইপগান দিয়ে, কাউকে রাইফেলের গুলিতে, কাউকে ছোরা মেরে বা বোমার ঘায়ে কাউকে—যে যেমন পারছিল যেন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল।

খবরের কাগজের পাতা খুললেই নিত্য ঐ ধরনের দু'চারটে মর্মন্তুদ হত্যাসংবাদ চোখে পড়বেই।

জনজীবনের সে যেন এক বীভৎস চিত্র। কেবল কি তাই! জনজীবন যেন সর্বদা আতঙ্কিত—সন্ত্রস্ত। মৃত্যু যেন সর্বত্র সর্বক্ষণ ওৎ পেতে আছে।

সকালে হয়ত বেরুল—রাত ফুরিয়ে গেল, আর ফিরলই না।

কাউকে হয়ত চলন্ত বাস থেকে নামিয়ে—দিনের আলোয় চারিদিকে মানুষজন—নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে গেল সকলের চোখের সামনে। রক্তাক্ত মৃতদেহটা তার রাস্তায়ই পড়ে রইল।

বাড়ির কেউ বের হলে না ফিরে আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সন্ধ্যার পরই যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। সহজ জীবনযাত্রাটাই যেন কেমন থমকে গিয়েছে।

কিরীটীর গড়িয়াহাট অঞ্চলটা কিছু শান্ত। দ্বিপ্রহরে ঘরের মধ্যে বসে কিরীটী ও কৃষ্ণার মধ্যে সেই কথাই হচ্ছিল।

ভৃত্য জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

এই জংলী, চা কর্! কিরীটী বললে।

চায়ের জল চাপিয়েছি। জংলী বললে, বাইরে একজন বাবু এসেছেন—

বলে দে দেখা হবে না।

কিরীটী কথাটা বলতে জংলী বললে, বলেছিলাম, কিন্তু বাবু শুনছেন না। বলছেন ভীষণ জরুরী দরকার তাঁর—

বলেছিস বুঝি আমি আছি বাড়িতে? কিরীটী খিঁচিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ।

ভেংচে ওঠে কিরীটী, হ্যাঁ! তোকে না বলে দিয়েছি কেউ এলে বলবি বাবু বাড়িতে নেই!

কৃষ্ণা বলে, দেখই না কে। নিশ্চয়ই খুব বিপদ, নচেৎ এই প্রচণ্ড রোদে এই গরমে কেউ তোমার কাছে আসে। যা জংলী, বাবুকে এই ঘরেই পাঠিয়ে দে।

জংলী চলে গেল। তার ওষ্ঠপ্রান্তে চপল হাসি। মনে হল মনিব-গৃহিণীর হুকুম পেয়ে সে যেন খুশিই হয়েছে।

খুশি হবার জংলীর কারণ আছে। কিরীটীর যখন ঐ ধরনের নিষ্ক্রিয়তা চলতে থাকে জংলীর ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগে না। কেবল একা একা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে বাবু। কারও সঙ্গে দেখা না, কথা পর্যন্ত না—এমন কি মাঈজীর সঙ্গেও কদাচিৎ এক-আধটা কথার বেশী নয়।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণা চলে যাবার পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। সতর্ক জুতোর শব্দ। দরজা ঠেলে আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী চোখ তুলে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

লম্বা ঢ্যাঙা দড়ির মত পাকানো চেহারা। পরনে দামী শান্তিপুরী ফাইন ধুতি ও গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি। সারা গা থেকে ভুরভুর করে একটা কড়া দিশী সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। গা যেন কেমন গুলিয়ে ওঠে। হাতে একটা মোষের শিংয়ের লাঠি।

নমস্কার। আমার নাম হরিদাস সামন্ত।

কিরীটী নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে, বসুন।

হরিদাস সামন্ত বসতে বসতে বললেন, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করবার জন্য আমি সত্যিই খুবই লজ্জিত, দুঃখিত রায় মশায়। কিন্তু নেহাত প্রাণের দায়ে—

কিরীটী দেখছিল আগন্তুকের চেহারা ও মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বেই হবে বলে মনে হয়। রগের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু কেশ বেশ সযত্নে ছাঁটা। মাঝখানে টেরি। কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। লম্বাটে ধরনের মুখ। চওড়া কপাল। কপালের রেখা স্পষ্ট। কপালের রেখায়, চোখের কোণে, ভাঙা গালে যেন একটা অমিতাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। নাকটা সামান্য যেন ভোঁতা, ভাঙা গাল। ধারালো চিবুক। চোখে সোনার দামী ফ্রেমের চশমা।

বড় বিপদে পড়েছি রায় মশাই। দেখুন, আপনি হয়ত সব শুনে বলবেন পুলিসের কাছে গেলাম না কেন। গেলাম না কারণ তাদের দ্বারস্থ একবার হলে গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকে না। তাছাড়া অপরপক্ষ যদি জানতে পারে যে পুলিসের সাহায্য আমি নিচ্ছি তাহলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেই শেষ করে দেবে আমাকে। তাই বুঝলেন কিনা—

কথাগুলো বলতে বলতে হরিদাস সামন্ত পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলেন। দেখা গেল দু'হাতের আঙুলে গোটা চারেক আংটি। তার মধ্যে বোধ হয় একটা রক্তমুখী নীলা মনে হল কিরীটীর।

কিরীটী চেয়ে চেয়ে দেখছিল হরিদাস সামন্তকে।

মুখটা যেন চেনা-চেনা, কবে কোথায় দেখেছে—ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে।

মাপ করবেন হরিদাসবাবু, আপনাকে যেন আগে কোথাও দেখেছি—

দেখেছেন বইকি রায় মশাই।

দেখেছি?

হ্যাঁ। এককালে স্টেজে অভিনয় করতাম তো।

রঙমহল মঞ্চে—

হ্যাঁ। ছিলাম অনেক দিন।

উল্কা নাটকে আপনি অভিনয় করেছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। রাজীব ঘোষের ভূমিকায়। মনে আছে আপনার সে অভিনয়?

হ্যাঁ। মনে আছে বৈকি। তা মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কেন, মঞ্চ ছেড়ে দিলেন কেন?

আমাদের যুগ যে চলে গিয়েছে।

যুগ চলে গিয়েছে কি রকম?

তাছাড়া কি? আমরা তো এখন ডেড্—ফসিল। তবে ওই অ্যাক্টিংয়ের নেশা জানেন তো কি ভয়ানক! তাই থিয়েটারের মঞ্চ ছেড়ে গিয়ে যোগ দিলাম যাত্রার দলে।

যাত্রার দলে?

হ্যাঁ। যাত্রা। তারপর একদিন পার্টনারশিপে আধাআধি হিস্যায় নবকেতন যাত্রা পার্টি গড়ে তুললাম।

কতদিন হল যাত্রার দলে অভিনয় করছেন?

তা ধরুন বছর সাত-আট তো হলই প্রায়। প্রথমটায় বছর দুয়েক এ-দলে ও-দলে গাওনা গেয়ে বেড়িয়েছি। তারপর দেখলাম এ ল্যাইনে বাঁচতে হলে নিজের দল গড়া ছাড়া উপায় নেই। তাই—

নিজের দল খুললেন ?

হ্যাঁ। নবকেতন যাত্রা পার্টি—

নবকেতন যাত্রা পার্টি আপনি গড়েছিলেন ?

ঠিক আমি একা নই। আমি আর রাধারমণ পাল মশাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বছর দুই বাদে শেয়ার বেচে দিয়ে পাল মশাইয়ের দলেই বর্তমানে চাকরি করছি।

জংলী ঐ সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

থিয়েটার অভিনয় ব্যাপারে কিরীটীর বরাবর একটা নেশা আছে। নতুন নাটক কখনও কোনও মঞ্চে সে বড় একটা বাদ দেয় না। হরিদাস সামন্তর অভিনয় সে রঙ্গমঞ্চে বার দুই দেখেছে। সেও বছর সাত-আট আগে। কিন্তু সে চেহারা নেই হরিদাস সামন্তর। সে চেহারা যেন শুকিয়ে গিয়েছে। তাহলেও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল সেই কারণেই।

নিন সামন্ত মশাই, চা খান।

চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে হরিদাস সামন্ত বললেন, আমার অভিনয় আপনি তো দেখেছেন রায় মশাই ?

দেখেছি।

প্রথম যুগের অভিনয় হয়ত আমার দেখেননি।

দেখেছি। আপনার সিরাজদ্দৌলায় সিরাজের পার্ট।

আর কিছু ?

রত্নদীপে সোনার হরিণ।

দেখেছেন ?

হ্যাঁ।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন হরিদাস সামন্তর বুক কাঁপিয়ে বের হয়ে এল।

বললেন, হ্যাঁ—সে সময় হিরো থেকে ক্যারেক্টার রোল পর্যন্ত করতাম—

আবার যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল সামন্তর।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আশ্চর্য! এখনও আপনার সে কথা মনে আছে? আপনি গুণী ব্যক্তি, তাই অন্যের গুণের কথা আজও স্মরণ রেখেছেন। কেউ মনে রাখে না রায় মশাই—নটনটীদের কেউ মনে রাখে না। গিরিশচন্দ্র ঠিকই বলে গিয়েছেন—দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়। কথাগুলো বলতে বলতে হরিদাস সামন্তর চোখের কোণ দুটো সজল হয়ে ওঠে।

কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন তা তো কই এখনও বললেন না সামন্ত মশাই।

হ্যাঁ—বলব। আর সেই জন্তই তো এসেছি। রায় মশাই, আপনার রহস্ত উদ্‌ঘাটনের অদ্ভুত ক্ষমতার, শক্তির কথা আমি জানি। আর তাতেই সর্বাগ্রে আপনার কথাই মনে হয়েছে। আমার সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, তা থেকে মুক্ত যদি কেউ করতে পারে আমাকে একমাত্র আপনিই হয়ত পারবেন।

সামন্ত মশাই, জানি না আপনার কি ধরনের বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তবে আমার যদি সাধ্যাতীত না হয় আমায় যথাসাধ্য আপনার আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবার চেষ্টা করব।

কিরীটীর বিরক্তির ভাবটা ততক্ষণে অনেকখানি কেটে গিয়েছে। বলতে কি সে যেন একটু কৌতুহলই বোধ করে সামন্ত মশাইয়ের কথায়।

পারবেন রায় মশাই, কেউ যদি পারে তো একমাত্র আপনিই পারবেন। আপনাকে সব কথা খুলে না বললে গোড়া থেকে আপনি বুঝতে পারবেন না। তাই গোড়া থেকেই বলছি।

দুই

হরিদাস সামন্ত অতঃপর বলতে শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

থিয়েটারে নতুন নতুন সব ছেলেছোকরা অভিনেতাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাস সামন্তদের মত বয়স্ক অভিনেতাদের চাহিদা কমতে শুরু করেছিল।

তার অবিশ্যি আর একটা কারণও ছিল। নতুন অভিনেতারা সব নতুন ঢঙে অভিনয় করে যা আগের দিনের অভিনেতাদের সঙ্গে আদৌ মেলে না।

পাবলিকও চায় নতুন ধরনের অভিনয় আজকাল।

অবিশ্যি হরিদাস সামন্তর ডিমাণ্ড কমে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। অতিরিক্ত মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারে শরীরটা যেন কেমন তাঁর ভেঙে শুকিয়ে গিয়েছিল, বয়সের আন্দাজে বেশ বুড়োই মনে হত তাঁকে।

বয়সের জন্যই তাঁকে হিরোর রোল থেকে আগেই সরে আসতে হয়েছিল। শেষে ক্যারেক্টার রোল থেকেও ক্রমশঃ তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

এবং শেষ পর্যন্ত একদিন যখন হরিদাস সামন্ত বুঝতে পারলেন মঞ্চের প্রয়োজন তাঁর জন্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে—এবং হয়ত শীঘ্রই একদিন নোটিশ পেতে হবে—হরিদাস সামন্ত নিজেই স্টেজ থেকে সরে গেলেন।

একটা সুযোগও তখন এসে গিয়েছিল।

নিউ অপেরা যাত্রাপার্টি থেকে তাঁর ডাক এল। মাইনেটাও মোটা রকমের। হরিদাস সামন্ত সঙ্গে সঙ্গে আগত লক্ষ্মীকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

ঐ সময়টায় যাত্রার দলগুলো আবার নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করছিল। মঞ্চের

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তারা দলে মোটা মাইনে দিয়ে টানতে শুরু করেছিল। অনেকে সেজন্য যাত্রার দলে নামও লেখাতে শুরু করেছিল। সেখানেই অভিনেত্রী সুভদ্রার সঙ্গে পরিচয়।

অভিনেত্রী বললে ভুল হবে, কারণ সুভদ্রা তখন মাত্র মাস আষ্টেক হবে ঐ যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। নয়া রিক্রুট। রেফিউজী কলোনীর মেয়ে—ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনা। সুভদ্রার বয়স তখন কুড়ি-একুশের বেশী নয়। পাতলা দোহারা, গায়ের বর্ণ শ্যাম—কিন্তু চোখ-মুখের ও দেহের গড়নটি ভারি চমৎকার। যৌবন যেন সারা দেহে উপচে পড়ছে।

ওকে দেখে ও ভাবভঙ্গি দেখে ঝানু অভিনেতা হরিদাস সামন্ত বুঝতে পেরেছিলেন—মেয়েটির মধ্যে পার্টস আছে। ঠিকমত তালিম দিয়ে খেটেখুটে তৈরী করতে পারলে মেয়েটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দলের প্রোপ্রাইটার রাধারমণ পাল মশাইকে কথাটা বললেন হরিদাস সামন্ত।

পাল মশাই বললেন, বেশ তো, দেখুন না চেষ্টা করে সামন্ত মশাই।

তাহলে ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তৈরী করে দেব।

বেশ, করুন।

একটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন হরিদাস সামন্ত এবং তাঁর অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুভদ্রার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার অভিনয়ের দ্যুতি ঝিলমিল করে উঠল।

অভিনয়ের তালিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার যে তলে তলে ঘটে যাচ্ছিল সেটা আর কেউ দলের না বুঝলেও রাধারমণ পাল মশাই সেটা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। কারণ যাত্রার দলে ঐ ধরনের ব্যাপার ঘটেই থাকে। এক-একজন অভিনেতার সঙ্গে এক-একজন অভিনেত্রী কেমন যেন জোট বেঁধে যায়। ক্রমশঃ হরিদাস তাঁর বাড়িঘরের সঙ্গে সম্পর্কই প্রায় তুলে দিলেন।

বাড়িতে স্ত্রী চিররুগ্না।

দুটি ছেলে। বড়টি তেইশ-চব্বিশ বৎসরের, একটি ফ্যাক্টরিতে মেকানিক—সুশান্ত। কুড়ি-একুশ বৎসরের ছোটটি প্রশান্ত পাড়ায় মস্তানী করে বেড়ায়।

প্রৌঢ় বয়সে কোন পুরুষের চোখে যদি কোন নারী পড়ে, তখন তার সাধারণ লাজ-লজ্জার বালাইটাও বোধ হয় থাকে না। প্রৌঢ় হরিদাসেরও সুভদ্রার প্রতি নেশাটা যেন তাঁকে একেবারে বেপরোয়া করে তুলেছিল। যাত্রার দলে তিনি বেশ ভাল মাইনেই পেতেন এবং প্রোপ্রাইটার পাল মশাইয়েরও বোধ হয় হরিদাসের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। সেই কারণেই হরিদাস সুভদ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন।

হরিদাস নেবুতলায় একটা বাসা ভাড়া নিলেন, সুভদ্রা তাঁর সঙ্গে সেখানেই থাকতে লাগল।

ক্রমশ: দলের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

কেউ কেউ আড়ালে মুখ টিপে হেসেছিল প্রৌঢ় হরিদাস ও যুবতী সুভদ্রার ব্যাপার-স্যাপার দেখে। বছর দুয়েক হরিদাসের বেশ আনন্দেই কেটে গেল। তারপরই হরিদাস সামন্তর ভাগ্যাকাশে যেন ধূমকেতুর উদয় হল।

তরুণ অভিনেতা, বছর ছাব্বিশ হবে বয়েস, শ্যামলকুমার এসে দলে যোগ দিল। শ্যামলকুমার দেখতে শুনতেও যেমন চমৎকার তেমনি কণ্ঠস্বরটিও ভরাট ও মাধুর্যপূর্ণ। অভিনয়েও পটু। পাল মশাই শ্যামলকুমারকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন লুফে নিলেন।

কিছুদিন পরে নতুন বই খোলা হল। শ্যামলকুমার নায়ক—সুভদ্রা নায়িকা। পালা দারুণ জমে গেল।

শ্যামলকুমার আসার কিছু আগে থাকতেই হরিদাস আর নায়কের রোল করতেন না। ক্যারেকটার রোলগুলো করতেন। দলের অন্য একটি ছেলে নায়কের রোল করত।

শ্যামলকুমারের কিন্তু দলে এসেই সুভদ্রার প্রতি নজর পড়েছিল। সুভদ্রার যৌবন তাকে আকৃষ্ট করেছিল—এবং দেখা গেল সুভদ্রাও পিছিয়ে নেই। যোগাযোগটা স্বাভাবিকই।

হরিদাস সামন্ত তখনও কিছু বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেননি যে, সুভদ্রার মনটা ধীরে ধীরে শ্যামলকুমারের দিকে ঝুঁকছে। বুঝতে যখন পারলেন তখন নাটক অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী সুধাময়ীর অসুখটা হঠাৎ বাড়াবাড়ি হওয়ায় হরিদাস সামন্ত কটা দিন নেবুতলার বাসায় যেতে পারেননি। তারপর স্ত্রী মারা গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকবার পর এক রাত্রে আটটা নাগাদ হরিদাস নেবুতলার বাসায় গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

ভিতরে থেকে একটু পরে সুভদ্রার সাড়া এল, কে?

আমি হরিদাস—দরজা খোল।

আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তুমি বাড়ি যাও, কাল এস।

তা দরজাটা খুলছ না কেন? দরজাটা খোল।

বলছি তো শরীরটা খারাপ। জবাব এল সুভদ্রার ভিতর থেকে।

হরিদাসের মনে কেমন সন্দেহ জাগে। ইদানীং কিছুদিন ধরে সুভদ্রার ব্যবহারটাও যেন কেমন ঠেকছিল। তাই তিনি বললেন, দরজা খোল সুভদ্রা—

দরজা অতঃপর খুলে গেল। কিন্তু খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা নয়—শ্যামলকুমার।

কয়েকটা মুহূর্ত হরিদাসের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না। তিনি যেন বোবা। পাথর।

শ্যামলকুমার পাশ কাটিয়ে বেরুবার উপক্রম করতেই হরিদাস সামন্ত বললেন, দাঁড়াও শ্যামল—

শ্যামলকুমার দাঁড়াল।

তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছিলে?

কেন বলুন তো?

শ্যামলকুমারের গলার স্বরটা যেন ধক্ করে হরিদাসের কানে বাজে।

এটা আমার বাসাবাড়ি জান?

জানি বইকি। আর কিছু আপনার বলবার আছে?

তোমার এতদূর স্পর্ধা!

সামন্ত মশাই, ভুলে যাবেন না, আমি আপনার মাইনে করা ভৃত্য নই। কথাটা বলেই আর শ্যামলকুমার দাঁড়াল না, একপ্রকার যেন হরিদাসকে ধাক্কা দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল সুভদ্রা। শ্যামলকুমারের ঠিক পিছনেই।

হরিদাস সামন্ত এবার ডাকলেন, সুভদ্রা—

কি?

সুভদ্রা অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল হরিদাসের সামনে।

এসবের মানে কি?

মানে আবার কি? দেখতেই তো পাচ্ছ। সুভদ্রার স্পষ্ট জবাব, বলায় কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই। লজ্জা বা কোন অনুতাপের লেশমাত্রও নেই যেন।

তাহলে যা কানাঘুষায় শুনছিলাম তা মিথ্যে নয়?

মাঝরাত্রে চেঁচিয়ো না।

কি বললি হারামজাদী, চেঁচাব না? একশবার চেঁচাব—হাজারবার চেঁচাব। আমারই ভাড়াবাড়িতে বসে আমারই খাবি, আমারই পরবি—

কিন্তু হরিদাস সামন্তকে কথাটা শেষ করতে দিল না সুভদ্রা, বললে, আমি তোমার বিয়ে-করা সাতপাকের ইস্তিরী নই হরিদাসবাবু। অত চোখ রাঙারাঙি কিসের?

কি হল হরিদাসের—দপ্ করে যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। বাঘের মতই সুভদ্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি সুভদ্রাকে কিল চড় ঘুষি লাথি চালাতে লাগলেন হরিদাস।

সুভদ্রা মাটিতে পড়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল।

হরিদাস সামন্ত ঐ পর্যন্ত বলে থামলেন।

তারপর? কিরীটী জিজ্ঞাসা করলে।

পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলে তারপর। বললেন হরিদাস সামন্ত।

তাহলে বলুন ব্যাপারটা মিটে গেল?

মিটল আর কোথায় রায় মশাই! আমিও ভেবেছিলাম বুঝি প্রথমটায় মিটে গেল। কিন্তু তারপর দিন পনেরো না যেতেই বুঝলাম—

কি বুঝলেন?

সুভদ্রা বাইরে শান্ত ও চুপ করে থাকলেও গোপনে ওদের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়নি। আবার একদিন ধরা পড়েও গেল—আবার ধোলাই দিলাম।

আবার মারধোর করলেন?

করব না? কি বলছেন আপনি, রায় মশাই—এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! কিন্তু যেন সমস্ত ব্যাপারটা অন্যদিকে বইতে শুরু করল।

কি রকম?

বুঝলাম ওরা দু'জনে তলে তলে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু মুখে অন্য রকম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে হরিদাস সামন্ত বললেন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি—শ্যামলকুমার যে নাটক লিখতে জানে জানতাম না। হঠাৎ একদিন ঐ ঘটনার দিন পনেরো পরে পাল মশাই আমাকে ডেকে বললেন—

সামন্ত মশাই, একটা চমৎকার পালা হাতে এসেছে।

তাই নাকি? জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ। নতুন লেখক—আর কে জানেন?

কে?

আমাদেরই দলের একজনের লেখা।

কার লেখা? কে আবার আমাদের দলের নাটক লিখল?

বলুন তো কে? অনুমান করুন তো?

না মশাই, পারলাম না।

পারলেন না তো—শ্যামলকুমার—।

বলেন কি!

হ্যাঁ। ছেলেটার মধ্যে সত্যিই একটা পার্টস আছে। পালাটা সত্যি চমৎকার হয়েছে। এক কামুক-প্রৌঢ়ের পার্টটা দারুণ। ঠিক করেছি সেই প্রৌঢ়ের রোলটাই আপনি

করবেন। নায়িকা হবে সুভদ্রা আর নায়ক শ্যামলকুমার। কাল থেকেই রিহার্শেল শুরু করছি। গল্পটা মোটামুটি হচ্ছে প্রৌঢ়ের কাছেই থাকত সুভদ্রা। পরে সেখানে এলো গল্পের নায়ক জ্যোতির্ময় বলে ছোকরাটি—তারপর আসল ও সত্যিকারের নাটকের শুরু। একেবারে জমজমাট। আপনি শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা যদি তিনটে রোল নেন তো দেখতে হবে না—একেবারে বাজি মাত।

তারপর? কিরীটী শুধাল।

আমি কি তখন জানি নাটকে বিষয়বস্তুটা কি এবং কতখানি। বললাম, বেশ তো, নাটকটা যদি ভাল হয়—

ভাল কি বলছেন মশাই, একেবারে সত্যিকারের একখানি নাটক। এখন বলুন কাল থেকে রিহার্শেল শুরু করবেন তো? সামনের রথযাত্রার দিন থেকেই মহলা শুরু করা যাক। কি বলেন?

বেশ তো।

হরিদাস সামন্ত বলতে লাগলেন, নাটকের মহলা শুরু হল। নাটকের নাম কি জানেন রায় মশাই?

কি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সুভদ্রা হরণ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সামাজিক পালার ঐ ধরনের নাম কখনও শুনেছেন? তার চাইতেও বড় কি জানেন রায় মশাই?

কি?

নাটকের বিষয়বস্তু অবিকল আমার ও সুভদ্রার মধ্যে যেমন শ্যামলকুমারের আবির্ভাব ঠিক তেমনি। তবে অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে।

কি রকম?

রাখালকে করা হয়েছে নাটকে সুভদ্রার পালিত বাপ—যে বাপ শেষ পর্যন্ত মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল। ভাবতে পারেন কি জঘন্য মনোবৃত্তি! পাল মশাইকে আমি বলেছিলাম ঐ ধরনের বিশ্রী ব্যাপার পালায় আদৌ থাকা উচিত নয়। কিন্তু পাল মশাই হেসেই উড়িয়ে দিলেন আমার কথাটা। বললেন—আধুনিকতা আছে ব্যাপারটার মধ্যে।

নাটকের শেষ কি?

নাটকের শেষ দৃশ্যে রাখাল বিষপান করবে—ঘৃণায়, অপমানে। কাল বাদে পরশু সেই পালার প্রথম অভিনয় রজনী—চন্দননগরে।

তা এ ব্যাপারে আপনার দিক থেকে বিপদের বা আশঙ্কার কি আছে?

রায় মশাই, আমি বুঝতে পারছি—

কি ?

ওরা আমাকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই হত্যা করবার মতলব করছে।

হত্যা করবে ? বলেন কি ? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ঐ যে নাটকের মধ্যে বিষপ্রয়োগের ব্যাপারটা আছে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ঠিক ঐ থেকেই সত্যিসত্যিই আমাকে ওরা হত্যা করার—

না, না—তা কখনও সম্ভব ?

সম্ভব। ওদের পক্ষে সবই এখন সম্ভব। ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

তা এতই যদি আপনার ভয়, দল ছেড়ে দিন না।

ছাড়তে চাইলেও ছাড়া পাব না কারণ বেশ কিছু টাকা ধারি পাল মশাইয়ের কাছে আমি। অথচ পুলিসকে একথা বললে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি রায় মশাই। আমাকে আপনি বাঁচান।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, সুভদ্রার মনোভাব এখন আপনার প্রতি কেমন ? সে এখনও আপনার সঙ্গেই আছে তো ?

তা আছে। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তলে তলে ও ছুরি শানাচ্ছে।

সামন্ত মশাই, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলব ?

কি বলুন ?

সুভদ্রাকে আপনি ছেড়ে দিন না—

সুভদ্রাকে ছাড়াও যা মৃত্যুবরণ করাও তা। তা যদি পারতাম তবে আর আপনার শরণাপন্ন হব কেন ?

কথাগুলো বলতে বলতে সামন্ত পকেট থেকে দশ টাকার দশখানা নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন। গরীব অভিনেতা আমি রায় মশাই, আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক দেবার সাধ্য বা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই। আপাততঃ এটা—

টাকা থাক সামন্ত মশাই। কারণ আমি নিজেই এখনও বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি। আচ্ছা পরশু তো চন্দননগরে আপনাদের অভিনয় ?

হ্যাঁ—প্রথম গাওনা।

আমি যাব। আপনাদের গ্রীনরুমের আশেপাশেই থাকব। তবে—

তবে ?

আমাকে হয়ত চিনে ফেলবে শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা। তাই ভাবছি—

বলুন ?

এক প্রৌঢ়র ছদ্মবেশে—আপনার বন্ধুর পরিচয়ে যাব।

বেশ। খুব ভাল প্রস্তাব।

তাহলে সেই কথাই রইল। আমার নাম বলবেন ধূর্জটি রায়। এককালে অভিনয় করতাম। আপনার পুরাতন বন্ধু।

ঠিক আছে, তাই হবে।

অতঃপর হরিদাস সামন্ত বিদায় নিলেন।

তিন

হরিদাস সামন্ত বিদায় নেবার পরই কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।

কেন এসেছিলেন গো ভদ্রলোক ?

লোকটা কে জান কৃষ্ণা ?

না।

এককালে মঞ্চের নামকরা অভিনেতা ছিল, এখন যাত্রার দলে অভিনয় করে। বয়েস হয়েছে। বোধ করি তিপান্ন-চুয়ান্ন হবে।

তা কি চান উনি তোমার কাছে ?

কিরীটী সংক্ষেপে হরিদাস-বৃত্তান্ত কৃষ্ণাকে শোনাল।

কৃষ্ণা সব শুনে বললে, বুড়োর এখনও এত রস !

বুড়ো বয়সেই তো রসাধিক্য হয় বুঝতে পারছ না আমাকে দিয়ে ?

তা কিছু কিছু বুঝতে পারছি বৈকি।

অতএব হে নারী, সতর্ক হইও।

বয়ে গেছে আমার।

বটে ! এত সাহস !

যাও না, একবার দেখ না চেষ্টা করে।

পাচ্ছি না যে।

ওহো, কি দুঃখ রে !

দুজনেই হেসে ওঠে।

কিরীটী হরিদাস সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই স্থির করেছিল—যাত্রার দলের মানুষগুলো যারা হরিদাস সামন্তর জীবনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী—বিশেষ করে শ্যামলকুমার ও সুভদ্রা—তাদের সে দেখবে। ওদের অফিসে গিয়েও পরিচয় হতে পারে। কিন্তু একজন উটকো লোক দেখলে—বিশেষ করে কোনক্রমে যদি তারা পরিচয় জানতে পারে, তারা

হয়ত কিছুটা সচেতন হয়ে যেতে পারে। তাই সে মনে মনে স্থির করে যাত্রার আসরে গিয়ে যাত্রাও দেখা হবে, লোকগুলোকে দেখাও হবে। চাই কি পরিচয়ও হতে পারে।

এবং তাতে করে হয়ত তাদের মনের খবরাখবরও কিছু আঁচ করাও যেতে পারে। সেই ভেবেই চন্দননগরে যেদিন পালাগান সেদিন সেখানে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

চন্দননগর শহরে এক বনেদী ধনীগৃহের বিরাট নাটমঞ্চে যাত্রার আসর বসেছে।

আর সে যুগ নেই—এখন কৃষ্টির অন্যতম ধারক ও বাহক যাত্রাপালা। আজকাল টিকিট কেটে যাত্রা-গান হয়। শ্রোতাও হয় প্রচুর। তাছাড়া নবকেতন যাত্রা পার্টির নাম খুব ছড়িয়েছিল ঐ সময়। বিশেষ করে তাদের অভিনেতা-অভিনেত্রী শ্যামলকুমার ও সুভদ্রার জুটির জন্য।

পালা শুরু হবে রাত আটটায়।

কিরীটী সন্ধ্যার মুখোমুখিই গিয়ে চন্দননগর স্টেশনে নামল ট্রেন থেকে।

গ্রীষ্মকাল। কিন্তু শহরের প্যাচপেচে গরম এদিকটায় নেই যেন।

কিরীটীর চেহারা ও বেশভূষা দেখে তাকে কারও চিনবার উপায় ছিল না। মাথার মাঝখানে টেরি। অনেকটা সেকেলে কলকাতা শহরের বনেদী লোকেদের মত বেশভূষা।

পরনে শান্তিপুরের মিহি ধুতি, গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখে চশমা—পুরুষ্ট একজোড়া গোঁফ মোম দেওয়া। গলায় একটি পাকানো চাদর—গিঁট দেওয়া। পায়ে চকচকে পাম্পসু। হাতে বাহারে ছড়ি।

এককালে ঐ ধরনের বাবুদের কলকাতা শহরে প্রায়ই দেখা যেত।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল-রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই কিরীটী জানতে পারল যাত্রার আসর কোথায় বসেছে।

রিকশাওয়ালা শুধায়, যাত্রা দেখবেন বাবু?

কিরীটী হেসে বলে, আমার এক বন্ধু ঐ দলে অভিনয় করে। শ্রীরামপুরে থাকি। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তার সঙ্গেও দেখা হবে, যাত্রাও দেখা হবে ঐ সঙ্গে।

উঠুন বাবু, পৌঁছে দিচ্ছি। এক টাকা ভাড়া লাগবে।

তাই পাবে। চল।

উঠুন।

কিরীটী উঠে বসল সাইকেল-রিকশায়। রিকশাওয়ালা একটা হিন্দী ফিল্মের গান গুন গুন করে গাইতে গাইতে রিকশা চালাতে লাগল।

মিনিট পনেরো লাগল গানের আসরে পৌঁছতে।

মস্ত বড় সেকেলে পুরাতন জমিদার-বাড়ি।

বিরাট নাটমঞ্চ। চারিদিক ঘিরে সেখানে আসরের ব্যবস্থা হয়েছে।

গেটের সামনে সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে কিরীটী রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরের দিকে এগুল।

অল্পবয়সী যাত্রার দলের একটি ছোকরা গেটের সামনে বসেছিল। শ্রোতাদের আসা তখনও ভাল করে শুরু হয়নি।

কিরীটী সেই ছেলেটিকেই শুধাল, হরিদাস সামন্ত মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?

এখন তো তিনি গ্রীনরুমে আছেন।

তা জানি তাঁকে যদি একটা খবর দেন—বলবেন তাঁর অনেক কালের বন্ধু ধূর্জটি রায় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

আসুন আমার সঙ্গে। তারপর আবার কি ভেবে ছেলেটি অন্য একটি তরুণকে ডেকে বললে, ওরে সুবল, এই বাবুটিকে সামন্ত মশাইয়ের কাছে নিয়ে যা।

সুবল একবার কিরীটীর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, চলুন।

বিরাট নাটমঞ্চে কতকগুলো পাশাপাশি টিনের পার্টিশন তুলে ছোট ছোট ঘরের মত করে সাজঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই একটার সামনে এসে সুবল বললে, যান ভেতরে, সামন্তদা এই ঘরেই আছেন।

কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভিতরে পা ফেলেই থমকে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে হরিদাস সামন্ত ও একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের যুবতী।

উভয়েই পিছন ফিরেছিল বলে কিরীটীকে ওরা দেখতে পায়নি।

মেয়েটির সারা দেহে যৌবন টলমল করছে। মেয়েটি বিশেষ লম্বা নয়—বরং একটু বেঁটেরই দিকে। কিন্তু ছিপছিপে গড়নের জন্য বেমানান দেখায় না। পরনে একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি। একমাথা চুল, এলো খোঁপা করে। খোঁপাটা পিঠের উপর যেন ঝুলছে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে—সামন্ত মশাইও দাঁড়িয়ে। তাঁর পরনে একটা লুঙ্গি ও গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি।

ওদের কথাবার্তা কিরীটীর কানে আসে।

কেন, ডাকছ কেন? মেয়েটি বলল।

সুভদ্রা, আজ পালা শেষ হলেই আমরা বের হয়ে পড়ব। হরিদাস সামন্ত বললেন।

না, আমি কাল ভোররাত্রের ট্রেনে বর্ধমান যাব। সুভদ্রা বললে।

বর্ধমান! বর্ধমান কেন?

সবই তোমাকে বলতে হবে নাকি? সুভদ্রার কণ্ঠে যেন বিদ্রোহের সুর।

তা বলতে হবে না! সঙ্গে বোধ হয় শ্যামলকুমার চলেছে?

চলেছে কি না চলেছে যাওয়ার সময়ই দেখতে পাবে।

সুভদ্রা, তুমি ভাব, আমি কিছুই বুঝি না।

কি বুঝেছ শুনি ?

সেদিনকার পিটুনির কথা নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি ?

শোন, তোমাকেও আমি স্পষ্ট করে আজ বলে দিচ্ছি, তোমার নেবুতলার বাসায় আর আমি যাব না।

উঃ! তলে তলে তাহলে বাসাও ঠিক হয়ে গিয়েছে ?

সুভদ্রা কোন জবাব দিল না, যাবার জন্যই বোধ করি ঘুরে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কে আপনি ?

হরিদাস সামন্তরও দৃষ্টি ইতিমধ্যে পড়েছিল কিরীটীর উপরে।

কি হে সামন্ত, চিনতে পার !

কে ?

ধূর্জটি—আমি ধূর্জটি রায় হে !

ধূর্জটি ?

চিনতে পারছ না ? সেই যে—

হরিদাস সামন্ত প্রথমটায় সত্যিই কিরীটীকে চিনতে পারেননি। কিরীটীর চোখ টিপে ইশারা করায় দুদিন আগেকার সব কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। বলে ওঠেন—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ধূর্জটি! কোথা থেকে হে ?

শুনলাম তুমি পালা-গান গাইতে এসেছ—তাই ভাবলাম অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, দেখা করে যাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার চিনেছি। উঃ কতদিন পরে দেখা! তা বেশ—বেশ করেছ।

আজ তোমাদের পালা তো সুভদ্রা হরণ ?

কথাটা বলে আড়চোখে একবার কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ।

উনিও বুঝি তোমাদের দলে অভিনয় করেন ?

হ্যাঁ। ওই-ই তো নায়িকা সাজে। ওর নাম সুভদ্রা মণ্ডল।

নমস্কার। কিরীটী হাত তুলে নমস্কার করে।

সুভদ্রাও প্রতিনমস্কার জানায়।

কিরীটী বললে, পালার নামটির সঙ্গে আপনার নামটিও তো বেশ মিল করাই। পালাটা কে লিখেছে হে সামন্ত ? পৌরাণিক ?

না, সামাজিক—জবাব দিল সুভদ্রা।

সামাজিক ?

হ্যাঁ। দেখবেন না পালাটা! ভাল লাগবে পালাটা আপনার। কথাগুলো বলতে বলতে বার দুই সুভদ্রা আড়চোখে হরিদাস সামন্তর দিকে তাকাল।

কিরীটীর মনে হল সুভদ্রার ওষ্ঠের প্রান্তে যেন একটা বাঁকা হাসির চকিত বিদ্যুৎ খেলে গেল।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই দেখব, এসেছি যখন! কিরীটী বললে।

সুভদ্রা, ওকে এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

তা ওহে সামন্ত, শুনেছি তোমাদের শ্যামলকুমার নাকি অদ্ভুত অভিনয় করে। তার সঙ্গে একটিবার আলাপ হয় না ?

জবাব দিল সুভদ্রা, কেন হবে না ? শ্যামলই তো এ নাটকের নাট্যকার। আমি এক্ষুনি শ্যামলকে ডেকে আনছি।

খুশিতে যেন ডগমগ হয়ে সুভদ্রা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুভদ্রার পদশব্দ মিলিয়ে গেল বাইরে।

চার

কিরীটী হরিদাস সামন্তর দিকে ফিরে তাকাল।

এই আপনার সুভদ্রা, সামন্ত মশাই ?

হ্যাঁ। কি মতলব করেছে ওরা জানেন ? আজই ওরা ভোররাত্রের গাড়িতে বর্ধমান যাবে।

শুনলাম তো।

শুনেছেন ?

হ্যাঁ। ঘরে ঢোকার মুখে আপনাদের শেষের কথাগুলো কানে এল।

কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, তা হতে দিচ্ছি না। সামন্ত বললেন।

সামন্ত মশাই, ও কালনাগিনী। মিথ্যে শুধু ছোবল খাবেন। যাক সেকথা। আপনাদের পালা শুরু হচ্ছে কখন ?

রাত ঠিক আটটা। এখন সাড়ে ছ'টা। আর দেড় ঘণ্টা বাদে।

আমাকে আসরে বসবার একটা জায়গা করে দেবেন ?

নিশ্চয়ই :

ভাল কথা, আপনাদের এই নাটকে কোন্ অঙ্কে যেন রাখালকে বিষ দেবার কথা!

বিষ কেউ দিচ্ছে না। পালায় আছে বিষ, আমিই নিজে স্বেচ্ছায় পান করব সুভদ্রা তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে জানতে পেরে।

ওঃ, তাহলে জেনেশুনেই বিষপান ?. বিষপ্রয়োগ নয় ? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, জেনেশুনেই বিষপান।

তবে—

কি তবে ?

দৃশ্যটা কি রকম বলুন তো ?

আমি একটা গ্লাস হাতে আসরে যাব, তাতে বিষ রয়েছে।

তারপর ?

আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করব বিষটা, তারপর গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে বের হয়ে আসব আসর থেকে।

তাহলে আসরের মধ্যে পতন ও মৃত্যু নয় ?

না। নেপথ্যে।

তাহলে আর আপনার এত ভয় কেন ?

মানে ?

গ্লাস তো আপনিই নিয়ে যাবেন নিজে হাতে আসরে ?

না।

তবে ?

সুভদ্রাকে ডেকে বলব গ্লাসটা নিয়ে আসতে। সে এনে দেবে গ্লাস আসরে।

তাই নাকি! এ যে দেখছি—

কিরীটীর কথা শেষ হল না।

সুভদ্রা ও শ্যামলকুমার এসে সাজঘরে ঢুকল।

সুভদ্রার হাতে এক কাপ চা। কিরীটী দেখল, শ্যামলকুমারের বয়স আটাশ-উনত্রিশের বেশী হবে না।

ভারি সুশ্রী চেহারাটি। যেমন নায়কোচিত দেহের গঠন, তেমনি পুরুষোচিত স্বাস্থ্য ও যৌবন যেন কানায় কানায় উপচে পড়ছে।

কালো রং হলেও দেখতে সুন্দর। যাকে বলে সত্যিকারের সুপুরুষ। অভিনেতার মতই চেহারা বটে।

সুভদ্রা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে কিরীটীর দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, এই নিন চা। এই আমাদের শ্যামলকুমার, নাটকও এরই লেখা।

আপনিই নাট্যকার ?

আজ্ঞে।

এই বুঝি আপনার প্রথম নাটক ? কিরীটী শুধায়।

হ্যাঁ। বিনীতভাবে জবাব দিল শ্যামল। শুনলাম আপনি সামন্তবাবুর বন্ধু। আজ

আমাদের নাটকটা দেখে যান না।

এসেছি যখন দেখে যাব বৈকি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী আবার বললে, কিন্তু নাটকের অমন একটা অদ্ভুত পৌরাণিক প্যাটার্নের নাম রাখলেন কেন শ্যামলবাবু?

শ্যামলকুমার মৃদু হেসে বললে, নাটকটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আগে দেখুন তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। আচ্ছা তাহলে আমরা চলি। প্রথম দৃশ্যেই আমার আর সুভদ্রার প্রবেশ আছে। এস সুভা—

শ্যামলকুমার সুভদ্রাকে ডেকে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিল আড়চোখে, শ্যামলকুমার আর সুভদ্রার দিকে জ্বলন্ত অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন হরিদাস সামন্ত।

মনে হচ্ছিল যেন এখুনি ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং পারলে ওদের দুজনের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলেন।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই হরিদাস সামন্ত যেন ফেটে পড়লেন, দেখলেন—দেখলেন তো স্বচক্ষে রায় মশাই! এরপরও বলবেন, ওরা মনে মনে আমাকে হত্যা করবার সঙ্কল্প আঁটছে না? উঃ কি সাঙ্ঘাতিক, কি ভয়ানক শয়তানী!

অধীর হবেন না সামন্ত মশাই।

অধীর হব না, কি বলছেন রায় মশাই? আমি তো একটা মানুষ, না কি?

ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাহলেও একটা কথা কি জানেন? ওরা মনে মনে যদি কোন মতলব এঁটেই থাকে কৌশলে ওদের পথ থেকে আপনাকে সরাবার, রাগারাগি করে চেঁচামেচি করলে বা এমন করে অধৈর্য হলে ওদের তাতে করে সুবিধাই হবে।

পারছি না, এত অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না রায় মশাই। তাছাড়া আপনাকে তো এখনও একটা কথা বলিইনি।

কি কথা?

আজ আবার ঐ রাস্কেলটার সঙ্গে দুপুরে আমার একচোট হয়ে গিয়েছে।

কার কথা বলছেন? কিরীটী শুধাল।

কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন না? ঐ শ্যামলকুমার!

কি হল তার সঙ্গে আবার?

জানেন, ও আমাকে আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছে আজ।

আলটিমেটাম?

হ্যাঁ। দুপুরের ট্রেনে আসতে আসতে শ্যামলকুমার আমাকে বলেছে—

কি বলেছে?

ওদের পথ থেকে যদি আমি না সরে দাঁড়াই তো ওরাই আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করবে।

তাই নাকি!

কথাটা কয়েকদিন আগেও শ্যামলকুমার আমাকে একবার বলেছিল।

ওরাই—মানে কি? আপনার কি মনে হয়, ঐ ষড়যন্ত্রের মধ্যে সুভদ্রাও আছে?

নিশ্চয়ই আছে।

কিরীটী ক্ষণকাল যেন কি ভাবল। তারপর বলে, ঠিক আছে।

বাইরে ঐ সময় পালা শুরু হবার প্রথম বেল পড়ল।

ঐ যাঃ, প্রথম বেল পড়ল—প্রথম দৃশ্যের শেষের দিকে আমার অ্যাপিয়ারেন্স আছে। হরিদাস সামন্ত বলে উঠলেন।

আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।

আপনি?

আসরে আমার বসবার একটা জায়গা করে দিন সামনের রোতে, যাতে করে ওদের দুজনকে আরও ভাল করে দেখে নাটকটা ভাল করে শুনতে পারি।

ঠিক আছে। চলুন, আপনাকে আমি বসিয়ে দিয়ে আসি। তারপর মেক্আপে বসব, চলুন।

চলুন।

সামন্ত মশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী ওঁর গ্রীনরুম থেকে বেরুল।

গমগম করছিল যেন আসর।

দর্শনার্থীতে একেবারে যেন ঠাসাঠাসি আসর তখন।

তিল-ধারণেরও স্থান নেই। হরিদাস সামন্ত পাল মশাইকে বলে প্রথম সারিতেই আসরের একেবারে সামনাসামনি একটা চেয়ারে কিরীটীকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পালা শুরু হল।

কিরীটী তন্ময় হয়ে পালা শুনছিল।

নাটকটি বেশ লাগে কিরীটীর। চমৎকার লিখেছে ছেলেটি। কে বলবে একটি তরুণের ঐ প্রথম প্রয়াস!

যেমন ঘটনার বাঁধুনী তেমনি নাটকীয় সংঘাত, আর তেমনি নাটকের সংলাপ।

আরও আশ্চর্য লাগছিল কিরীটীর, হরিদাস সামন্তর কাছে কয়েকদিন আগে শোনা তাঁর জীবনকাহিনীই যেন নাটকের কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে।

এক বৃদ্ধের এক তরুণীর প্রতি আকর্ষণ,—যে আকর্ষণের টানে সে তার নিজের

সংসারকে ভাসিয়ে দিল, অথচ ঐ বৃদ্ধ ঐ তরুণীর সম্পর্কে পালিত পিতার মতই। এমন সময় নাটকে শুরু হল ওদের সংসারে এক তরুণকে নিয়ে সংঘাত।

মেয়েটি সহজেই তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল স্বভাবতই, আর তাইতেই সংঘাত।

এক ত্রিকোণ সংঘাত।

শেষ পর্যন্ত পালিত পিতার নিজের বিকৃত বাসনার জন্য মেয়েটির প্রতি জেগে ওঠে এক গভীর অনুশোচনা, যার ফলে সে স্থির করল সে নিজেই স্বেচ্ছায় ওদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে।

সে বিষপান করবে।

বিষ সংগ্রহ করে নিয়ে এল বৃদ্ধ এবং সেই বিষ সে এনে জলের পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিল এবং মনস্থ করল মেয়েটির হাতের থেকে বিষ-মেশানো জল পান করবে, যাতে করে সেই জল পান করলেই মৃত্যু হয়।

ক্রমশঃ নাটকের সেই দৃশ্য এল।

সুভদ্রা (নাটকের নায়িকা) কোথায় বের হয়েছিল, অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে একাকী চুপ করে বসে আছে।

সুভদ্রা বললে, পাশের ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, খেয়েছ?

আজ আর কিছু খাব না সুভদ্রা।

খাবে না?

না। শুধু এক গ্লাস জল। টেবিলের ওপরে আছে, এনে দাও তো জলের গ্লাসটা।

শুধু জল খাবে?

হ্যাঁ।

সুভদ্রা চলে গেল এবং একটু পরে এক গ্লাস জল নিয়ে এল, এই নাও জল।

যাও, তুমি শুয়ে পড়ো গে।

সুভদ্রা চলে গেল।

নিজের হাতে বিষমিশ্রিত সেই জল পানের পূর্বে বৃদ্ধের সংলাপ: সুভদ্রা, তুমি সুখী হও। আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। একটা চিঠি রেখে যাব, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

এই জলে বিষ মিশিয়ে রেখেছি তুমি জান না, তোমার হাত দিয়েই এই বিষ আমি পান করছি। আর তাই তো তোমরা মনে মনে চেয়েছিলে—তাই হোক, তাই হোক।

সংলাপগুলো উচ্চারণ করতে করতে টলতে টলতে হরিদাস সামন্ত জলটুকু পান করে গ্লাসটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আসর থেকে প্রস্থান করলেন।

শেষ দৃশ্য।

রাখাল-বেশী হরিদাসের প্রস্থানের পরই সুভদ্রা আর নায়কের প্রবেশ।

কিরীটী যেন নাটকের কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

সুভদ্রা!

বল জ্যোতির্ময়!

আর এই খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারছি না।

কি করতে চাও?

এ যেন সত্যি আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমারও।

আমি ঠিক করেছি—

কি ঠিক করেছ?

আজ রাত্রেই আমরা পালাব।

আমি প্রস্তুত।

ইচ্ছে ছিল না আদৌ আমার এভাবে তোমাকে অপহরণ করে চোরের মত রাতের অন্ধকারে সরে পড়বার, কিন্তু—

কিন্তু কি?

সামনে দিয়ে গেলে ঐ বৃদ্ধ মনে নিদারুণ আঘাত পাবে। সুখের ঘর বাঁধতে চলেছি, কারও মনে কোন দুঃখ দেব না। ভাল করে শেষবারের মত ভেবে দেখ, তোমার মনে কোন চিন্তা বা সংকোচ নেই তো?

এতটুকুও না। ওর কুৎসিত দৃষ্টি আমাকে যেন লোভীর মত সর্বক্ষণ লেহন করছে। অথচ ও আমার পালিত বাপ। মুক্তি চাই আমি—মুক্তি চাই।

চল।

দুজনে হাত ধরাধরি করে আসর থেকে বের হয়ে যাবার উপক্রম করবে, আর ঠিক বেরুবার আগেই বাড়ির ভৃত্য এসে বলবে, দিদিমণি, শিগ্রী চলুন, বাবু কর্তাবাবু বোধ হয় মারা গেছেন।

কিন্তু ভৃত্য আর আসে না।

ভৃত্যও আসে না, ওরাও নাটকের সংলাপগুলো বলতে পারে না।

ওরা ঘন ঘন ভৃত্য আসার প্রবেশপথের দিকে তাকাতে থাকে।

নিজেদের মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে বলাবলি করে ওরা। কিরীটী সামনে বসেই শুনতে পায়।

কি ব্যাপার, চাকর আসছে না কেন?

দু মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট কেটে গেল। অথচ ভৃত্য আসছে না আসরে।

সুভদ্রা আর শ্যামলকুমার পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

দু'জনেরই চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

দর্শকরা প্রথমটায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু প্রায় যখন আট দশ মিনিট ঐ অবস্থায় কেটে যাবার উপক্রম হল তখন তাদের মধ্যেও একটা ফিসফিসানি, চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়।

সে বাবা, এরা দুটি সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল কেন? কে একজন বললে।

আর একজন টিপ্পনী কাটল, কি বাবা, ভাগব বলে এখনও দাঁড়িয়ে কেন? কেটে পড় না বাপু, দুটিতে তো বেশ জোট মানিয়েছে!

ওরাও বোধ হয়—সুভদ্রা আর শ্যামলকুমার কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। বৃদ্ধের ভৃত্যের আবির্ভাবের পর যে সংলাপ তাও বলতে পারছে না, এদিকে ভৃত্যেরও দেখা নেই।

অবশেষে বুদ্ধি খাটিয়ে শ্যামলকুমার বললে, চল সুভদ্রা, আর দেরি করা উচিত নয়।

হ্যাঁ, চল।

ওদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সারা প্যাণ্ডেল যেন এক অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল।

কিরীটী নাটকের শেষটুকু জানত। হরিদাসের মুখেই শুনেছিল।

কিরীটীও ঠিক বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটল!

ভৃত্যের আসরে আবির্ভাব হল না কেন?

হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি কিরীটী উঠে পড়ল এবং দ্রুতপদে সাজঘরের দিকে পা বাড়াল।

দর্শকরাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না।

তারা তখন হাসি থামিয়ে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, এটা কি হল? এ কেমন পালা রে বাবা?

পাঁচ

হরিদাস সামন্তর সাজঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কিরীটী।

সেখানে তখন যাত্রাদলের আট-দশজন জমায়েত হয়েছে, পাল মশাইও উপস্থিত। শ্যামলকুমার ও সুভদ্রাও পৌঁছে গিয়েছে সে ঘরে।

একটা চাপা গুঞ্জন ঘরের মধ্যে যেন বোবা একটা আতঙ্কের মত থমথম করছে। ভিড় ঠেলে সামনের দিকে দু'পা এগুতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল কিরীটীর।

সামন্ত মশাই চেয়ারের উপর বসে আছেন। পরনে তাঁর অভিনয়েরই সাজপোশাক। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে ঘাড়টা ভেঙে যেন।

দুটো হাত অসহায় ভাবে চেয়ারের দু'পাশে ঝুলছে। পায়ের সামনে একটা কাঁচের গ্লাস।

কি ব্যাপার? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

বুঝতে পারছি না রায় মশাই, অধিকারী রাধারমণ পাল বললেন, ঘরে ঢুকে দেখি ঐ দৃশ্য। ডেকেও সাড়া না পেয়ে আপনার বন্ধুর—

কিরীটী এগিয়ে গেল। ঝুলে-পড়া হরিদাস সামন্তর মুখটা তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা আবার ঝুলে পড়ল বুকের উপরে।

মুখটা নীলচে। ঠোঁট দুটিও নীলচে। কশের কাছে সামান্য রক্তাক্ত ফেনা।

হাতটা তুলে নাড়ি পরীক্ষা করল কিরীটী। তারপর রাধারমণ পালের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, উনি বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই? সে কি?

একটা চাপা আর্তনাদের মতই যেন রাধারমণ পালের কণ্ঠ হতে কথাগুলো উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ, মারা গেছেন। কিরীটী আবার কথাটা উচ্চারণ করল।

মারা গেছেন?

কিরীটী ঐ সময় মাটি থেকে গ্লাসটা তুলে একবার নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল।

তারপর সেটা পাশের একটা টুলের উপরে নামিয়ে রেখে বললে, মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

বিষ!

কথাটা কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হল শ্যামলকুমারের মুখ থেকে।

কিরীটী শ্যামলকুমারের মুখের দিকে তাকাল। শ্যামলকুমারের সমস্ত মুখে যেন একটা বিব্রত ভয়ের কালো ছায়া।

আমার তাই মনে হচ্ছে, কিরীটী বললে, পুলিসে এখুনি একটা খবর দেওয়া দরকার।

পুলিস! পুলিস কি করবে? রাধারমণ একটা ঢোক গিলে কথাটা বললেন।

স্বাভাবিক মৃত্যু নয় যখন তখন পুলিসে একটা সংবাদ দিতে হবে বৈকি।

ঘরের মধ্যে যাত্রাদলের সবাই তখন প্রায় ভিড় করেছে, সবার কানেই বোধ করি সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল।

জনা ষোল-সতেরো মেয়ে-পুরুষ যাত্রার দলে।

ইতিমধ্যে বোধ করি বাড়ির কর্তা রমণীমোহন কুণ্ডুর কানেও সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল। ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

কি হয়েছে পাল মশাই? ব্যাপার কি?

রমণীমোহনের বয়স খুব বেশী নয়—পঞ্চাশ-একান্নর মধ্যেই। বেশ স্বাস্থ্যবান দেহ। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে বোঝা যায় ভদ্রলোক রীতিমত শৌখিন। পরনে কাঁচির কোঁচানো ধুতি, চওড়া কালোপাড়, সাদা গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি।

আপনি? কিরীটী প্রশ্ন করে রমণীমোহনের দিকে তাকিয়ে।

আমি এ বাড়ির মালিক—রমণীমোহন কুণ্ডু।

ওঃ, ইনি সামন্ত মশায়ের বন্ধু। রাধারমণ বললেন।

শুনলাম সামন্ত মশাইয়ের নাকি কি হয়েছে?

রাধারমণ পাল চুপ করে ছিলেন। কিরীটীই প্রশ্নটার জবাব দিল, মারা গেছেন। মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে।

সর্বনাশ! পয়জনিং?

হ্যাঁ।

এখন উপায়?

থানায় একটা সংবাদ পাঠাতে হবে।

হ্যাঁ, এখুনি পাঠাচ্ছি। হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন রমণীমোহন কুণ্ডু।

কিরীটী আবার পাল মশাইয়ের দিকে তাকাল। ভদ্রলোকের মুখটা যেন এর মধ্যেই কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে শুষ্ক ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

পাল মশাই!

আজ্ঞে?

আপনাদের দলের সর্বশেষ আজ রাত্রে কার সঙ্গে সামন্ত মশাইয়ের দেখা হয়েছিল, সেকথা জানতে পারলে হত।

পাল মশাই একটা ঢোঁক গিলে বললেন, আমার সঙ্গে—মানে পালা শুরু হবার পর থেকে আমি এখানে আসিইনি।

তাহলে আপনার সঙ্গে পালা শুরু হবার পর আর সামন্ত মশাইয়ের দেখা হয়নি?

না।

হুঁ। আপনারা? কিরীটী পর্যায়ক্রমে সকলের দিকে তাকাল।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে একে একে সকলের মুখের উপরই ঘুরে এলো।

চিত্রার্পিতের মত যেন সব দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কথা নেই।

কেউ আপনাদের মধ্যে আজ পালা শুরু হবার পর এখানে আসেননি? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

রোগা মত এক ব্যক্তি এগিয়ে এল? বয়স বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে বলে মনে হয়।

কিরীটী পুনরায় তাকে প্রশ্ন করে, আপনি এসেছিলেন?

না। তবে তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পর একবার আমি এখানে শ্যামলকুমারকে আসতে দেখেছি। আর তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি—সামন্ত মশাই তখন আসরে, সুভদ্রা দেবীকে এই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলাম।

কিরীটী বক্তার মুখের দিকে তাকাল।

রোগা পাকানো চেহারা। চোখের কোল বসা। ভাঙা গাল। নাকটা খাঁড়ার মত উঁচু। মাথায় একমাথা ঢেউ-খেলানো বাবরি চুল। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন। পরনে তখনও অভিনয়ের পোশাক।

কিরীটীর মনে পড়ল, লোকটি ভাল অভিনেতা। বর্তমান নাটকে ভিলেনের পার্ট করছিল। পালায় নায়িকার অন্যতম প্রেমিক। হতাশায় সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

কি নাম আপনার?

আজ্ঞে সুজিতকুমার মিত্র।

এই দলে আপনি কতদিন আছেন?

কতদিন—মানে, ধরুন গে বছর ছয়েক তো হবেই। আগে তো আমিই এ দলে হিরোর রোল করতাম। রোগে রোগে চেহারাটা ভেঙে যাওয়ায় পাল মশাই আর আমাকে হিরোর পার্ট দেন না, ভিলেনের পার্ট করি।

হুঁ। তা আপনি দেখেছেন শ্যামলকুমার আর সুভদ্রা দেবীকে এই ঘরে আসতে?

আজ্ঞে বললাম তো এইমাত্র, শ্যামলকুমারকে আমি ঢুকতে দেখেছি, কিন্তু বের হয়ে যেতে দেখিনি। আর সুভদ্রা দেবীকে বেরোতে দেখেছি কিন্তু ঢুকতে দেখিনি।

শ্যামলকুমার ভিড়ের মধ্যে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিরীটী শ্যামলকুমারের মুখের দিকে তাকাল।

শ্যামলবাবু, তৃতীয় অঙ্কের গোড়ায়—কিরীটী প্রশ্ন করল, আপনি এসেছিলেন এ ঘরে?

হ্যাঁ। সামন্ত মশাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন—একটা চিরকুট দিয়ে।

চিরকুট!

হ্যাঁ, এই যে দেখুন না—এখনও আছে আমার কাছে।

বলতে বলতে পকেটে হাত চালিয়ে ছোট একটুকরো কাগজ বের করল শ্যামলকুমার।

দেখি—কিরীটী চিরকুটটা হাতে নিল।

ছোট একটুকরো প্রোগ্রাম-ছেঁড়া কাগজ—তাতে পেনসিলে লেখা,—শ্যামল, একবার আমার ঘরে এস।

নীচে কোন নাম সই নেই।

এতে তো দেখছি কারুর নাম সই নেই। তা এটা যে সামন্তরই পাঠানো, বুঝলেন কি করে?

আজ্ঞে দলের চাকর ভোলা আমাকে চিরকুটটা দেয়।

ভোলা? কোথায় সে?

ভোলা ভিড়ের মধ্যে সবার আড়ালে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এল।

কালো বেঁটে নাদুস-নুদুস চেহারা। পরনে একটা ধুতি ও গায়ে গেঞ্জি। বয়স বছর ত্রিশেক হবে। চোখের দৃষ্টিতে বেশ যেন একটা সতর্কতা।

তোমার নাম ভোলা? কিরীটী শুধাল।

আজ্ঞে।

বাবুকে তুমি ঐ চিরকুটটা দিয়েছিলে?

আজ্ঞে।

সামন্ত মশাই তোমাকে দিতে দিয়েছিলেন?

আজ্ঞে নিজের হাতে দেননি—

তবে! চিরকুটটা তুমি কোথায় পেলে?

রাধারাণী দিদিমণি চিরকুটটা আমায় দিয়েছিলেন।

তিনি কে?

এবার একটি বছর ত্রিশ বয়সের রমণী এগিয়ে এল।

আমার নাম রাধারাণী।

আপনি দিয়েছিলেন ওকে চিরকুটটা? কিরীটী প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ।

আপনাকে সামন্ত মশাই দিয়েছিলেন?

না। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষের দিকে আমি যখন আসর থেকে সাজঘরের দিকে যাচ্ছি, কে যেন আমাকে চিরকুটটা দিয়ে বললে, এটা ভোলাকে দিয়ে বলবেন—শ্যামলবাবুকে দিয়ে যেন বলে সামন্ত মশাই তাঁকে এ ঘরে ডেকেছেন।

কে সে?

প্যাসেজে ভাল আলো ছিল না আর আমারও তাড়াতাড়ি ছিল, ভাল করে চেয়ে দেখিনি, নজরও দিইনি।

তার গলাও চেনেননি?

না। ঠিক তাড়াতাড়িতে—

হুঁ, তারপর?

ভোলা আমাদের সাজঘরের বাইরেই ছিল—তাকে চিরকুটটা দিয়ে বলি শ্যামলবাবুকে দিয়ে আসতে, সামন্ত মশাই দিয়েছেন। শ্যামলবাবুর সাজঘরটা আমাদের পাশের ঘরেই!

ঐ সময় হঠাৎ দণ্ডায়মান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্য থেকে মধ্যবয়সী কালো গাঁট্টাগোঁট্টা এক ভদ্রলোক, যিনি সুভদ্রা হরণ পালায় সুভদ্রার মামার পার্ট করেছিলেন—তিনি এগিয়ে এসে বেশ যেন একটু রুক্ষ কর্কশ গলাতেই বললেন, কিন্তু মশাই, আপনার

পরিচয়টি জানতে পারি কি? আপনি কে? পুলিসের মত আমাদের এই জেরা করছেন কেন? আপনি তো বাইরের লোক। পুলিসকে আসতে দিন, তাদের কাজ তারাই করবে।

রাধারমণ পাল তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, দোলগোবিন্দবাবু, উনি সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু।

বন্ধু তো হয়েছে কি?

ঠিক সেই সময় স্থানীয় থানার অফিসার-ইন-চার্জ মণীশ চক্রবর্তী হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে পিছনে রমণীমোহন কুণ্ডু।

মণীশ চক্রবর্তীর বয়স চল্লিশের কিছু উর্ধ্বে বলেই মনে হয়। রীতিমত পালোয়ানের মত চেহারা। পাকানো একজোড়া গোঁফ। থুঁতনিতে নূর দাড়ি। পরনে পুলিসের ইউনিফর্ম।

কোথায়—কোথায় ডেড্ বডি?

ঐ যে—বললে কিরীটী।

মণীশ চক্রবর্তী এগিয়ে গিয়ে ডেড্ বডির সামনে দাঁড়ালেন। নানা ভঙ্গিতে দেখলেন দূর থেকে, সামনে থেকে, কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও সামান্য একটু হেলে দাঁড়িয়ে।

কখন মারা গিয়েছে? I mean কখন ব্যাপারটা আপনারা জানতে পেরেছেন?

কথাগুলো বলে পর্যায়ক্রমে মণীশ চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে উপস্থিত দণ্ডায়মান সকলের দিকেই তাকালেন।

সবাই চুপ, কারও মুখে কোন কথা নেই।

কি হল? সবাই আপনারা ডেফ্ অ্যাণ্ড ডাম্ব্ স্কুলের ছাত্র হয়ে গেলেন নাকি? শুনতে পাচ্ছেন না কথাটা আমার, না জবাব দিতে পারছেন না?

তবু কারও মুখে কোন শব্দ নেই। পূর্ববৎ সবাই যেন বোবা—সবাই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে।

ঐভাবে ধমক দিয়ে কি ওদের কারও মুখে কোন কথা বের করতে পারবেন অফিসার? এক এক করে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করুন। কিরীটী মৃদু গলায় বললে, দেখছেন তো ঘটনার আকস্মিকতায় ওঁরা সব ঘাবড়ে গিয়েছেন।

কিরীটীর দিকে তাকালেন মণীশ চক্রবর্তী। বার কয়েক যেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিরীটীকে জরীপ করলেন। তারপর বললেন, আপনি?

রাধারমণ পাল বললেন, সামন্ত মশাইয়ের উনি বন্ধু।

বন্ধু?

আজ্ঞে।

ত। উনিও কি যাত্রাদলের! কিরীটীর বেশভূষা লক্ষ্য করেই মণীশ চক্রবর্তী কথাটা বললেন।

না—উনি এনেছিলেন ওঁর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তারপর পালা শুনছিলেন।

অফিসার, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। ঐ সময় কিরীটী বললে।

কি কথা?

আগে সকলকে ঘর থেকে একটু বেরুতে বলুন, তারপর বলছি।

মণীশ চক্রবর্তী ভ্রূ কুঁচকে যেন কি ভাবলেন মুহূর্তকাল, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা একটু বাইরে যান।

সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল সবাই। ঘর খালি হয়ে গেল।

কি বলছিলেন বলুন?

কিছু বলবার আগে বলতে চাই, আজকের ব্যাপারটার একটা উপক্রমণিকা আছে মিঃ চক্রবর্তী।

উপক্রমণিকা! সে আবার কি?

কিরীটী তখন তাঁর কাছে হরিদাস সামন্তর যাওয়া থেকে আজকের সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলে গেল, তারপর বললে, মানুষগুলোকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য ও বোঝবার জন্যই আমি আজ এখানে এসেছিলাম। একবারও ভাবতে পারিনি সত্যিই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে।

কিন্তু এখনও আপনার আসল পরিচয়টা তো পেলাম না?

কিরীটী মৃদু গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করল।

মণীশ চক্রবর্তী যেন আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীকে জরীপ করলেন।

তারপর বললেন, ও, আপনিই সেই বেসরকারী গোয়েন্দা—কিরীটী রায়! হ্যাঁ, নামটা আপনার শুনেছি দু-একবার।

আজ্ঞে তবে গোয়েন্দা ঠিক নয়—

তবে?

রহস্যের সন্ধান করে আমি বিশেষ আনন্দ পাই। বলতে পারেন ওটা আমার একটা নেশা।

নেশাটা দেখছি বড় জব্বর নেশা! তা আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন?

মণীশ চক্রবর্তীর কথা বলার ভঙ্গি ও কথাগুলোর মধ্যে স্পষ্টই যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পায়।

কিরীটী সেটা বুঝতে পেরেই মৃদু হেসে বলে, আমি আর কি বলব মিঃ চক্রবর্তী? আপনিই যখন এসে পড়েছেন—আপনার কি আর কিছু জানতে বা বুঝতে বাকি থাকবে?

কিরীটীর তোষামোদে মণীশ চক্রবর্তী একটু যেন প্রসন্ন হলেন।

নেহাত লোকটা অর্বাচীন নয় বোধ হয়, মনে হয় তাঁর।

তবু আপনি তো প্রথম থেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন, তা সত্যিই কি আপনার ব্যাপারটা একটা মার্ডার বলেই মনে হয়? সত্যিই লোকটাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কিরীটীবাবু?

এত তাড়াতাড়ি কি কিছু বলা যায়? আপনিই বলুন না মিঃ চক্রবর্তী, আপনার তো এই লাইনে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে!

তা ঠিক, তবে জবানবন্দি না নিয়ে কিছু বলতে পারছি না; তবে এটা ঠিক—ওঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাই হয়েছে। আর ঐ শ্যামলকুমার আর—

তারপরই একটু থেমে বললেন, কি নাম যেন মেয়েটির বললেন?

সুভদ্রা।

হ্যাঁ, সুভদ্রা—ওরা দুজনেই এর মধ্যে আছে। বুঝলেন মিঃ রায়, আপনার সব কথা শোনবার পর মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক-ঘটিত ঈর্ষা। আর সেই ঈর্ষা থেকেই হত্যা।

অসম্ভব নয় কিছু।

ছয়

তাহলে এবার এদের সকলের জবানবন্দি নেওয়া যাক, কি বলেন মিঃ রায়? কথাটা বলে মণীশ চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন।

নিন না। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তো—

কি, বলুন?

এই ঘরে আমি—

থাকবেন জবানবন্দি নেওয়ার সময়?

হ্যাঁ।

থাকুন, থাকুন। আপত্তির কি আছে এতে?

ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে কত কিছু শিখবার আছে। কেমন করে আপনারা জবানবন্দি নেন, তার process—

শিখতে চান? বেশ, বেশ। কিউরিয়সিটি থাকা ভাল—ওতে জ্ঞানবৃদ্ধি পায়।

কিরীটীর বোধ হয় লোকটার পাকামি সহ্য হচ্ছিল না, তাই বললে, হ্যাঁ, আপনাদের বর্তমান আই. জি. মিঃ মল্লিক তাই বলেন।

মিঃ মল্লিক! তাঁকে আপনি চেনেন নাকি? সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় মণীশ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরে।

সুকান্ত মল্লিক আমার বিশেষ বন্ধু।

আ—আপনার বন্ধু আমাদের বড়সাহেব, তা এ কথাটা এতক্ষণ বলেননি কেন?

আপনার কাছে কি সেকথা বলতে পারি?

পারবেন না কেন? হাজারবার পারেন। তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন—বসুন। মণীশ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ও চেহারা যেন সম্পূর্ণ পাল্টে যায় মুহূর্তেই, ভদ্রলোক যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

কুণ্ডু মশাই, ও কুণ্ডু মশাই? চেঁচিয়ে ওঠেন মণীশ চক্রবর্তী।

গৃহকর্তা রমণীমোহন কুণ্ডু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, কিছু বলছিলেন স্যার?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঁর বসবার জন্য একটা চেয়ার এনে দিন।

এখুনি এনে দিচ্ছি স্যার।

হ্যাঁ, তারপর পাল মশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিন।

রমণীমোহন কুণ্ডু যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলেন, তেমনি আবার হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিঃ চক্রবর্তী?

বলুন।

আমি যদি আপনার জবানবন্দি নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা প্রশ্ন করি?

একশোবার করবেন। হাজারবার করবেন।

কিরীটী মনে মনে হাসল, চাকরির কি মহিমা! আই. জি. সুকান্ত মল্লিকের সঙ্গে আলাপ আছে শুনেই মণীশ চক্রবর্তী একেবারে যেন বিনয়াবনত, বশংবদ।

আরও মিনিট দশেক পরে।

প্রথম জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছিল দলের অধিকারী রাধারমণ পালের। মণীশ চক্রবর্তী প্রশ্নাদি করবার পর কিরীটী মুখ খুলল।

পাল মশাই, শুনেছি হরিদাস সামন্ত একদিন আপনার পার্টনার ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

তা পার্টনারশিপ ছেড়ে দিলেন কেন?

আপনি তো তার বন্ধুজন ছিলেন, জানেন না তার চরিত্রের কথা?

দীর্ঘদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না—

ওর দুটি বিশেষ ব্যাধি ছিল।

ব্যাধি?

হ্যাঁ। একটি মদ্যপান, আর—

আর ?

স্ত্রীলোক সম্পর্কে ওর একটা বিশ্রী দুর্বলতা, তাই তো—

কি ?

একের নম্বরের যাকে বলে লম্পট। ঐ দুটি রোগই তো ওর সর্বনাশ করেছিল। নচেৎ অভিনয়-প্রতিভা যেমন ছিল লোকটার তেমনি অন্য দিক দিয়ে সৎও ছিল। কিন্তু ঐ যে মদ্যপান ও স্ত্রীলোক-ব্যাধি, সর্বগুণ হরে নিয়েছিল। নইলে মনে করুন কিনা, সুভদ্রা মেয়েটা তো ওর মেয়ের বয়সী না কি—

বাধা দিল কিরীটী, থাক ওকথা। আচ্ছা সবার আগে আপনিই তাহলে সামন্ত মশাইকে মৃত আবিষ্কার করেন ?

আজ্ঞে।

এ ঘরে কি করতে এসেছিলেন, উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

না।

তবে ?

কিছু টাকা চেয়েছিলেন, সেই টাকা দিতে এসেই তো—

আপনি ঘরে ঢুকে দেখলেন, ঐভাবে বসে আছেন ?

হ্যাঁ, প্রথমটা তো বুঝতেই পারিনি, তারপর—

পাল মশাই ?

আজ্ঞে ?

নাটকের শেষ দৃশ্যে ছিল ভৃত্য গিয়ে আসরে খবর দেবে কর্তাবাবুর মৃত্যু হয়েছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

ভৃত্য কে সেজেছিল ?

ভৃত্য যে সাজত সে অনুপস্থিত আজ। তাই দোলগোবিন্দবাবুকে বলেছিলাম। দ্বিতীয় অঙ্কের পর তার তো পার্ট ছিল না, তাই বলেছিলাম সে-ই যেন ভৃত্যের মেকআপ নিয়ে আসরে গিয়ে কথাগুলো বলে আসে।

পাল মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, কিন্তু তিনি তো যাননি।

যাননি! সে কি! দোলগোবিন্দবাবু যাননি ?

না। ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। নাটকটি শেষ হতে পারেনি। কিরীটী অতঃপর দৃশ্যের শেষ ব্যাপরটা খুলে বললে।

দাঁড়ান তো, দোলগোবিন্দবাবুকে ডাকি।

ব্যস্ত হবেন না পাল মশাই, পরেও কথাটা জিজ্ঞাসা করলে চলবে।

কেন গেল না—

এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো?

কি প্রশ্ন?

মণীশ চক্রবর্তী খিঁচিয়ে ওঠেন, জানতে চান উনি তার জবাব দিন।

আজ্ঞে?

পাল মশাই? কিরীটী ডাকল, এই ব্যাপারে আপনার দলের কাউকে কি সন্দেহ হয়?

সন্দেহ? সন্দেহ কাকে করব? না না, আমার দলের মধ্যে কেউ এমন কাজ করতে পারেই না। তাছাড়া সামন্ত মশাইকে দলের সকলই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত, ভক্তি করত।

মণীশ চক্রবর্তী ঐ সময় প্রশ্ন করলেন, শ্যামলকুমার?

শ্যামলকুমার!

হ্যাঁ, তার সঙ্গে তো শুনলাম সুভদ্রা বলে আপনার দলের মেয়েটিকে নিয়ে সামন্তর সঙ্গে রীতিমত একটা রেষারেষি চলছিল ইদানীং।

না না, রেষারেষি আবার কি! সামন্ত মশাইয়ের অবিশ্যি মনে তাই হয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, সুভদ্রা সেরকম মেয়ে নয়, ওটা সামন্ত মশাইয়ের মনের ভুল। তাছাড়া শ্যামল ছেলেটি যেমন ভদ্র তেমনি ধীরস্থির, এসব খুনখারাপির মধ্যে সে থাকতেই পারে না।

ঠিক আছে। মণীশ চক্রবর্তী বললেন।

কিন্তু পাল মশাই, আমাদের ধারণা, কিরীটী বললে, আপনাদের দলেরই কেউ সামন্ত মশাইকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে।

এ আপনি কি বলছেন? না না, হয়তো—

কি?

সামন্ত মশাই আত্মহত্যা করেছেন।

আত্মহত্যা!

কেন, পারেন না?

তা পারেন—তবে বোধ হয় তা করেননি। ঠিক আছে, আপনি দয়া করে শ্যামলকুমারকে এখন একবার পাঠিয়ে দিন।

রাধারমণ পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। একটু পরে শ্যালকুমার এসে ঘরে ঢুকল।

মণীশ চক্রবর্তীই প্রথমে তাকে নানাবিধ প্রশ্ন শুরু করলেন, একটার পর একটা। অবশেষে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে একসময় বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করবেন নাকি কিছু? জিজ্ঞাসা করবার আর কিছু আছে?

কিরীটী তাকাল শ্যামলকুমারের দিকে।

শ্যামলকুমার যেন কেমন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

হাতের আঙুলগুলো নিয়ে কেবলই নাড়াচাড়া করছে।

শ্যামলবাবু!

আজ্ঞে?

সুজিতবাবু বলছিলেন তখন—

কি—কি বলছিলেন সুজিতবাবু?

আজকের তৃতীয় অঙ্কের শুরু হবার পর একবার আপনি এই ঘরে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, এসেছিলাম। সামন্তদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সে কথা তো তখুনি আপনাকে বললাম।

হ্যাঁ বলেছেন, তা কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা বলেননি।

সামন্তদার মনে ইদানীং একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল—

জানি। আপনার ইদানীং সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার জন্য। তিনি আদপেই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি—আপনি কি করে জানলেন? শ্যামলকুমার প্রশ্ন করে।

জানি। তারপর একটু থেমে—এবার বলুন শ্যামলবাবু, সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে সত্যিই কি আপনার—

হ্যাঁ, আমি তাকে তাকে ভালবাসি।

আর সুভদ্রা দেবী?

সেও আমাকে ভালবাসে।

হুঁ। তা কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?

ঘরে এসে ঢুকতেই আজ উনি আমাকে বললেন, শেষবারের মত তোমাকে বলছি শ্যামল, আমাদের ভিতর থেকে তুমি সরে দাঁড়াও, নচেৎ এমন শিক্ষা তোমাকে পেতে হবে যে জীবন দিয়ে তোমাকে তা শোধ করতে হবে।

আপনি কি জবাব দিলেন?

আমি বলেছিলাম, এই জন্যই যদি ডেকেছেন জানলে আসতাম না—যা বলবার আপনি সুভদ্রাকে বলবেন। সে যদি আমাকে না চায় তো আমি নিশ্চয়ই সরে দাঁড়াব।

আর কোন কথা হয়নি?

না।

তারপর আর এ ঘরে আপনি আসেননি?

না।

আচ্ছা, এ ব্যাপারে আপনার দলের কাউকে সন্দেহ হয় ?

না।

আর কারও সঙ্গে দলের মধ্যে হরিদাসবাবুর কোন মনোমালিন্য বা ঝগড়াঝাঁটি কখনও হয়েছে বলে জানেন ?

সুজিতের সঙ্গে তো ওঁর খিটিমিটি লেগেই ছিল।

তাই নাকি ? কেন ?

তা জানি না, তবে—

তবে ?

এককালে শুনেছি ওর অবস্থা নাকি খুব ভাল ছিল, রেস খেলে ও মদ্যপান করে সব খুইয়েছে সুজিতবাবু। তাছাড়া—

তাছাড়া ?

শুনেছি সুভদ্রাকে ও-ই দলে এনেছিল। একসময় সুভদ্রার সঙ্গে ওর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সামন্তদা আসার পর থেকেই সামন্তদার সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল সুভদ্রা।

আচ্ছা, সুভদ্রাকে আপনার কি রকম মনে হয় ?

খুব ভাল মেয়ে।

আজ পালা শেষ হবার পর রাত্রে সুভদ্রা বলছিল বর্ধমান যাবে। আপনি জানেন সেকথা ?

হ্যাঁ, আমাকে ও বলেছিল।

আপনারও সঙ্গে যাবার কথা ছিল কি ?

না।

কেন যাবে বলেছিল সুভদ্রা বর্ধমানে, জানেন কি ?

তার এক মাসী বর্ধমানে নাকি থাকে, তার অসুখ, তাকেই বলেছিল দেখতে যাবে বর্ধমানে।

আপনাকে সঙ্গে যেতে বলেনি ?

বলেছিল, কিন্তু আমি বলেছিলাম যাব না।

ঠিক আছে, আপনি যান, সুজিতবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন।

শ্যামলকুমার চলে গেল।

মণীশ চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে তাকালেন, ছেলেটাকে কি রকম মনে হল কিরীটীবাবু ?

আপনার কি মনে হল ?

গভীর জলের মাছ। তা বাছাধন জানেন না যে আমারও এ লাইনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। তাছাড়া ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। এ আপনাকে আমি বলে রাখছি, ঐ—ঐ হচ্ছে—

মণীশ চক্রবর্তীর কথা শেষ হল না।

সুজিতকুমার এসে ঘরে ঢুকল।

সুজিতকে প্রথমে মণীশ চক্রবর্তী প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

কিরীটী তখন ঘরের চারিদিকে আবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঘরটা ভাল করে দেখা হয়নি। হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ল, দরজার গোড়ায় একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো। কিরীটী গিয়ে নীচু হয়ে সিগারেটের টুকরোটা তুলে নিতে গিয়ে নজরে পড়ল যে চেয়ারের উপরে হরিদাস সামন্তর মৃতদেহটা উপবিষ্ট, তার নীচে কি একটা পড়ে আছে, চকচক করছে।

মণীশ চক্রবর্তী তখন সুজিতকে নিয়ে ব্যস্ত, সেদিকে নজর দেবার মত অবকাশ ও মন কোনটাই ছিল না। সে তাকালও না কিরীটীর দিকে।

কিরীটী নীচু হয়ে চকচকে বস্তুটি তুলে নিয়ে দেখল একটা শৌখীন গালার চুড়ির ভগ্নাংশ, আয়না কাঁচের চুমকি বসানো। সেই আয়না কাঁচের উপরেই আলো পড়ে ঝিলিক দিচ্ছিল।

সিগারেটের শেষাংশটাও পরীক্ষা করল।

চারমিনার সিগারেট—এবং সেই সিগারেটটা যে খাচ্ছিল সে নিশ্চয়ই পান খেয়েছিল, কারণ শেষাংশে পানের ছোপ শুকিয়ে আছে।

দুটো বস্তুই কিরীটী পকেটে রেখে দিল সযত্নে।

মিঃ রায়—

মণীশ চক্রবর্তীর ডাকে কিরীটী ওর দিকে তাকাল।

ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন নাকি?

দু-একটা প্রশ্ন করব। সুজিতবাবু, আপনি বলেছিলেন তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পর আপনি একবার শ্যামলকুমারকে এ ঘরে আসতে দেখেছিলেন!

হ্যাঁ।

তখন রাত ক'টা হবে বলে আপনার মনে হয়?

কত আর হবে, রাত সোয়া দশটা কি সাড়ে দশটা।

শ্যামলবাবু এ ঘরে কতক্ষণ ছিলেন জানেন?

তা মিনিট পনের-কুড়ি হতে পারে।

বুঝলেন কি করে? আপনি বুঝি ততক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন?

তা কেন! আমি—আমি চলে গিয়েছিলাম।

তাহলে জানলেন কি করে শ্যামলবাবু এ ঘরে মিনিট পনের-কুড়ি ছিলেন?

মানে মিনিট পনের-কুড়ি বাদে এদিকে আসছিলাম, তখন তাকে বেরুতে দেখেছিলাম

এই ঘর থেকে।

হুঁ। তাদের পরস্পরের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল বলতে পারেন?

তা কেমন করে বলব! আমি তো আর ঘরে যাইনি।

তা ঠিক। তবে অনুমান তো করতে পারেন?

অনুমান!

হ্যাঁ, অনুমান।

না।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—

কি?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও তো তাদের দু-একটা কথা আপনার কানে আসতে পারে?

না মশাই, তাছাড়া কোথাও আড়ি পাতা আমার অভ্যাস নেই।

হঠাৎ কিরীটী বলে, আপনি খুব পান খান সুজিতবাবু মনে হচ্ছে?

সুজিত একমুখ পান নিয়ে চিবোচ্ছিল। দোক্তাসিক্ত লালচে এবড়োখেবড়ো দু'পাটি দাঁত বার করে সুজিত বললে, হ্যাঁ, সর্বক্ষণ পান-দোক্তা না হলে আমার চলে না।

আর কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই আপনার সুজিতবাবু?

আসক্তি তো অনেক কিছুর উপরেই ছিল, কিন্তু একে একে সবই ছেড়েছি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, বড় বদ অভ্যাস। আর বদ অভ্যাসের উপর একবার আসক্তি জমলে তা সে যেমনই হোক না কেন ছাড়তে বড় কষ্ট হয়।

তা তো হবারই কথা। তা ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করেন না?

একসময় করতাম, এখন পেলে করি, না পেলে করি না, বুঝলেন না—মানে ঐ আর কি, পরের পয়সায়—বলতে বলতে সুজিত পানের রসে রাঙানো লালচে দাঁতগুলো বের করে হাসল।

কিরীটীর যেন সে হাসি দেখে গা ঘিনঘিন করে।

আর সিগারেট? ধূমপান?

পানের সঙ্গে ওটা ঠিক জমে না, বুঝলেন না!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তবে মিথ্যে বলব না, খাই। মানে ধূমপানে অভ্যস্ত আমি।

কি ব্র্যাণ্ড খান?

যা পাই।

আপনার পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আছে?

হ্যাঁ। সুজিত পকেটে হাত চালিয়ে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অর্ধেক খালি বাক্সটার।

কিরীটী সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে ফিরিয়ে দিল।

সুজিতবাবু, আচ্ছা হরিদাস সামন্ত পান খেতেন ?

সুজিত লালচে দাঁতগুলো বের করে বললে, হ্যাঁ। তবে পাতা পান নয়, বোতল পান করতেন, মাত্রাধিক্যেই।

আর সিগারেট ?

হ্যাঁ, তাও খেতেন।

কি ব্র্যাণ্ড খেতেন বলতে পারেন ?

চারমিনার।

আচ্ছা সুজিতবাবু ?

আজ্ঞে !

শ্যামলকুমার লোকটি কেমন ?

ছুঁচো।

কি রকম ?

ছুঁচো যেমন সর্বদা ছোঁকছোঁক করে, তারও অভ্যাসটি তেমনি।

কি রকম ? কিসের জন্য ছোঁকছোঁক করতেন ?

বুঝলেন না ?

না।

স্ত্রীলোক—বুঝলেন, স্ত্রীলোক !

হুঁ। তা এ দলে কোন মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল নাকি ?

কেন—হরিদাস সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু আপনি, শোনেননি তার কাছে কিছু ?

না।

তার স্ত্রীলোকটির উপরেই যে নজর ছিল শ্যামলকুমারের !

তাই নাকি ? একটু থেমে কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা সুজিতবাবু, হরিদাস সামন্তর সঙ্গে শ্যামলকুমারের কি রকম সদ্ভাব ছিল বলুন তো ?

সাপে-নেউলের সম্পর্ক যেমন তেমনি ধরনের সদ্ভাব ছিল বলতে পারেন।

কেন বলুন তো ?

ঐ যে একটু আগেই বললাম—বুঝলেন না !

মানে ?

মানে সামন্ত মশাইয়ের মেয়েমানুষ ছিল সুভদ্রা, শ্যামলকুমার এসে সেই মেয়েমানুষটিকে

হাতিয়ে নিয়েছিল। তার ফলে যা হবার তাই হয়েছিল।

হুঁ। আচ্ছা আর একটা কথা—

কি, বলুন?

আগে তো, মানে শ্যামলকুমার আসার আগে এ দলে বোধ হয় হিরোর পার্ট আপনিই করতেন, তাই না?

করতাম, আর এখনও করতে পারি। শুধু তো মাকাল ফলের মত চেহারাই হলে হয় না মশাই, অভিনয়-বস্তুটি হচ্ছে একটা আর্ট, বুঝলেন, গড়গড় করে তোতাপাখীর মত খানিকটা শেখানো বুলি আওড়ে গেলেই সেটা অভিনয়—acting হয় না। শ্যামল অভিনয়ের কি বোঝে! কিন্তু পাল মশাইয়ের কি সে খেয়াল আছে?

আপনার অভিনয় কিন্তু আজ আমার সত্যি চমৎকার লেগেছে।

লেগেছে তো? লাগতেই হবে। আপনাদের মত অভিনয়রসিক বলেই বুঝেছেন

আচ্ছা, হরিদাস সামন্ত কেমন অভিনয় করতেন?

এককালে ভাল অভিনয়ই করত। কিন্তু ঐ যে মহা দুটি ব্যাধি—মদ আর স্ত্রীলোক, ওতেই ওর সর্বনাশ হল।

আপনি বলতে চান তাহলে মেয়েমানুষের জন্যই ওর প্রাণটা গেল?

নির্ঘাত।

মেয়েমানুষটি তাহলে আপনার মনে হয়—

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের সুভদ্রা দেবী। সাক্ষাৎ কালনাগিনী, বুঝলেন—বিষকন্যা!

সাত

বিষকন্যা কেন বলছেন?

যে কন্যার সংস্পর্শই বিষ, সে-ই তো প্রাণঘাতিনী বিষকন্যা।

তা বটে। তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, সুজিতবাবু, এবারে সত্যি করে বলুন তো, আজ অভিনয় শুরু হবার পর একবারও কি এ ঘরে আপনি আসেননি?

না।

ঠিক বলছেন?

নিশ্চয়ই।

মনে করে আবার ভাল করে ভেবে বলুন?

ভাবাভাবির বা মনে করবার কি আছে? আসিনি।

কিন্তু আমি যদি বলি—

কি?

আজ অভিনয় শুরুর পরে এ ঘরে আপনি এসেছিলেন!

না।

সুজিতবাবু, আমার হাতে প্রমাণ আছে যে আপনি এ ঘরে এসেছিলেন।

প্রমাণ? এ কি বলছেন মশাই?

কিরীটীর মনে হল গলাটা যেন কেমন বসে গেছে হঠাৎ সুজিতকুমারের।

গলার স্বরটা যেন ঠিক স্পষ্ট নয়।

কিরীটী বুঝতে পারে তার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। বলুন, কেন এসেছিলেন?

আমি আসিনি।

আপনার জামার পকেটে ওটা কি উঁচু হয়ে আছে? দেখি বের করুন তো?

ওটা একটা হাফ পাইন্ট্ বোতল।

বোতলটা বের করুন।

সুজিত পকেট থেকে একটা কালো চ্যাপ্টা মত হাফ পাইন্ট্ বিলিতি মদের বোতল বের করল।

কি আছে ওতে?

হুইসকি।

দেশী না বিলিতি?

দেশী।

বোতলটা তো দেখছি অর্ধেকের বেশী খালি। এটা কি পরস্মৈপদী নাকি?

মানে?

কেউ কি দিয়েছে?

হ্যাঁ।

কে দিল?

পাল মশাই। তারপরই একটু থেমে বলল, অভিনয়ের রাত্রে বিশেষ করে অভিনয়ের সময় মধ্যে মধ্যে না পান করলে আমি অভিনয় করতে পারি না। তাই পাল মশাই অভিনয়ের রাত্রে একটা পাইন্ট্ বোতল আমাকে দিয়ে থাকেন।

কিরীটী ক্ষণকাল অতঃপর সুজিতকুমারের দিকে চেয়ে রইল।

আমি এবারে যেতে পারি?

হ্যাঁ। কিন্তু বোতলটা আমার চাই, দিন।

বোতলটা!

হ্যাঁ, দিন।

নিন।

সুজিত বোতলটা কিরীটীর হাতে তুলে দিল। কিরীটী বোতলটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখল, তারপর সেটা সামনের টেবিলের উপরে রেখে দিল।

আচ্ছা, এবারে আপনি যেতে পারেন।

সুজিতকুমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মণীশ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি সত্যিই আজ রাত্রে একবার এ ঘরে এসেছিল বলে আপনার মনে হয় মিঃ রায়?

মনে হয় নয়, এসেছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার কেমন যেন খট্‌কা লাগছে।

কি বলুন তো?

কিছু না। সুভদ্রা দেবীকে এবারে ডাকান তো!

এখুনি ডাকছি।

মণীশ চক্রবর্তী ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে সুভদ্রাকে ঐ ঘরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বললেন।

একটু পরে সুভদ্রা এল। কেঁদে কেঁদে তার দু'চোখের পাতা ফুলে উঠেছে।

চোখের পাতায় তখনও জল বোঝা যায়।

সুভদ্রা ইতিমধ্যেই তার অভিনয়ের সাজপোশাক ছেড়ে ফেলেছে।

পরনে সাধারণ একটি লাল রংয়ের চওড়াপাড় তাঁতের শাড়ি।

কিরীটী লক্ষ্য করল মুখের প্রসাধনও তুলে ফেলেছে সুভদ্রা ইতিমধ্যেই।

মণীশ চক্রবর্তী প্রথমে তার প্রচলিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনিই সুভদ্রা দেবী?

জলে ভরা চোখ দুটি তুলে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সুভদ্রা সম্মতি জানাল।

অনেক দিন এ দলে আছেন?

হ্যাঁ।

সুজিতবাবু বলছিলেন আপনাকে তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময়ে একবার নাকি এ ঘরে আসতে দেখেছিলেন।

সুজিতবাবু ঠিকই দেখেছিলেন। এসেছিলাম।

কেন?

সামন্ত মশাই আমাকে ডেকেছিলেন।

কিরীটী নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুভদ্রার সারা দেহ।

মণীশ চক্রবর্তী আবার প্রশ্ন করেন, কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

বলেছিলাম বর্ধমানে যাব, তাই বারণ করলেন যেন না যাই।

বর্ধমানে কেন যেতে চেয়েছিলেন?

মাসীর খুব অসুখ।

তারপর কতক্ষণ ছিলেন ?

মিনিট দশেক।

ঐ সময় কিরীটীর দিকে তাকিয়ে মণীশ চক্রবর্তী বললেন, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ওঁকে ?

কিরীটি সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বললে, সুভদ্রা দেবী, শুনলাম সুজিতবাবুই আপনাকে একদিন এই যাত্রাদলে এনেছিলেন ?

হ্যাঁ।

সুজিতবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?

আমি এই যাত্রার দলে আসার আগে মধ্যে মধ্যে অ্যামেচার ক্লাবে প্লে করতাম। সুজিতবাবু একবার আমার প্লে দেখে আলাপ করেন। তারপর আমি যাত্রার দলে যোগ দিতে চাই কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, হ্যাঁ। তখন উনি নিয়ে আসেন আমাকে। সেই থেকেই আমাদের পরিচয়।

তার আগে পরিচয় ছিল না ? ওঁকে জানতেনও না ?

না।

আপনার মা বাবা ভাই বোন নেই ?

না। ছোটবেলায় মা-বাবা মারা যায়, তারপর মাসীর কাছেই আমি মানুষ।

বর্ধমান থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতেন ?

তা কেন !

তবে ?

আমি পনের বছর বয়সেই কলকাতায় চলে আসি আমার স্বামীর সঙ্গে।

আপনার বিয়ে হয়েছিল ?

হয়েছিল।

স্বামী এখন কোথায় ?

কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

কতদিন আগে ?

বছর দশেক আগে, বুঝতেই পারছেন। তারপর লেখাপড়া শিখিনি, বাঁচতে তো হবে, কাজেই এখানে-ওখানে অভিনয় শুরু করলাম।

ইদানীং হরিদাস সামন্তর সঙ্গেই বোধ হয় ঘর করছিলেন ?

সুভদ্রা মাথা নীচু করল।

সুভদ্রা দেবী !

বলুন ?

আপনি যখন তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময় এ ঘরে আসেন, সামন্ত মশাই তখন কি

করছিলেন মনে আছে আপনার ?

চুপচাপ বসেছিলেন।

তিনি মদ্যপান করছিলেন, না ?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় করছিলেন।

তাহলে ঘরে বোতল একটা নিশ্চয়ই থাকত, বোধ হয় তিনি মদ্যপান করছিলেন না! মনে করে বলুন তো ?

কি বললেন ?

বলছি তিনি তখন মদ্যপান করছিলেন না বোধ হয়!

তা হবে। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।

কোন গ্লাস ঘরে ছিল ?

গ্লাস!

হ্যাঁ, ঐ কাঁচের গ্লাসটা—কিরীটী অদূরে টুলের উপরে রক্ষিত শূন্য কাঁচের গ্লাসটা দেখাল।

দেখিনি।

হুঁ। আচ্ছা, ইদানীং আপনার সঙ্গে তাঁর মন-কষাকষি চলছিল, তাই না ?

অত্যন্ত সন্দেহ-বাতিক ছিল লোকটির—

স্বাভাবিক। নিম্নকণ্ঠে কিরীটী কথাটা উচ্চারণ করল।

কিছু বললেন ?

না। আচ্ছা, কে আপনাদের মধ্যে সামন্ত মশাইকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?

বিষ!

হ্যাঁ, তীব্র কোন বিষপ্রয়োগেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে।

না না, ওর হার্টের ব্যামো ছিল, ব্লাড-প্রেসারও ছিল।

তা হয়তো ছিল, তবে তাঁর মৃত্যু বিষের ক্রিয়াতেই হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

কিন্তু কে তাকে বিষ দেবে ? কেউ তো তার শত্রু এখানে ছিল না ?

কার মনে কি আছে আপনি জানবেন কি করে। তারপরই হঠাৎ কিরীটী বললে, আপনার ডান হাতের কবজির কাছে রক্তের দাগ কিসের দেখি। দেখি হাতটা আপনার ?

রক্তের দাগ—কই! না তো, ও কিছু না! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সন্ধ্যার সময় সাজ-ঘরের টিনের পার্টিশনের একটা পেরেকে হাতটা কেটে গিয়েছিল কবজির কাছে।

অভিনয়ের সময় দেখেছিলাম, আপনার দু'হাতে কাঁচের আয়নার চুমকি বসানো দুটি চুড়ি। চুড়ি দুটো বুঝি খুলে রেখেছেন ?

হ্যাঁ। সাজঘরে বাক্সর মধ্যে।

নিয়ে আসতে পারেন চুড়ি দুটো?

সুভদ্রা কেমন যেন এবারে একটু থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে থাকে। কেমন যেন একটু মনে হয় ইতস্তত ভাব একটা।

কই, যান? নিয়ে আসুন চুড়ি দুটো?

সুভদ্রা বেরুচ্ছিল, কিন্তু কিরীটী তাকে আবার কি ভেবে বাধা দিল, না, আপনি না। মণীশ চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ চক্রবর্তী, বাইরে কাউকে বলুন তো, সুভদ্রা দেবীর সাজঘর থেকে চুড়ি দুটো নিয়ে আসতে।

মণীশ চক্রবর্তী বের হয়ে গেলেন।

ঘরে এবারে একা সুভদ্রা।

সুভদ্রা যেন বেশ একটু বিব্রতই বোধ করে, অথচ মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও কিরীটীর বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হয় না।

কিরীটী সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

সুভদ্রা দেবী!

অ্যাঁ! আমায় কিছু বলছিলেন?

সুভদ্রা দেবী, আমার নামটা বোধ হয় আপনি জানেন না—

সামন্ত মশাই যে বলছিলেন, ধূর্জটি রায় আপনার নাম!

নামটা আপনার মনে আছে দেখছি। কিন্তু ওটা তো আমার আসল নাম নয়।

তবে?

ওটা আমার অন্য একটি নাম, বিশেষ করে নামের আড়ালে যখন আমি আমাকে কিছুটা গোপন করতে চাই। বলতে পারেন ছদ্মনাম।

ছদ্মনাম!

হ্যাঁ।

সুভদ্রা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ।—কিরীটী রায় নামটা কখনও শুনেছেন?

কিরীটী রায়! আপনি কি তবে সেই বিখ্যাত রহস্যানুসন্ধানী—একটা ঢোঁক গিলে কেমন যেন শুকনো গলায় থেমে থেমে কথাগুলো টেনে টেনে উচ্চারণ করল সুভদ্রা।

হ্যাঁ, আমিই সেই।

তবে আপনি—

না। সামন্ত মশাইয়ের বন্ধু আমি কোনদিনও ছিলাম না—তাঁর সঙ্গে পরিচয় মাত্র আমার কয়েকদিন আগে। এবং আরও বোধ হয় আপনার একটা কথা জানা দরকার, তিনি মৃত্যু-আশঙ্কা করছিলেন বলেই আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

মৃত্যু-আশঙ্কা !

হ্যাঁ, তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁকে হত্যা করা হবে।

কে—কে তাকে হত্যা করবে ?

হত্যা যে কেউ তাঁকে করেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন, ঐ সামনে তাঁর বিষ-জর্জরিত মৃতদেহ—আর এও আমি জানি—

কি—কি জানেন ?

আপনারা যাঁরা আজ রাত্রে এখানে উপস্থিত হয়েছেন অভিনয়ের ব্যাপারে—সেই আপনাদের মধ্যেই কেউ একজন তাঁকে হত্যা করেছেন।

কিরীটী শান্ত ধীর গলায় কথাগুলো বলে গেল।

কে—কে তাকে হত্যা করেছে ?

আপনিই অনুমান করুন না, কে তাঁকে হত্যা করতে পারে !

ঐ সময় মণীশ চক্রবর্তী পুনরায় এসে ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একটি গালার চুড়ি।

একটিই পেয়েছেন—জোড়ার অন্যটা পাননি তো ? কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

না, একটিই পেলাম।

জানতাম পাবেন না। সুভদ্রা দেবী, জোড়ার অন্য চুড়িটা কোথায় গেল ? সুভদ্রার দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী তার কথাটা প্রশ্নের ভিতর দিয়ে শেষ করল।

স.—জানি না, ওখানেই তো খুলে রেখেছিলাম !

না, রাখেননি।

রাখিনি—কি বলছেন আপনি ?

ঠিকই বলছি ! অন্যটা ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছে !

হ্যাঁ, তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার পরই কোন এক সময় ভেঙে গিয়েছিল। কারণ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময়—আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, হাতে আপনার চুড়ি ছিল। তা কি করে ভাঙল ?

সুভদ্রা চুপ। একেবারে যেন বোবা, বিমূঢ়।

জবাব দিন—এই ঘরের মধ্যেই, না ? কিন্তু ভাঙল কি করে ?

হ্যাঁ, এই ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা লেগে চুড়িটা ভেঙে যায়।

আপনি মিথ্যে বলেছেন, যেমন একটু আগে বলেছিলেন, পেরেকে হাত কেটেছেন !

কিন্তু—

বলুন সত্যি কথাটা ?

মিথ্যে আমি বলিনি।

বলেছেন। এবার বলুন তো—আপনি সন্তানসম্ভবা, তাই--

হ্যাঁ। মাথাটা আবার নীচু করল সুভদ্রা।

কার সন্তান আপনার গর্ভে?

সামন্ত মশাইয়ের।

তিনি জানতেন কথাটা?

জানতেন।

আশ্চর্য! অস্ফুট স্বরে কথাটা কিরীটী উচ্চারণ করল।

কি বললেন?

কিছু না। আপনি যেতে পারেন। পাল মশাইকে এ ঘরে পাঠিয়ে দিন।

সুভদ্রা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত শেষ হয়ে আসছিল। গ্রীষ্মের স্বল্পায়ু রাত্রি। খোলা জানলাপথে একটা ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া আসছিল।

রাধারমণ পাল এসে ঘরে ঢুকলেন।

ইতিমধ্যেই কিরীটীর পরামর্শে মণীশ চক্রবর্তী একটা চাদরে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়েছিলেন চেয়ার থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন পাল মশাইয়ের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমায় ডেকেছেন?

পাল মশাই!

কিরীটীর ডাকে রাধারমণ পাল ওর মুখের দিকে তাকালেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

বলুন?

সুজিতবাবুকে আজ আপনি একটা পাইন্ট্ বোতল দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

অভিনয়ের রাত্রে আপনি প্রত্যেক বারই দিতেন?

আজ্ঞে।

পাল মশাই, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। কিরীটী বললে।

কি বলুন?

আপাতত যতদিন না সামন্ত মশাইয়ের মৃত্যুরহস্যের একটা মীমাংসায় পুলিস পৌঁছায় ততদিন আপনার দলের কয়েকজন কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। ভাল কথা, দোলগোবিন্দবাবু আছেন তো, তাঁকে একবার যদি ডেকে দেন, কয়েকটা প্রশ্ন তাঁকে করতে চাই।

না মশাই, তার কোন সন্ধানই পাচ্ছি না।

সন্ধান পাচ্ছেন না?

না।

আপনি জানেন না তিনি কোথায় গিয়েছেন?

না। হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ার কারণও তো কিছু বুঝতে পারছি না।

কিরীটী একটু যেন কি ভাবল, তারপর বললে, তিনি তো অনেক দিন আপনার দলে আছেন?

হ্যাঁ, তা ধরুন প্রায় বছর সাতেক তো হবেই। তবে মনে হচ্ছে—

কি?

ফ্রেঞ্চ লিকারের সন্ধানে বোধ হয় গিয়েছে। সারাটা দিনই উসখুস করছিল। কিন্তু আমি যেতে দিইনি। নেশা করলে ওর হুঁশ থাকে না। পার্ট করতে পারবে না। নচেৎ সে পালাবার লোক নয়। নেশা একটু বেশি করে বটে—লোকটা সাদাসিধে, ঘোর প্যাঁচ তেমন কিছু নেই।

আপনার দলের সকলেরই বোতল-প্রীতি রয়েছে। কিরীটী বললে।

আজ্ঞে।

আর কে কে মদ্যপান করে থাকেন এ দলে?

সবাই করে অল্পবিস্তর।

শ্যামলকুমার?

বলতে পারি না।

আপনি?

না, জীবনে আজ পর্যন্ত মদ স্পর্শ করিনি।

হুঁ। তাহলে ঐ কথাই রইল, ওরা যেন কলকাতার বাইরে না যায়।

কিন্তু আপনি দলের কাদের কথা বলছিলেন যারা পুলিসের বিনানুমতিতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না?

শ্যামলকুমার, সুজিতকুমার, সুভদ্রা দেবী আর আপনি ও দোলগোবিন্দবাবু।

রাধারমণ পাল যেন কেমন ফ্যালফ্যাল করে বোবা অসহায় দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর কিছুক্ষণ বাদে শুকনো গলায় প্রশ্ন করেন জিভটা দিয়ে ঠোঁট চেটে, কেন, আমাদের কি আপনি সন্দেহ করেন?

আপনাদের সকলের উপরই যে পুলিসের সন্দেহ পড়েছে তা নয়—

তবে?

বুঝতেই পারছেন আপনারা যাঁরা যাঁরা মৃত হরিদাস সামন্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এ

হত্যারহস্যের মীমাংসায় একটা পৌছতে হলে আপনাদের প্রত্যেকেরই, যাঁদের নাম করলাম আমাদের প্রয়োজন।

কিন্তু—ইতস্তত করলেন রাধারমণ পাল।

বলুন, থামলেন কেন ?

সত্যিই কি আপনারা মনে করেন হরিদাস সামন্তকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ?

পুলিসের ধারণা আপাতত তাই, তবে ময়নাতদন্তে যদি অন্য কিছু প্রকাশ পায়।

কিন্তু আমরা আমাদের এককালের একজন সহকর্মীকে হত্যা করতে যাবই বা কেন ?

সেটা জানতে পারলে তো সব কিছুর মীমাংসা হয়েই যেত পাল মশাই। যাক, যা বললাম সেই মত সকলকে বলে দিন। আর পরশু বা তরশু বিকেলের দিকে আপনাদের চিৎপুরের অফিসে যাব, ওদের সকলকে উপস্থিত থাকতে বলবেন।

আর উপস্থিত থাকা! দল বোধ হয় আমার ভেঙেই গেল রায় মশাই।

রাধারমণ পালের গলার স্বরটা যেন বুজে আসে।

না না, দল ভাঙবে কেন ?

কি বলেন, এর পরও দল আর থাকবে—তাছাড়া যা আপনারা বলেছেন তা যদি সত্যিই হয় —উঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না রায় মশাই, এ কি সর্বনাশ হল! এখন দেখতে পাচ্ছি সামন্ত মশাইয়ের কথাটা শুনলেই বোধ হয় ভাল হত, বার বার করে আমাকে বলেছিলেন সামন্ত মশাই, এ নাটক করবেন না, অন্য নাটক দেখুন। কিন্তু কি যে মাথায় তখন ভূত চাপল! সামন্ত মশাই নিজে তো গেলেনই, আমাকেও ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন অগাধ জলে।

কুণ্ডুভবন থেকে সকলের বিদায় নিতে পরের দিন বেলা দশটা হয়ে গেল।

কিরীটী আগেই চলে গিয়েছিল।

মণীশ চক্রবর্তীও লাস মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য চালান করে দিয়ে একসময় বিদায় নিলেন। রাধারমণ পাল সকলকে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন দশটায়। বেলা এগারোটায় একটা কলকাতাগামী ট্রেন আছে সেটাই ধরবেন।

গৃহে পৌছাতে কৃষ্ণা বললে, একেবারে রাত কাবার করে এলে, ব্যাপার কি ? যাত্রা শুনছিলে নাকি ? খুব ভাল যাত্রা হয়েছে বুঝি ?

যাত্রা আর শেষ হল কোথায় ? একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দিতে দিতে কিরীটী বললে, শেষ হওয়ার আগেই যবনিকাপাত।

কি রকম ?

সামন্ত মশাই—সেদিনের সে ভদ্রলোককে মনে আছে ? প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আমার

কাছে ছুটে এসেছিলেন! শেষ পর্যন্ত তাঁর আশঙ্কাটাই সত্য হল।

মানে!

কিরীটী তখন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বিবৃত করে গেল।

সব শুনে কৃষ্ণা বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, বল কি! শেষ পর্যন্ত তাহলে সত্যি-সত্যিই—

হ্যাঁ, বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু।

কে বিষ দিল?

সব তো তোমাকে বললাম—কে দিতে পারে বলে মনে হয়?

তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ?

একেবারে যে পারিনি তা নয়, তবে--

তবে? কৃষ্ণা সকৌতুক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

হত্যার একটা মোটিভ থাকাও দরকার। কিন্তু বর্তমানে হাতের কাছে যে মোটিভটা পাচ্ছি সেটা তেমন যেন খুব একটা জোরালো মনে হচ্ছে না।

আমার কি মনে হচ্ছে জান?

কি?

তোমার ঐ সুভদ্রা' না কি যেন নাম বলেছিলে মেয়েটির—

তুমি কি সুভদ্রাকেই—কিরীটীর কথাটা শেষ হল না।

কৃষ্ণা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কোন মেয়েছেলে যখন ভালবাসা নিয়ে খেলায় মাতে তখন তার কাছে নীতি বলে কিছুই থাকে না, আর—

আর কি?

মেয়েদের স্বার্থে ঘা লাগলে তখন তারা একজন পুরুষের চাইতে অনেক নীচে নামতে পারে।

নারী হয়ে তুমি একজন নারীর এত বড় অপযশ গাইছ কৃষ্ণা?

অপযশ গাইব কেন, সত্য যা তাই বলছি। তাছাড়া কোন পুরুষমানুষ কি কোন নারীর সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে পারে নাকি?

পারে না বুঝি?

না।

কেন?

কেন কি, সেইটেই তো পুরুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা।

কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার যুক্তিটা কি? ঐ স্বার্থে ঘা লেগেছে বলেই কি?

আমার কথাই বা তুমি মেনে নেবে কেন?

আর একটু প্রাঞ্জল যদি হতে দেবী—

আমার মনে হয় সুভদ্রার অনেকখানি অভিনয় আছে—

সে যে একজন পাকা অভিনেত্রী সেটা অ...

একটা কথা ভুলো না।

কি?

তোমায় বলেছি একটু আগে সুভদ্রা অন্তঃসত্ত্বা।

কৃষ্ণা মৃদু হাসল। বলল, বস, চা নিয়ে আসি।

কৃষ্ণা সোফা ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর চিন্তাধারাটাকে কিন্তু কৃষ্ণা যেন অন্য এক খাতে বইয়ে দিয়ে গেল। সে ভুল পথে চলেছে!

স্ত্রীলোকের মন বিচিত্র পথে আনাগোনা করে মিথ্যা নয়, এমনিতেই মেয়েদের সহজাত একটা অভিনয়-প্রবৃত্তি থাকে—তার উপরে সুভদ্রা তো রীতিমত অনুশীলনের দ্বারা এত বছর ধরে সেই অভিনয়-প্রতিভাকেই তার জ্বালিয়ে তুলেছিল।

সামান্য ইস্পাত আজ ঘষায় ঘষায় ধারালো হয়ে উঠেছে।

একটু পরে কৃষ্ণা দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

একটা কাপ কিরীটীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যটা নিজে নিয়ে মুখোমুখি বসল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কিরীটী বললে, কৃষ্ণা, আজ একবার বর্ধমানে যাব।

হঠাৎ বর্ধমান?

একটু ঘুরে আসি।

সুভদ্রার মাসীর খোঁজ নিতে?

হ্যাঁ। বোনঝিটির পরিচয় পেলাম, মাসীটির সঙ্গে যদি পরিচয় করা যায়—

কখন যাবে?

দুপুরে।

রাত ন'টা নাগাদ বর্ধমান থেকে ফিরে দেড়তলার ঘরে প্রবেশের মুখে দরজায় নজর পড়ল একজোড়া ভারী জুতোর।

মনে হচ্ছে মণীশ চক্রবর্তীর আগমন হয়েছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল তার অনুমান মিথ্যা নয়, বাইরে মণীশ চক্রবর্তীর জুতোই সে দেখেছে।

মণীশ চক্রবর্তী একটা চেয়ারে বসেছিলেন, সামনে একটা খালি চায়ের কাপ।

মণীশবাবু যে! কতক্ষণ?

তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হবে। মল্লিক সাহেবকে আপনি ফোন করেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

ক্ষণ-উত্তর

...র অফিসঘরে সময় পেলেই, জরুরী

...দায়ের কেউ

...ফিস কোন...

...পাস কাছে

...সখর।

...গেছে? হঠা

...করে

কাছে ছুটে এসেছিলেন ! শেষ পর্যন্ত তাঁর

মানে !

কিরীটী তখন সংক্ষেপে ব্যাপসম্মান করেছি বা কোনরকম অসহযোগিতা করেছি

সব শুনে কৃষ্ণা বিস্ময়ে

হ্যাঁ, বিষের ক্রিয়া ?

কে বিষ মনে হল যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

সব কান করে দেব'খন। বরং আমি আপনার দক্ষতার প্রশংসাই করছিলাম তাঁর

যাক, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা পেয়েছেন ?

হ্যাঁ, সন্ধ্যায় পেয়েছি। এই যে দেখুন। আপনার অনুমানই ঠিক—a case of poisoning, stomach contents-এর মধ্যে লিকারের সঙ্গে মনে হচ্ছে কোন তীব্র বিষ কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে

পাচ্ছি টেন্টস—

ভাল করেছেন। কাঁচের গ্লাস আর বোতলটাও পাঠিয়েছেন তো ?

তারপর একটু থেমে বললে, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন কিরীটীবাবু ?

বলুন তো ?

লালগোবিন্দ না কি যেন নাম—যে সে রাত্রে হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছে, এ তারই নিশ্চয় তারই কীর্তি।

থেকে পারে। তা হঠাৎ তারই উপরে সন্দেহটা পড়ছে কেন বিশেষ করে ?

, ব্যাটা হঠাৎ গা-ঢাকা দিলে কেন ? কিন্তু যাবে কোথায় ! আমি লোক ছি—ঠিক ধরবই ব্যাটাকে।

পারটা স্রেফ ভয় বা নার্ভাসনেসও তো হতে পারে মিঃ চক্রবর্তী !

না কিরীটীবাবু—আপনি যাই বলুন, এতকাল খুনে ডাকাতদের নিয়ে কারবার নারী ও মশাই সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আরও একটি লোককে আমার সন্দেহ যাটা একটি বাস্তু ঘুঘু—

কার কথা বলছেন ?

কার আবার—ঐ রাধারমণ পাল, দলের অধিকারী, কেমন ভিজে বেড়ালটির মত হাবভাব দেখাচ্ছিল !

ভদ্রলোক প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারেননি ?

ওটা স্রেফ অভিনয়। বুঝতে পারলেন না, ও দুটোকেই আমি ভাবছি অ্যারেস্ট করব। অ্যারেস্ট করে থানায় এনে চাপ দিলেই দেখবেন স্বীকার করতে পথ পাবে না। হুঁ, বলে কত দেখলাম ! মল্লিক সাহেবকে আমি বলে দিয়েছি দুটো দিন অপেক্ষা করুন স্যার, ও

সরু রেলিং-ঘেরা বারান্দা—বারান্দাটা দক্ষিণ-উত্তর

দক্ষিণের শেষ ছুটো ঘরেই নবকেতন যাত্রা পার্টির অফিস ... সময় পেলেই, জরুরী

একটা ছোকরা একগাদা মাটির ভাঁড় ও একটি চায়ের কেৎ

...পচিল্ল অঞ্চলটা ... শুধাল, নবকেতন যাত্রা-পার্টির অফিস কোন্...

...রিক্শা ও ঠেলাগাড়িতে যেন ...

... গাড়ি থেকে নেমে কিরীটী হীরা সিং... বলে, আশেপাশে ...

হয় কির... এ অঞ্চলটা শহরের বোধ হয় সবচাইতে বেশী পুরনো। সেকো ... পাস কাছে

দরদালানওলা বাড়ি, গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যে ম ... নথর।

কির দর... পড়ে চা ও পান-সিগারেটের দোকান। রাস্তাটা যেমন সংকীর্ণ

নবকেতন যাত্রা-পার্টির অফিস খুঁজে পেতে বেশ একটু ... যাত্রা-পার্টি।

...টা বাড়ি, তার মধ্যে অনেক ঘর। দোতলায় নবকেতন যাত্র

...টা অন্ধকার। ভাঙা সরু সিঁড়ি, অন্ধকার। বারোয়ারী

... পাল মশাই, আর

...ক সকালে কোন ব্যবস্থাই নেই।

...ই নাকি পকেট থেকে সরু পেনসিল-টর্চটা বের করে তারই সাহায্যে ...

...ম কৃষ্ণভামিনী।

... সে ছিল।

একে নম্বরের জুয়াড়ি ও দুটি যাত্রা-পার্টির অফিস দোতলায়।

... করে গান-বাজনা আর অভিনয়ের মহলা চলেছে। ফিসফিস করে যেন কি

...তোল, জুয়াড়ি? ... পাল মশাই মুখ তুলে তাকাল।

...া। ...ছদ্মবেশ ছিল না।

are combinat... বেশটায় কিরীটীকে চিনতে পারেন না পাল মশাই। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে

ব ...লেন

...গে ...

হরিদাস ...ল মশাই, নমস্কার।

হ... নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চিনতে পারছেন না বোধ হয়?

না না।

আমি ধূর্জটি রায়।

আপনি—বিস্ময়ে পাল মশাইয়ের গলাটা যেন বাকরোধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, সেটা ছিল আমার ছদ্মবেশ!

এবং ছদ্মবেশ!

তা হ্যাঁ, সামন্ত মশাইয়ের আমন্ত্রণেই ঐ ছদ্মবেশে সেদিন চন্দননগরে আমায় যেতে হয়েছিল।

...য়? ...লাম না ঠিক।

কাছে ছুটে এসেছিলেন! শেষ পর্যন্ত তাঁর

মানে!

কিরীটী তখন সংক্ষেপে ব্যা… অসম্মান করেছি বা কোনরকম অসহযোগিতা করেছি

সব শুনে কৃষ্ণা বিস্ময়ে—

হ্যাঁ, বিষের ক্রি… বা?

কে বিষ… মনে হল যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

সব… কান করে দেব'খন। বরং আমি আপনার দক্ষতার প্রশংসাই করছিলাম তাঁর

যা… অঞ্চলটা… …স্টমর্টেমের রিপোর্টটা পেয়েছেন?

হ্যাঁ… …যে দেখুন। আপনার অনুমানই ঠিক—a case of

…রিকশা ও ঠেলাগাড়িতে যেন… মধ্যে লিকারের সঙ্গে মনে হচ্ছে কোন তী…

poison গাড়ি থেকে নেমে কিরীটী হীরা সিং… বলে, আশেপাশে কে… ল্যাবরে…

…এ অঞ্চলটা শহরের বোধ হয় সবচাইতে বেশী পুরনো। সেকে…

পাচ্ছি… তলা বাড়ি, গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যে ম…

…ড়ে চা ও পান-সিগারেটের দোকান। রাস্তাটা যেমন সংকীর্ণ…!?

…নবকেতন যাত্রা-পার্টির অফিস খুঁজে পেতে বেশ একটু স… …পানেন কি…

…টা বাড়ি, তার মধ্যে অনেক ঘর। দোতলায় নবকেতন যাত্র…

…টা অন্ধকার। ভাঙা সরু সিঁড়ি, অন্ধকার। বারোয়ারী… দি… যাত্রা-পা…

…পে কোন ব্যবস্থাই নেই।

থের… পকেট থেকে সরু পেনসিল-টর্চটা বের করে তারই সাহায্যে …ড়। ট্রাম-বা…

…গেল।

…ছি আরও দুটি যাত্রা-পার্টির অফিস দোতলায়। …ক করে… …দোতলা

পাশ…চৈ করে গান-বাজনা আর অভিনয়ের মহলা চলেছে। …তাঁ!

…না কিরীটীবাবু—আপনি যাই বলুন, এতকাল খুনে ডাকাতদের নিয়ে ক…গলির

নাক… ও মশাই সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আরও একটি লোককে আমার…

…টা একটি বাস্তু ঘুঘু—

কার কথা বলছেন?

কার আবার—ঐ রাধারমণ পাল, দলের অধিকারী, কেমন ভিজে বেড়ালটির মত

হাবভাব দেখাচ্ছিল!

ভদ্রলোক প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারেননি?

ওটা স্রেফ অভিনয়। বুঝতে পারলেন না, ও দুটোকেই আমি ভাবছি অ্যারেস্ট করব

অ্যারেস্ট করে থানায় এনে চাপ দিলেই দেখবেন স্বীকার করতে পথ পাবে না। হুঁ, ব…

কত দেখলাম! মল্লিক সাহেবকে আমি বলে দিয়েছি দুটো দিন অপেক্ষা করুন স্যার,

সরু রেলিং-ঘেরা বারান্দা—বারান্দাটা দক্ষিণ-উত্তর ৻

দক্ষিণের শেষ দুটো ঘরেই নবকেতন যাত্রা পার্টির অফিসঘরবে সময় পেলেই, জরুরী

একটা ছোকরা একগাদা মাটির ভাঁড় ও একটি চায়ের কেৎ

হ..এছিল. তাকেই কিরীটী শুধাল, নবকেতন যাত্রা-পার্টির অফিস কোন্‌৮.

ঐ যে স্যার, এগিয়ে যান না।

ছোকরাটি কিরীটীকে কথাটা বলে নিজের কাজে চলে গেল। ‌/াস‌শাছে

কিরীটী এগিয়ে গেল। সথর,

দরজা খোলাই ছিল। ঘরের মধ্যে আলো জলছিল।

দরজার পাশে দেওয়ালে টিনের সাইনবোর্ড লাগানো—নবকেতন যাত্রা-পার্টি।

ভিতরে প্রবেশ করল কিরীটি।

ঘরের মধ্যে দুটি লোক ছিল।

চিনতে তাদের কষ্ট হয় না কিরীটীর, একজন অধিকারী রাধারমণ পাল মশাই, আর একটি স্ত্রীলোক।

চন্দননগরে সে রাত্রে ঐ অভিনেত্রীটিকেও কিরীটী দেখেছিল। নাম কৃষ্ণভামিনী।

বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, মোটাসোটা গড়ন।

দু'জনে মুখোমুখি দুটি তক্তপোশের উপর বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে যেন কি আলোচনা করছিল, কিরীটীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

কিরীটীর আজ ছদ্মবেশ ছিল না।

তাই বোধ হয় প্রথমটায় কিরীটীকে চিনতে পারেন না পাল মশাই। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাকালেন, কি চাই?

পাল মশাই, নমস্কার।

নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চিনতে পারছেন না বোধ হয়?

না।

আমি ধূর্জটি রায়।

আপনি—বিস্ময়ে পাল মশাইয়ের গলাটা যেন বাকরোধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, সেটা ছিল আমার ছদ্মবেশ!

ছদ্মবেশ!

হ্যাঁ, সামন্ত মশাইয়ের আমন্ত্রণেই ঐ ছদ্মবেশে সেদিন চন্দননগরে আমায় যেতে হয়েছিল।

।? বুঝলাম না ঠিক।

কাছে ছুটে এসেছিলেন! শেষ পর্যন্ত

মানে! তা শুনে থাকবেন—কিরীটী রায়।

কিরীটী তখন সংক্ষে রায়!

সব শুনে কৃষ্ণা?

হ্যাঁ, বিষে—

কে দ্বি তো, সামন্ত মশাইয়ের কেমন ধারণা হয়েছিল তাঁর জীবন বিপন্ন, তাই তিনি সম্ভাপন্ন হয়েছিলেন।

তথাপি রাধারমণ পালের নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল। কৃষ্ণভামিনীও চেয়ে ছিল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী আবার বললে, সেদিন বলেছিলাম আসব এখানে—

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বসুন, বসুন।

ঘরটি মাঝারি সাইজের, একধারে একটি তক্তপোশ পাতা সতরঞ্চি বিছানো, গোটা-কয়েক তাকিয়া, মাঝখানে একটি টানাওয়ালা নীচু ডেস্ক।

অন্য পাশে একটি কাঠের আলমারি। খানকয়েক চেয়ার ও টুল।

দেওয়ালে দু-তিনটে ক্যালেণ্ডার, একটি গ্রুপ ফটো।

ঘরের মধ্যে বেশ একটি উজ্জ্বল শক্তির বাতি জ্বলছিল।

রাধারমণ পাল তক্তপোশ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যে। বললেন, বসুন রায় মশাই।

আপনার দলের আর সবাইকে দেখছি না?

সবাই আছে পাশের ঘরে। রাধারমণ পাল বললেন, ভামিনী, শঙ্করকে ডেকে চায়ের কথা বল।

ব্যস্ত হবেন না পাল মশাই। চায়ের এখন প্রয়োজন নেই। কিরীটী বললে।

দল বোধ হয় উঠেই যাবে রায় মশাই। রাধারমণ বললেন এরপর।

কেন?

আর কেন—শ্যামল চলে যাচ্ছে, নোটিস দিয়েছে, সামন্ত মশাই নেই, বুঝতেই পারছেন শ্যামলও চলে গেলে—

সুভদ্রাও কি নোটিস দিয়েছে নাকি? কিরীটী শুধাল।

না, দেয়নি এখনও, তবে শ্যামল না থাকলে সুভদ্রাও যে থাকবে না সে তো জানা কথাই।

তা বটে! আর সুজিতবাবু?

না, ও বোধ হয় যাবে না। হরিদাস চলে গেল, শ্যামল আর সুভদ্রা চলে গেলে কাকে নিয়ে আর পালা গাওয়াব?

ভাল কথা, দোলগোবিন্দবাবুর কোন সংবাদ পেলেন ?

সে ফিরে এসেছে। স্বরবে সময় পেলেই, জরুরী

এসেছে! তা সেদিন রাত্রে হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন কেন ?

ভয়ে।

কিরীটী মৃদু হাসল।

সেই আলোচনাই করছিলাম ভামিনীর সঙ্গে বসে। একদিন আমি, হরিদাস আছে কৃষ্ণভামিনী তিনজনে মিলে দল গড়েছিলাম। আমার আর হরিদাসের আধাআধি বখরা, শেষ পর্যন্ত হরিদাস বখরা বেচে দিল আমাকে।

হরিদাসবাবুর মুখে সে-কথা শুনেছি।

শুনেছেন!

হ্যাঁ।

কি যে হল, হঠাৎ বখরা বেচে দিল!

সবাইকে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে বলেছিলাম—

সবাই এসেছে—সবাই পাশের ঘরে আছে, কার কার সঙ্গে আপনি কথা বলতে চান বলুন, আমি ডাকছি—না, সবইকে ডাকব ?

সবাইকে ডাকার একসঙ্গে প্রয়োজন নেই, সকলকে আমার প্রয়োজনও নেই। আচ্ছা সেরাত্রে হরিদাসবাবুর সাজঘরের পাশের দুটি সাজঘরে কারা কারা ছিল বলতে পারেন ?

হরিদাসের সাজঘরের ডান দিকের সাজঘরে ছিল সুজিত আর কৃষ্ণধন।

কৃষ্ণধন ?

হ্যাঁ, কৃষ্ণধন চাটুজ্যে। ঐ যে লম্বা ঢ্যাঙা মত, নায়কের বন্ধুর রোল করেছিল নাটকে!

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর বাঁদিককার ঘরে ?

সুভদ্রা আর এই কৃষ্ণভামিনীর সাজঘর ছিল। আর বাকি সব একটা বড় সাজঘরে ছিল। মধ্যবর্তী দরজা ছিল একটা দু'ঘরের মধ্যে।

কিরীটী কি যেন চিন্তা করে।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী হরিদাস সামন্তর মৃত্যু হয়েছিল রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে, অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। পালা শুরু হয়েছিল ঠিক রাত সাড়ে সাতটায়।

পাল মশাই!

আজ্ঞে ?

ঐ রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত—আপনি কোথায় ছিলেন ঐ এক ঘণ্টা সময় ?

কাছে ছুটে এসেছিলেন ! শেষ পর্

মানে !

কিরীটী তখন সংগে ঝামাঝি পর্যন্ত সময়টা কোথায় ছিলেন মনে করে দেখুন !

সব শুনে কৃষ্ণ আসরেই ছিলাম, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল হরিদাস একশো টাকা

হ্যাঁ, বি টা দেবার জন্ম নিজের ঘরে চলে আসি।

কে র সে ঘরে আর কে ছিল ?

ম আর দোলগোবিন্দবাবু।

দোলগোবিন্দবাবু তাঁর সাজঘরে না থেকে আপনার ঘরে ছিলেন কেন ?

তার পার্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই তার সাজঘরে না থেকে আমার ঘরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল বোধ হয়।

ভাল কথা, পাল মশাই—

বলুন ?

দোলগোবিন্দবাবুর রেস খেলা অভ্যাস আছে, তাই না ?

হ্যাঁ, ঐ ঘোড়া রোগেই তো ওর সব খেয়েছে। হরিদাসের ছিল মদ আর মেয়েমানুষ, আর দোলগোবিন্দর মদ আর ঘোড়া। নচেৎ দুজনেরই অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভা ছিল।

দুজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব—মানে সম্প্রীতি ছিল বুঝি ?

তা তো ছিল বলেই মনে হয়।

দোলগোবিন্দবাবুকে হরিদাসবাবু প্রায়ই টাকা ধার দিতেন, তাই না ?

দিত, কিন্তু শুনলেন কোথায় ?

শুনেছি ! এবং সে টাকা তিনি শোধ করতেন না।

রেস খেলে সব ওড়াত, টাকা শোধ করবে কোথা থেকে ?

টাকা কখনও দোলগোবিন্দবাবু শোধ করতেন না, অথচ হরিদাসবাবু তাঁকে টাকা দিয়েই যেতেন !

কি জানি মশাই, তাই তো দিত।

আচ্ছা পাল মশাই, সুজিতবাবুর সঙ্গে দোলগোবিন্দবাবুর সম্প্রীতি কেমন ছিল ?

দুজনের বলতে পারেন সাপে-নেউলের সম্পর্ক, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত।

আর একটা কথা—বলতে বলতে কিরীটী পকেট থেকে কাগজের একটা ভাঁজ করা টুকরো বের করল, আপনি তো হরিদাস সামন্তর অনেক দিনের পরিচিত, দেখুন তো এই লেখাটা—তাঁরই হাতের লেখা কিনা ?

দেখি। রাধারমণ পাল ভাঁজ-করা কাগজটা হাতে নিলেন, চোখে চশমা দিয়ে বেশ ভাল করে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, এটা কোথায় পেলেন ?

মনে নেই। সে-রাত্রে শ্যামলবাবু দিয়েছিলেন—এই সেই চিরকুট যেটা রাধা

সুমিলের হাতে দেবার জন্য চাকর ভোলাকে দিয়েছিল।

হাঁ, মনে পড়েছে। চিরকুটে লেখা—শ্যামল, একবার দেখা করবে সময় পেলেই, জরুরী দরকার।

কি মনে হয় পাল মশাই, লেখাটা সামন্ত মশাইয়েরই তো ?

সেই রকমই তো হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে।

ঠিক বলতে পারছেন না ? আচ্ছা, হরিদাসবাবুর কোন হাতের লেখা আপনার কাছে আছে ?

সে রকম কিছু নেই।

কোন চিঠি বা—

দাঁড়ান, মনে পড়েছে, সুভদ্রা হরণ নাটকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যে হরিদাসের হাতে correction ও suggestion লেখা আছে, যা সে রিহার্সেলের সময় লিখেছিল !

দেখতে পারি একবার নাটকের পাণ্ডুলিপিটা ?

নিশ্চয়ই। ভামিনী, আলমারি থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করে দাও তো। এই না চাবি।

পাল মশাই পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে দিলেন।

কৃষ্ণভামিনী নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চাবি দিয়ে আলমারি খুলে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা বের করে এনে দিল।

কিরীটী উল্টে পাল্টে কিছুক্ষণ কয়েকটা পাতা দেখল, তারপর বললে, পাল মশাই !

বলুন ?

পাণ্ডুলিপিটা আমি নিয়ে যাব ?

নিয়ে যান ও অভিশপ্ত পাণ্ডুলিপি, ও এ ঘরে থাকলে হয়ত আরও অমঙ্গল হবে।

কৃষ্ণভামিনী দেবী !

কিরীটীর ডাকে মহিলাটি ওর মুখের দিকে তাকাল।

এক কাপ চা খাওয়ান।

কৃষ্ণভামিনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পাল মশাই !

আজ্ঞে ?

আমার দুটো ঠিকানা চাই।

ঠিকানা !

হ্যাঁ, সুভদ্রা ও হরিদাসবাবু কোথায় থাকতেন সেই বাড়ির ঠিকানা, আর সুজিতবাবুর বাসার ঠিকানা।

সুভদ্রা আর হরিদাস পাল স্ট্রীটে থাকত—তিন/দুই ; আর সুজিত কালীঘাটে ৫ মহিম হালদার স্ট্রীটে।

খাতা দেখে অতঃপর সঠিক ঠিকানা দুটো বলে দিলেন রাধারমণ, কিরীটী টুকে নিল নোটবুকে।

আর একটা কথা—

বলুন ?

সুজিতবাবুই তো একদিন সুভদ্রাকে আপনার দলে এনেছিলেন ?

হ্যাঁ।

এবারে দোলগোবিন্দবাবুকে একবার ডাকুন।

আর কাউকে ?

না।

রাধারমণ পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং একটু পরে দোলগোবিন্দকে নিয়ে এসে ঢুকলেন।

দশ

রোগা প্যাকাটির মত চেহারা। তোবড়ানো গাল, কোটরগত চক্ষু দীর্ঘ অত্যাচারের সাক্ষ্য দেয়। দুই চোখে ভীত-সন্ত্রস্ত চাউনি।

আপনারই নাম দোলগোবিন্দ ? কিরীটীর প্রশ্ন।

আজ্ঞে, সিকদার।

আপনার সে-রাত্রে লাস্ট সিনে চাকরের পার্টে প্রক্সি দেওয়ার কথা ছিল না ?

আজ্ঞে।

তবে যাননি কেন ?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন !

হ্যাঁ, মানে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল।

ঘুমোতে ঘুমোতেই বুঝি কোথাও চলে গিয়েছিলেন ?

আজ্ঞে !

তবে সে-রাত্রে অত খুঁজেও আপনাকে পাওয়া গেল না কেন ?

আজ্ঞে, পুকুরের পাড়ে—

পুকুরের পাড়ে !

হ্যাঁ, বড্ড গরম, তাই পুকুরের ধারে সিঁড়ির উপরে গিয়ে বসেছিলাম একটু। কখন

ঘুমিয়ে পড়েছি।

তারপর ঘুম ভাঙল কখন?

পরের দিন সকালে।

তারপর কি করলেন?

তখন শুনলাম হরিদাসদা খুন হয়েছেন—সেই শুনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

কার কাছে শুনলেন?

রাধার কাছে।

পাল মশাই, রাধা দেবীকে ডাকুন তো!

রাধারমণ কিরীটীর নির্দেশে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন আবার। ঠিক ঐ সময় কৃষ্ণভামিনী এক কাপ চা হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

চা—

রাখুন ওখানে।

কৃষ্ণভামিনী চায়ের কাপটা পাশের একটা টুলের উপরে নামিয়ে রাখল।

রাধারাণী এসে ঘরে ঢুকল রাধারমণ পালের সঙ্গে।

রাধারাণী দেবী আপনার নাম?

আজ্ঞে।

আপনি দোলগোবিন্দবাবুকে পরের দিন সকালবেলা দিঘির পাড়ে দেখেছিলেন?

কে বললে?

কেন উনি বলেছেন!

ও মাগো, কোথা যাব গো—হ্যাঁরে হাড়হাবাতে অলপ্পেয়ে অনামুখো, তোর সঙ্গে আমার দেখা হল পরের দিন সকালে কখন রে?

রাধা, মানে তুই—

দোলগোবিন্দর মুখের কথাটা শেষ হতে পারল না।

রাধা চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, বদমায়েসী করবার আর জায়গা পাওনি হতচ্ছাড়া ড্যাকরা! খেংরে বিষ ছেড়ে দেব তোমার!

সে কি রাধা, তুমি আমায় বললে না—দেখুন স্যার, ও মিথ্যে বলছে, নচেৎ আমি জানব কি করে যে হরিদাসদা খুন হয়েছে?

রাধারাণী প্রায় তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ছিল দোলগোবিন্দর উপর, কিরীটী বাধা দিল, থামুন-থামুন, কি করছেন আপনারা, যান রাধারাণী দেবী, আপনি এ ঘর থেকে চলে যান।

রাধারাণী গজরাতে গজরাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু! কিরীটী ডাকল।

কেঁদে ফেললে দোলগোবিন্দ, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কিছু জানি না, কিছু দেখিনি সে-রাতে। ওসব খুনোখুনির মধ্যে আমি ছিলাম না।

আপনি সে-রাতে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কোথায় ছিলেন দোল-গোবিন্দবাবু, অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি সময় ?

ঠিক মনে পড়ছে না। কাঁদতে কাঁদতে বললে দোলগোবিন্দ।

মনে পড়ছে না ?

আজ্ঞে না।

ঐ সময় হরিদাসবাবুর ঘরে গেছেন একবারও ?

না তো !

কাউকে সে-ঘরে যেতে দেখেছেন ?

কাকে দেখব !

কাউকে দেখেছেন কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। মনে করে দেখুন না, কিংবা মনে করে দেখুন তো কেউ আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিল কিনা শ্যামলবাবুকে দিতে !

চিঠি ?

হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ ?

কাগজ—শ্যামলকুমারকে দিতে।

হ্যাঁ, দিয়েছিল কেউ আপনাকে—তাই না ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমাকে নয়, ভোলাকে—কে যেন একটা কি ভোলার হাতে দিয়ে বললে সেটা শ্যামলকুমারকে দিতে, হরিদাসদা দিয়েছেন।

কে সে ?

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি, তাছাড়া আসরে তখন আমার যাবার কথা, আমার পার্ট ছিল।

মেয়েছেলে, না কোন পুরুষ ?

মনে হচ্ছে মেয়েছেলে।

কে বলে মনে হয় সে আপনাদের দলের ?

চিনতে পারিনি—ঠিক বুঝতে পারিনি।

রাধারমণবাবু ?

আজ্ঞে ?

আপনার দলের ক'জন স্ত্রীলোক আছেন ?

চারজন। কৃষ্ণভামিনী, সুভদ্রা, রাধারাণী আর ফুল্লরা।

ফুল্লরা কে ?

যে সে-রাত্রে নায়কের ছোট বোন সেজেছিল।

তাকে একবার ডাকবেন এ ঘরে?

রাধারমণ তখুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দোলগোবিন্দবাবু!

আজ্ঞে!

আপনার দেশ কোথায়?

বর্ধমানে।

টাউনে?

না, মেমারীতে—সুভদ্রার মাসী যেখানে থাকে।

সুভদ্রার মাসীকে আপনি চেনেন?

চিনব না কেন—একই পাড়ায় তো।

তাহলে সুভদ্রাকেও আপনি চেনেন?

ও যখন মেমারীতে ছিল তখন চিনতাম, তা ছাড়া বাড়িতে তো আমি খুব একটা যাই না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

কেউ নেই, এক বিধবা পিসি।

বিয়ে-থা করেননি?

করেছি। স্ত্রী এখানেই আমার সঙ্গে বেলেঘাটায় থাকে।

শেষ কবে সুভদ্রাকে আপনি মেমারীতে দেখেন?

তা বছর দশেক আগে হবে। ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে।

পালিয়ে?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম তাই।

কার সঙ্গে? ওখানকারই কারও সঙ্গে কি?

তা জানি না, স্ত্রীর মুখে পরে আমি কথাটা শুনেছিলাম।

সুভদ্রাকে তারপর কবে আবার দেখলেন?

এখানেই—বছর তিনেক আগে এ দলে এসে।

এ দলে কতদিন আপনি আছেন?

তিন বছর।

তার আগে?

অন্যদলে অভিনয় করতাম।

সে দল ছেড়ে দিলেন কেন?

কেঁদে ...ব না হুজুর, আপনি পুলিসের লোক, চুরির দায়ে আমার চাকরি যায়।

সে-...র ?

হ্যাঁ, সব মিথ্যে—কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম না।

রাধারমণ ঐ সময় ফুল্লরাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

ফুল্লরার বয়স বছর কুড়ি হবে। বেশ ফরসা গায়ের রং, দোহারা চেহারা। মুখটা গোল, চক্ষু দুটি চঞ্চল।

এরই নাম ফুল্লরা, রায় মশাই। রাধারমণ বললেন।

তোমার নাম ফুল্লরা ?

আজ্ঞে। গলাটি মিহি ও মিষ্টি সুরেলা।

কিরীটীর মনে পড়ল মেয়েটি পালায় সে-রাত্রে চমৎকার গান গেয়েছিল।

তুমি সে-রাত্রে শ্যামলবাবুর হাতে একটা চিঠি দিয়েছিলে ?

কে বললে ?

দিয়েছিলে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

না তো!

দোলগোবিন্দবাবু, দেখুন তো—সে-রাত্রে ও-ই কি শ্যামলবাবুর হাতে চিঠিটা দিয়েছিল ?

দোলগোবিন্দ তাকাল ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরাও তাকিয়ে থাকে ভ্রূ কুঞ্চিত করে দোলগোবিন্দর দিকে। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর দোলগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না।

ফুল্লরার ভ্রূযুগল সরল হয়ে আসে।

ঠিক আছে, তোমরা যেতে পার।

দোলগোবিন্দ আর ফুল্লরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর কাউকে ডাকব রায় মশাই ? রাধারমণ শুধালেন।

না, থাক।

সবাই আছে ও ঘরে।

থাক, প্রয়োজন নেই।

চাটা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল রায় মশাই। আর এক কাপ চা আনি ?

না না, এবারে আমি যাব। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিন দুই পরে।

দ্বিপ্রহরে কিরীটী ও কৃষ্ণার মধ্যে কথা হচ্ছিল। গতকাল সকালে আবার

রীতে গিয়েছিল, ফিরেছে রাত্রে।

বর্ধমানে ...ই সম্পর্কেই কথা বলছিল, কাল হঠাৎ আবার বর্ধমা...

কৃষ্ণা...

ন' তো ... বার সুভদ্রার মাসীর খোঁজ পাইনি, তাই আবার গিয়েছিলাম ...লা জড়ানো।

আ...

... বালা।

পাই। ...ন?

দেখা হ...

না। ...াড়িতে ছিল না বুঝি?

কেন, ...নেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

বছর...! তবে যে সুভদ্রা তোমাকে বলেছিল!

সে ... দেখছি তোমার কথাই ঠিক কৃষ্ণা।

এখনাকে সেদিনই আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম না, সুভদ্রাকেই আমার সন্দেহ হয়!

তো...হ যে আমারও হয় না তা নয়, তবে—

সে... আবার কি?

ত...গর্ভের সন্তানই সব যেন কেমন এলোমেলো করে দিচ্ছে।

তামেয়েটি একটি সাংঘাতিক চরিত্রের এ তুমি জেনে রেখো।

ঐ... যে বুঝিনি তা নয় কৃষ্ণা, কিন্তু তার গর্ভের সন্তানই যে আমার সব হিসাব গোল-মেট...দিচ্ছে।

মাল করে মত মেয়ের আবার সন্তানধারণ!

...দেয় দেখছি না বিইয়েই কানাইয়ের মা হয়ে বসলে।

তুমি ...রছ?

ঠাট্টা! যাও, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে, এক কাপ চা আন তো।

এগার

বোধ করি ন'টা হবে।

রাত তখন দিন প্রচণ্ড গরম গিয়েছে, যেমন রৌদ্রের তাপ তেমনি গরম হাওয়া, গা যেন এখানে...ল।

এ দলে...হল সবে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

তিন ব...জ কিরীটী শ্যামবাজারে পাল স্ট্রীটে রাধারমণ পালের দেওয়া ঠিকানামত একটা তা...মাক...এসে দাঁড়াল।

অন্নামাকান্ত ঘোষ...র গলিটা একটা গলির মত যেন বের হয়ে গিয়েছে। দু'পাশে সে...য়ে বোধ হয়...

কেঁদে ·ব না হুজুর, আগুর্র ভিতরকারের অংশ।

সে ·র? ওমন ভাল ব্যবস্থা নেই।

হ্যাঁ, সব মিথ্যেচটা বের করে আলো ফেলে নম্বরটা দেখে চতুর্থ বাড়ির দরর কলিং বাধারয়্যা টিপল, বার দুই টেপবার পর ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ, অন্ধকার।

নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এল অন্ধকারেই, এত তাড়াতাড়ি এলে, তোমার যে আসবার কথা—

সুভদ্রার কথা শেষ হল না।

কিরীটী সাড়া দিয়ে বললে, সুভদ্রা দেবী, আমি কিরীটী রায়।

মুহূর্তের যেন একটা স্তব্ধতা, তারপরই চাপা সতর্ক কিছুটা শঙ্কিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, কিরীটীবাবু!

হ্যাঁ, ভিতরে চলুন, আপনার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে।

দরকারী কথা! কিন্তু আমি যে এখুনি একবার বেরুব কিরীটীবাবু!

বেশী সময় নেব না, দু-চার মিনিট। চলুন না।

আসুন।

সরু একটা অন্ধকার প্যাসেজ. কিরীটী টর্চ হাতে সুভদ্রার পিছনে পিছনে এগুতে এগুতে বললে, প্যাসেজে বুঝি আলো নেই?

ছিল। ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

প্যাসেজের পরে একটা ছোট বারান্দা মত, তার একটার মধ্যে টিনের একটা শেড।

একটা ঘরের দরজা খোলা, আলো আসছিল খোলা দরজাপথে। পাশাপাশি দুটো ঘর। যে ঘরে আলো জ্বলছিল কিরীটীকে নিয়ে সুভদ্রা সেই ঘরেই এসে ঢুকল। ঘরটা বড় নয়, ছোটই আকারে। কিন্তু ছিমছাম করে সাজানো।

একপাশে একটি খাটে পরিপাটি করে শয্যা বিছানো, পাশাপাশি দু'জোড়া মাথার বালিশ, বালিশের ওয়াড়ে ঝালর বসানো লেসের। মধ্যখানে একটা পাশবালিশ।

মাথার কাছে একটা নীচু টেবিলের ওপরে একটা টেবিল ফ্যান। ফ্যানটা ঘূর্ণায়মান, তার পাশে একটা কাঁচের প্লেটে কিছু বেলফুল, একটি ধূপদানীতে ধূপকাঠি প্রজ্বলিত। চন্দনধূপের মিষ্টি গন্ধ বেলফুলের সুগন্ধের সঙ্গে মেশামেশি হয়ে ঘরের বাতাস ·ন স্নিগ্ধ রেখেছে।

অন্যদিকে আয়না বসানো একটি কাঠের আলমারি। একটি মিটসেফের উপরে গোটা দুই ইণ্ডিয়ান রামের বোতল, একটা কাঁচের জাগ জল· গে ·স। খান-দুই চেয়ারও ছিল ঘরে। সকালে আবার · কথাটা,

বসুন কিরীটীবাবু!

কিরীটীর দৃষ্টি তখন সুভদ্রার উপর ন্যস্ত।

চমৎকার করে খোঁপা বেঁধেছে সুভদ্রা, খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা জড়ানো। পরনে নীল রংয়ের লাল চওড়াপাড় দামী তাঁতের শাড়ি। হাতে দু'গাছি সোনার বালা। কপালে কুমকুমের টিপ।

এই বাড়িতেই আপনি হরিদাস সামন্তর সঙ্গে থাকতেন? কিরীটী শুধাল।

হ্যাঁ। এবারে ছেড়ে দিতে হবে।

ছেড়ে দেবেন কেন? শ্যামলবাবু বুঝি অন্য বাসা ঠিক করেছেন?

এখনও পায়নি, খুঁজছে বাসা।

হুঁ। তা আপনার মাসীর কোন সংবাদ পেলেন?

মাসী!

বলেছিলেন না সেদিন মাসী খুব অসুস্থ, তাকে দেখতে যাবেন?

যাওয়া আর হল কই! হঠাৎ যে ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল!

তা ঠিক। তা যাবেন না?

দেখি, চিঠি দিয়েছি।

সুভদ্রা দেবী—

বলুন!

মাসীর কাছ থেকে আপনি কতদিন হল চলে এসেছেন?

তা বছর সাত-আট হবে।

মধ্যে যেতেন মাসীর কাছে, তাই না?

হ্যাঁ, আমি ছাড়া তো আর ওর কেউ নেই।

শেষ কবে গেছেন?

মাস দুই আগেও তো গিয়েছি।

কেমন ছিলেন তখন তিনি?

বিশেষ ভাল যাচ্ছে না মাসীর শরীরটা।

আপনার বিবাহ হয়েছিল বলেছিলেন সেদিন, আপনার স্বামীর নাম কি—কোথায় যেন দেশ-বাড়ি?

হুগলী জেলায়। নাম ছিল শ্যামাকান্ত।

শ্যামাকান্ত কি?

শ্যামাকান্ত ঘোষ।

বিয়ে বোধ হয় আপনার মাসীই দিয়েছিল?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কে দেবে!

বিয়ে কোথায় হয়েছিল, মেমারীতে?

হঠাৎ যেন চমকে তাকাল সুভদ্রা কিরীটীর মুখের দিকে। তারপর একটা ঢোঁক গিলে বলল, হ্যাঁ।

বিয়ে হয়েছিল আপনাদের কি মতে? হিন্দু-মতে না রেজেষ্ট্রি করে?

হিন্দু-মতে।

আপনি কিন্তু সত্যি বললেন না, কারণ আমি যতদূর দেখছি আপনি পালিয়ে এসেছিলেন মাসীর কাছ থেকে, তারপর হয়ত বিয়ে করেছিলেন কাউকে।

কে বললে আপনাকে আমি পালিয়ে এসেছিলাম?

যদি বলি আপনার মাসী, এবং—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, কলিং বেল ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল।

কে এল! আপনি একটু বসুন, দেখে আসি।

যান।

সুভদ্রা তড়িৎপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং কিরীটী শিকারী বিড়ালের মত সুভদ্রাকে অনুসরণ করে।

অন্ধকার প্যাসেজ।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল, ফিস্ ফিস্ করে দুটো কথা, যাও, শীগগিরী যাও এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করার শব্দ।

কিরীটী চকিতে ঘরে এসে প্রবেশ করে।

একটু পরে সুভদ্রা এসে ঘরে ঢুকল।

কে এসেছিল?

কেউ না। ভুল নম্বর, অন্ধকারে অন্য বাড়িতে বেল টিপেছিলেন ভদ্রলোক।

আচ্ছা, সুভদ্রা দেবী, আজ তাহলে আমি চলি।

কিরীটী আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজেই সদর দরজা খুলে গলির মধ্যে পড়ে, বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পাশেই অল্প দূরে একটা ঝুল-বারান্দা দেখে তার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে রাস্তার এদিক-ওদিক নজর রাখতে লাগল।

প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে দেখা গেল সুভদ্রা গলি থেকে বের হয়ে এল।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে সুভদ্রাকে অনুসরণ করে।

সুভদ্রা এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ট্রাম রাস্তার সামনে যে 'নিউ

টার' রেস্টুরেন্ট তার সামনে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর চট্ করে একসময় রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল সুভদ্রা।

কিরীটী চেয়ে থাকে।

রাস্তার অপর দিককার ফুটপাতে একটা খোলা জায়গায় মোটর রিপেয়ারিংয়ের কারখানা। লোকজন কারখানায় কাজ করছে, গোটা দুই গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তারই একটার আড়ালে কিরীটী নিজেকে গোপন করে উল্টো দিকের ফুটপাতে রেস্টুরেন্টের দিকে চেয়ে থাকে।

রেস্টুরেন্টের খোলা দরজাপথে এবং ভিতরের উজ্জ্বল আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট চোখে পড়ে কিরীটীর।

ভিতরে খরিদ্দারের বিশেষ একটা ভিড় দেখা যায় না। জনা তিন-চার খদ্দের বসে আছে।

কিরীটী দেখতে পায় সুভদ্রা গিয়ে একটা কোণের টেবিলে চেয়ার টেনে বসল।

রেস্টুরেন্টের ছোকরাটা সামনে এসে দাঁড়াল, কি যেন তাকে বলল সুভদ্রা।

সুভদ্রা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে।

সুভদ্রার দৃষ্টি কিন্তু রাস্তায়, ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে রাস্তার দিকে।

পনের মিনিট কুড়ি মিনিট প্রায় কাটতে চলেছে, সুভদ্রা কখন থেকে এক কাপ চা নিয়ে বসে আছে সেই কোণের টেবিলের চেয়ারটায়। হঠাৎ কিরীটীর দৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠল।

একজন এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে রেস্টুরেন্টের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এবং অল্পক্ষণ পরেই সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এল।

সুভদ্রার সঙ্গের লোকটিকে চিনতে, অন্য ফুটপাতে দাঁড়িয়েও, রেস্টুরেন্টের উজ্জ্বল আলোয় কিরীটীর এতটুকু অসুবিধা হয় না।

চোখের তারা দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটা আরামের নিঃশ্বাস নেয় কিরীটী এতক্ষণে যেন, তাহলে অনুমান তার মিথ্যা নয়!

কিরীটীর প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হীরা সিংকে বাগবাজারের মোড়ে পেট্রোল পাম্পটার সামনে গাড়ি পার্ক করে রাখতে বলে এসেছিল, এগিয়ে গেল কিরীটী সেইদিকে।

গাড়িতে উঠে বসে কিরীটী বললে, চল হীরা সিং, কোঠি।

রাত প্রায় পৌনে এগারটায় কিরীটী তার গৃহে এসে পৌঁছল।

কোথায় গিয়েছিলে? কৃষ্ণা শুধায়, এত রাত হল যে?

সোফার উপরে আরাম করে বসতে বসতে কিরীটী বললে, দাঁড়াও, অনেকক্ষণ ধূমপান করিনি। বলতে বলতে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করল।

কফি খাবে ?

মন্দ কি !

বসো, কফি আনি।

ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা মেসিন চলার দরুন ঘরটা ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক !

বারো

মিনিট দশেক পরে কফির শূন্য কাপটা নামিয়ে রাখতেই কৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করল, কোথায় গিয়েছিলে ?

বল তো কোথায় ?

মনে হয় সুভদ্রা-নিকেতনে !

বাঃ, চমৎকার কৃষ্ণা ! তোমার দেখছি তৃতীয় নয়নটি রীতিমত খুলে গিয়েছে !

বাঃ, এত বড় একজন রহস্যভেদীর সঙ্গে এতকাল বাস করছি ! কথায় বলে সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস !

আর অসৎ-সঙ্গে—বলতে বলতে কিরীটী হেসে ওঠে।

সত্যি বল না গো ?

কি বলব ?

আমার অনুমানটা কি মিথ্যে ?

না, একেবারে মিথ্যে নয়। তবে—

তবে ?

আর দুটো দিন অপেক্ষা কর দেবী, আশা করছি তারপরই হরিদাস সামন্ত হত্যারহস্যের উপরে যবনিকাপাত হয়ে যাবে। এখনও সামান্য বাকি, দুটি বা একটি দৃশ্য।

বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কে হত্যাকারী !

সত্যের অপলাপ করা কর্তব্য নয়, তা বুঝতে পেরেছি বোধ হয়।

বোধ হয় না, বুঝতে তুমি পেরেছ ঠিকই।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসে।

উঃ, তোমার পেট থেকে কথা বের করা না—ঠিক আছে, বলো না। তবে আমিও বুঝতে পেরেছি হত্যাকারী কে।

বুঝতে যদি পেরে থাক তবে আবার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ কেন, দেবী ?

মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, আমার অনুমান ঠিক কিনা।

ঠিক আছে, তাহলে এস আমরা দুজনেই হত্যাকারীর নাম দুটো আলাদা আলাদা কাগজে লিখে আমার ড্রয়ারে রেখে দিই চাবি বন্ধ করে, তারপর চাবিটা—

ঐ সময় জংলী এসে ঘরে ঢোকে শূন্য কফির কাপ দুটো নিয়ে যেতে।

কিরীটী জংলীর দিকে তাকিয়ে বললে, ড্রয়ারের চাবিটা থাকবে শ্রীমান জংলীর হেপাজতে। পরশু রাত ঠিক এগারোটা দশ মিনিটে চাবি নিয়ে কাগজ খুলে মিলিয়ে দেখা যাবে কার অনুমান সত্য। কেমন, রাজী?

রাজী।

জংলী হাঁ করে ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে বলে, কি হল মাইজী!

কৃষ্ণা ততক্ষণে উঠে টেবিলের উপর থেকে দুটো কাগজ আর কলম এনে বললে, নাও, তুমি লেখো।। আমিও লিখছি।

তথাস্তু দেবী।

জংলী তখনও বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়ে।

দুজনের লেখা হলে, দুখানা কাগজ ভাঁজ করে চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে সে দুটো ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে চাবি বন্ধ করে, ড্রয়ারের চাবিটা জংলীর হাতে দিয়ে কৃষ্ণা বললে, এই চাবিটা রাখ্ তোর কাছে জংলী।

কেন মাইজী?

যা বলছি—রাখ। আমি চাইলেও দিবি না, বাবু চাইলেও দিবি না, বুঝলি? ঘুষ দিলেও নয়।

জংলী বুঝতে পারে কোন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। সে মিটমিটি হাসতে হাসতে চাবিটা পকেটে রাখতে রাখতে বললে, ঠিক হ্যায় কিসিকো এ কুঞ্জী নেহী দুংগা।

পরের দিন সকালে চা-পানের পর কিরীটী যেন কার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে ফোনে।

কৃষ্ণা পাশেই সোফায় বসে একটা স্কার্ফ বুনছিল, কিরীটীর ফোন শেষ হলে বললে, সুব্রতর খবর কি বল তো?

কিরীটী একটা সোফায় বসে সামনের সুদৃশ্য একটি কাশ্মিরী কৌটো থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বললে, মাসখানেক প্রায় দেখা নেই, তাই না!

হ্যাঁ, ও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

বিয়ে না করলে পুরুষমানুষ এমনিই হয়ে যায়।

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। কিরীটী উঠেগিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

মল্লিকের ফোন।

মণীশ কি করেছে শুনেছ!

কি?…তাই নাকি! ভালই তো। কিরীটী হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে ফিরে এসে আবার বসল কৃষ্ণার মুখোমুখি। হ্যাঁ, কি যেন

বলছিলে ? বিয়ে না করলে কি হয়ে যায়, কৃষ্ণা—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, ঐ সময় দরজা ঠেলে সুব্রত ঘরে ঢুকল, মুখে স্মিত হাসি।

আরে তুই—তোর পায়ের শব্দ পাইনি তো! কিরীটী বললে।

তাহলে দেখছি মণীশ চক্রবর্তী ঠিকই বলেছে—সুব্রত হাসতে হাসতে মুখোমুখি বসে বললে।

মণীশ চক্রবর্তী ?

হ্যাঁ, চন্দননগর থানার ও. সি.

তুই চিনিস নাকি ওকে ?

আমরা যখন বাঁকুড়া কলেজে পড়তাম তখন ও বাঁকুড়া স্কুলে পড়ত, দুর্ধর্ষ ফুটবল প্লেয়ার ছিল।

গোলকীপার বুঝি ? কিরীটী স্মিতহাস্যে বলল।

ঠিক বলেছিস। কিন্তু বুঝলি কি করে ? বলতে বলতে হেসে ওঠে সুব্রত।

হাসলি যে ?

সুব্রত বললে, সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল তোর কথায়।

কোন্ দৃশ্য ?

কলেজের মাঠে খেলা হচ্ছিল. ও ছিল গোলকীপার। বরাবরই ওর চেহারাটা ছিল ঠিক কুমড়োপটাসের মত, সেই চেহারা আর সাতটা গোল খেয়েছিল, তাইতেই মনে আছে ওকে। তারপর বহুকাল পরে কাল চন্দননগরে একটা সাহিত্য-সভায় ওর সঙ্গে পরিচয় হল। এখন আবার একজন কবি।

ফুটবল থেকে কবিতা—অসাধারণ উত্তরণ! এ যে আরও দুর্ধর্ষ ব্যাপার!

তাই—তবে মাঝখানটা বাদ দিলি কেন ? দারোগা। গত ষোল বছর। ভদ্রলোকের এক কথা এক কাজ। ঐ দারোগাগিরিতেই আটকে আছে, এক ধাপও অগ্রসর হয়নি। ভদ্রলোক দেখলাম তোর উপরে ভীষণ খাপ্পা।

কেন ? আমি আবার কি করলাম ?

কি একটা যাত্রাদলের লোকের খুনের ব্যাপারে নাকি তুই তার উপরওয়ালার সাহায্যে নাক গলিয়ে ব্যাপারটাকে প্রায় ভণ্ডুল করে দিতে বসেছিস ?

কেন, সে তো এইমাত্র শুনলাম—

কি শুনলি ?

ফোনে মল্লিক বললে, রাধারমণ পালকে নাকি সে অ্যারেস্ট করছে, তার মতে সে-ই নাকি খুনী।

কিন্তু ব্যাপারটা কি ? শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। সুব্রতর কণ্ঠে আগ্রহের সুর।

আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে আসি, তুই কৃষ্ণার কাছে সব শোন্।

কিরীটী উঠে গেল ঘর থেকে।

আধঘণ্টা পরে স্নান সেরে একেবারে বেরুবার পোশাকে সজ্জিত হয়ে কিরীটী ঘরে এল।

কি রে শুনলি?

শুনলাম, আর এও বুঝলাম মণীশ চক্রবর্তী আর একটা গোল খেয়ে বসে আছে।

বুঝলি কি করে? কৃষ্ণার সঙ্গে মত বিনিময় হল বুঝি? বলতে বলতে আড়চোখে কিরীটী স্ত্রীর দিকে তাকাল।

না, তোর গৃহিণী তো কবুল করল না কিছুতেই। সুব্রত হাসতে হাসতে বললে।

তাহলে তুই একটু বোস, আমি একটু ঘুরে আসি।

কতদূর যাবি? সুব্রত শুধায়।

বেশি দূর না—কাছাকাছি।

ঐ সময় ঘরের টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়, কিরীটী রায়—

আমি মনীশ চক্রবর্তী কথা বলছি।

কি খবর বলুন! অ্যাঁ! কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে—বোতলে কিছু পাওয়া যায়নি? গ্লাসে এবং স্টমাক কনটেন্টে বিষ পাওয়া গিয়েছে?

কি বিষ?…অ্যাট্রোপিন সালফেট? ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভাল কথা—সন্ধ্যার দিকে একবার ফোন করবেন। কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

সুব্রত শুধাল, কি? অ্যাট্রোপিন সালফেট্ বিষ পাওয়া গিয়েছে?

হ্যাঁ, অ্যাট্রোপিনের লিথাল ডোজটা বোধ হয়—এক থেকে দুই গ্রেন—কৃষ্ণা, ঐ আলমারি থেকে ডাঃ ঘোষের ফারমাকোপিয়াটা বের কর তো, ঐ যে লাল মলাটের বইটা—একেবারে ডান দিকে শেষে, দ্বিতীয় থাকে—

কৃষ্ণা আলমারি থেকে বইটা বের করে এনে কিরীটীর হাতে দিল। কিছুক্ষণ ধরে পাতা উলটে উলটে এক জায়গায় এসে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। পড়তে লাগল।

একটু পরে বইটা বন্ধ করে কৃষ্ণার হাতে দিতে দিতে বললে, আশ্চর্য! লোকটা ঐ বিশেষ বিষটা যে এত দ্রুত এত অল্প ডোজে কার্যকরী, তা জানল কি করে?

কিরীটী পুনরায় বসে সোফার উপর, একটা সিগারেট ধরায়।

কৃষ্ণা, তোমাকে বলেছিলাম না দুদিন পরে মীমাংসা হবে?

হ্যাঁ।

তার আর দরকার হবে না বোধ হয়, মিসিং লিঙ্কটা পেয়ে গিয়েছি।

সত্যি!

বোস্ সুব্রত তুই, যাস নে। ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল, চললাম।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তের

কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলে দিয়ে সুভদ্রা যেন একটু অবাকই হয়, কিরীটীবাবু আপনি!

হ্যাঁ, একটা কথা গত সন্ধ্যায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি। চলুন না ভিতরে।

আসুন। অনাসক্ত গলায় সুভদ্রা কিরীটীকে যেন আহ্বান জানাল।

গত রাত্রের সেই ঘর। শয্যাটা এলোমেলো হয়ে আছে এখনও। তখনও গুছিয়ে পাট করা হয়নি শয্যাটা।

কিরীটী একবার আড়চোখে শয্যাটা দেখে নিলে। শুনলাম শ্যামলবাবু যাত্রাদলের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন? কিরীটী কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

তাই নাকি! শুনিনি তো—কে বললে?

শুনলাম। তাহলে আপনিও বোধ হয় ঐ দল থেকে চলে যাবেন?

না। তা কেন যাব?

যাবেন না! শ্যামলবাবু চলে যাবেন, অথচ আপনি—

তার যদি না পোষায় তো সে চলে যাবে, আমি চাকরি ছাড়তে যাব কেন?

শ্যামলবাবু যদি আপত্তি করেন?

করবে না—আর করলেই বা!

তা আপনাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?

বিয়ে?

হ্যাঁ, শ্যামলবাবুর আর আপনার?

হন্তদন্ত হয়ে ঐ সময় রাধারমণ পাল এসে ঘরে ঢুকল, সুভদ্রা, শুনেছ?

রাধারমণ পাল কিরীটীকে লক্ষ্য করেনি প্রথমটায়, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ে গেল কিরীটীকে।

একটু থেমে, যেন থতমত খেয়ে বললে, কিরীটীবাবু, আপনি?

কি হয়েছে পাল মশাই? কিরীটী শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

সুজিতকে গতরাত্রে সে যখন বাড়ি ফিরছে, তার গলির মধ্যে কারা যেন পিছন থেকে ছোরা মেরেছে।

সে কি! একটা ভয়ার্ত স্বর যেন বের হয়ে এল সুভদ্রার কণ্ঠ থেকে।

রাতে কখন? কিরীটী আবার শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, মানে রাত ক'টা হবে?

ও তো বলছে রাত প্রায় বারোটা সোয়া-বারোটা হবে।

সুজিতবাবু এখন কোথায় ?

বাঙ্গুর হাসপাতালে—কেবল একটু আগে হাসপাতাল থেকে আমাকে অফিসে ফোন করেছিল।

কে ?

সুজিত।

আঘাতটা খুব বেশি হয়েছে ? কিরীটী পুনরায় শান্ত গলায় প্রশ্ন করে।

না, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে। বাঁ দিককার ঠিক কাঁধের নীচে নাকি হাতের উপর দিয়ে গিয়েছে।

এখন তিনি কোথায় ?

তার বাসা কালীঘাটে। আমি তো সেখান থেকেই আসছি।

প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই তো পাল মশাই ? সুভদ্রা এতক্ষণে প্রশ্ন করে।

নাঃ, খুব বেঁচে গিয়েছে এযাত্রা। নেহাৎ বোধ হয় পরমায়ু ছিল। কিন্তু আমি ভাবছি সুভদ্রা, কে এভাবে আমাদের সর্বনাশ করছে! সেদিন সামন্ত মশাই গেলেন, কাল আবার সুজিতের প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা—

পাল মশাই!

হঠাৎ কিরীটীর ডাকে রাধারমণ পাল ওর দিকে ফিরে তাকাল।

বলতে পারেন, হরিদাস সামন্তর কি চোখের অসুখ ছিল ?

না তো। কেন ?

না—আচ্ছা, আপনাদের দলের আর কেউ কি ইতিমধ্যে চোখের ব্যাপারে ভুগছিলেন ?

কেন, আমিই তো কিছুদিন থেকে কষ্ট পাচ্ছি—চোখের ডাক্তার দেখছেন আমার চোখ, চন্দননগরে যেদিন পালা গাইতে যাই তার পরের দিনই বিকেলে ওষুধ লাগিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে আমার যাবার কথা ছিল।

গিয়েছিলেন ?

না—দেখছেন তো কি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কটা দিন যাচ্ছে!

তা ঠিক। তা ডাক্তারটি কে ?

ডাঃ চ্যাটার্জি, ধর্মতলার আই-স্পেশালিস্ট।

যে ওষুধটা লাগাবার কথা ছিল সে ওষুধটা তৈরী করানো হয়েছিল ?

হ্যাঁ, এখনও আমার অফিস-ঘরেই বোধ হয় রয়েছে।

ফিরে গিয়ে অফিস-ঘরে ওষুধটা আছে কিনা আমাকে একবার জানাবেন—বাড়িতে আমায় ফোন করে আর ঘণ্টা তিনেক বাদে!

বেশ।

ভুলবেন না যেন। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

কিরীটী আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী গৃহে ফিরে এল। সুব্রত তখন কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছিল।

সোফায় বসতে বসতে কিরীটী বললে, মিলে গেছে—দুয়ে দুয়ে চার।

হত্যাকারী তাহলে—

হ্যাঁ। সুব্রতর প্রশ্নের উত্তরে কিরীটী বললে, নিজের হাতেই নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিয়েছে আমার হাতে।

সুব্রত ও কৃষ্ণা দুজনেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না, কারণ ওরা তো জানেই—নিজে থেকে মুখ না খুললে ও-মুখ খোলানো যাবে না।

বিকেলের দিকে তিনটে নাগাদ রাধারমণ পালের ফোন এল কিরীটীর কাছে।

সংক্ষিপ্ত দু-চারটে কথা হল। তারপর কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

সুব্রত কিরীটীর বাড়িতে ছিল। যায়নি—কৃষ্ণা যেতে তাকে দেয়নি।

কৃষ্ণা, আর একপ্রস্থ চা হলে মন্দ হত না—সুব্রত বললে।

সুব্রতর কথায় কৃষ্ণা উঠে গেল ঘর থেকে।

সুব্রত বললে, চা খেয়ে এবারে যাব।

বোস্ না, ব্যস্ত কি!

কিরীটী তাকে থাকবার অনুরোধটা জানাল বটে, কিন্তু সুব্রতর মনে হয় কিরীটী যেন একটু অন্যমনস্ক—কেমন যেন ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা।

সুব্রত জানে কোন রহস্যের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছালে কিরীটী অমনি ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

কথা বলে কম এবং সংক্ষিপ্ত। বোঝা যায় ও যেন কথা বলতে চায় না।

কিরীটীর দিকে তাকাল সুব্রত। কিরীটী সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে। মুখে জ্বলন্ত সিগার। ধূমপান করছে কি করবে বোঝবার উপায় নেই।

গ্রীষ্মের শেষ প্রহরের ম্লান আলো বাইরে। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। ওর বসবার ভঙ্গিতে নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা প্রতীক্ষার ইঙ্গিত।

কিরীটী কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছে? কিংবা কোন সংবাদের জন্য কান পেতে আছে যেন!

কৃষ্ণা জংলীর হাতে ট্রেতে চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার

ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী যেন একটু দ্রুত চঞ্চল পদবিক্ষেপেই এগিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, কিরীটী রায়—কে, সুশান্তবাবু? বলুন, তারপর—কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মারা গেছে অনেক দিন আগে? হুঁ! ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চোখে-মুখে যেন একটা চাপা উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

রিসিভারটা নামিয়েই আবার তুলে নিয়ে ডায়েল করে কিরীটী, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি কিরীটী রায়—হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা করে রাখবেন, ঠিক রাত এগারোটায় যেমন বলেছি মিট্ করবেন, হ্যাঁ, যেখানে বলেছি সেখানেই।

আবার ফোন নামিয়ে ডায়েল করল কিরীটী কাকে যেন, আমি কিরীটী রায় কথা বলছি—যে দুটি ছেলেকে নজর রাখতে বলেছিলেন, তারা যেন এক মুহূর্তের জন্যও নজর না সরিয়ে নেয়। হ্যাঁ, ইনস্ট্রাকশন দিন—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাড়িতে ফোন করবে, আপনাকেও সংবাদটা দেবে।

কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পুনরায় এসে সোফায় গা ঢেলে দিল।

কিরীটীর চোখে-মুখে দুপুর থেকে যে দুশ্চিন্তাটা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেটা যেন আর অবশিষ্ট নেই।'

মনে হচ্ছে শেষ দাবার চালটি যেন দিলি! সুব্রত বললে।

সূত্রগুলো সবই হাতের মধ্যে এসে গিয়েছে, একটা জায়গায় শুধু একটা ছোট্ট গিঁট, সেটা খুলতে পারলেই—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, আবার ফোন বেজে উঠল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা হাতে তুলে নিল, কিরীটী রায়। কে, পাল মশাই? তবে কি আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন চন্দননগরে? নেননি—আপনার অফিস-ঘরেই ছিল? আমিও সেই রকমই অনুমান করেছিলাম। খুঁজে পাবেন না তাও জানতাম, কাল সকালে আসবেন।

কিরীটী রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল, তারপর কৃষ্ণার দিকে ফিরে বললে, কৃষ্ণা, আমি পাশের ল্যাবরেটরী ঘরে আছি। যে কোন সময় একটা ফোন আসতে পারে, এলে আমাকে ডেকো। সুব্রত, যাস না—হয়তো বেরুতে হতে পারে রাত্রে।

কিরীটী আর কোন কথা বললে না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

চোদ্দ

ফোন এল রাত দশটার কিছু পরে।

কিরীটীকে ডাকতে হল না। সে সজাগ ছিল। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে রিসিভারটা তুলে নিল।

অন্য পক্ষ কি কথা বললে বোঝা গেল না ফোনের অপর প্রান্ত থেকে, কেবল কিরীটীর একটিমাত্র জবাব শোনা গেল, ঠিক আছে, মল্লিক সাহেবকে ফোন করে দিন।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, খাবার হয়েছে কৃষ্ণা?

হ্যাঁ। দেব?

হ্যাঁ, আমাদের খাবার দিতে বল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই দুজনে বেরুল।

হীরা সিং?

জী সাব!

শ্যামবাজার চল।

শ্যামবাজারে সুভদ্রার গৃহে পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না।

কিরীটী আর সুব্রত গলির মধ্যে ঢুকে দরজার কলিংবেলটা টিপল কিরীটী।

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল।

সুভদ্রাই দরজা খুলে দিয়েছিল, কিরীটীবাবু! এত রাত্রে, কি ব্যাপার?

চলুন ভিতরে, আপনাকে একটা সংবাদ দিতে এসেছি।

সুভদ্রা কিন্তু দরজা ছাড়ে না, কেমন যেন একটা ইতস্ততঃ ভাব।

আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন কিরীটীবাবু।

জানি আপনি কি ব্যাপারে ব্যস্ত। কিন্তু আমার প্রয়োজনটা অনেক বেশি।

আপনি কাল আসবেন—বলতে বলতে সুভদ্রা কিরীটীর মুখের উপরই যেন দরজাটা বন্ধ করবার উপক্রম করে।

কিরীটী কিন্তু হাত দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ঠেলে শান্ত গলায় বললে, কোন লাভ হবে না সুভদ্রা দেবী। আপনার যত কাজই থাক এখন, এবং আপনি যত ব্যস্তই থাকুন, আমাকে ঘরে যেতে দিতেই হবে, আমার কথাও আপনাকে শুনতেই হবে।

কিন্তু আপনি কি জোর-জবরদস্তি করবেন নাকি?

সে রকম করবার কোন ইচ্ছা, বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার নেই, তবে আপনি যদি আমাকে বাধ্য করেন—

এটা আমার বাড়ি কিরীটীবাবু।

সুভদ্রার গলার স্বর তীক্ষ্ণ এবং কঠিন।

অবশ্যই, এবং সেটা না জানার তো কোন হেতু নেই। চলুন ভিতরে।

না।

সুভদ্রা দেবী, পুলিস আশপাশেই আছে, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না আশা করি, তাদের সাহায্য আমি নিই !

পুলিস !

হ্যাঁ, চলুন ভিতরে।

সহসা সুভদ্রার কণ্ঠস্বরের যেন পরিবর্তন ঘটল।

সে বললে, আপনি পুলিস নিয়ে এসেছেন ? কিন্তু কেন, কি করেছি আমি ?

ভিতরে চলুন সব বলছি।

সুভদ্রা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে যেন কি ভাবল। তারপর বললে, বেশ। আসুন।

বসবার ঘরেই বসাতে যাচ্ছিল সুভদ্রা কিরীটীকে, কিন্তু কিরীটী বললে, না, আপনার শোবার ঘরে চলুন।

শোবার ঘরে ?

হ্যাঁ, চলুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল, সুভদ্রার শয্যার উপরে বসে আছে সুজিতকুমার, বুকে ও হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

নমস্কার সুজিতবাবু, চিনতে পারছেন ?

হ্যাঁ, কিরীটীবাবু। সুজিত বললে।

ভালই হল সুজিতবাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করার ছিল, দেখা হয়ে গেল এখানেই, আপনার কালিঘাটের বাড়িতে আর ছুটতে হল না।

হ্যাঁ, আজ দুপুরে গিয়ে সুভদ্রা এখানে আমায় নিয়ে এসেছে।

ভালই করেছেন উনি, ওখানে তো সেবা করার মত কেউ আপনার ছিল না। কিরীটী বললে।

বসুন না কিরীটীবাবু, দাঁড়িয়ে কেন ? সুজিত বললে।

আপনি তো বসতে বলছেন, সুভদ্রা দেবী তো ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না বাড়িতে।

সে কি ! কেন সুভদ্রা ? সুজিত প্রশ্নটা করে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল।

আপনার এ সময়ে এখানে উপস্থিতিটা হয়তো বাইরের লোক কেউ জানুক সুভদ্রা দেবীর ইচ্ছা ছিল না, তাই না কি সুভদ্রা দেবী ?

কথাটা বলে আড়চোখে তাকাল কিরীটী সুভদ্রার দিকে।

সুভদ্রা চুপ। কোন কথা বলে না।

কিরীটী আবার বললে, যাক, একপক্ষে ভালই হল, দুজনের সঙ্গে একই জায়গায় দেখা হয়ে গেল। তারপর, কেমন আছেন ? হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল ?

হ্যাঁ। বললে ডাক্তাররা আঘাতটা অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। ভাগ্যে নেহাত

অপঘাতে মৃত্যু ছিল না বলেই—হাসতে হাসতে বললে সুজিত।

হ্যাঁ, ভাগ্য নিশ্চয়ই বলতে হবে। তা কে পিছন থেকে আপনাকে আঘাত করল জানতেই পারলেন না? দেখতেও পেলেন না লোকটাকে সুজিতবাবু?

অন্ধকারে ছোরাটা মেরেই ছায়ার মত অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল কিরীটীবাবু! তাছাড়া রক্তে তখন আমার সারা জামা ভিজে গিয়েছে, প্রায় ফেন্ট হবার যোগাড়। ঐ অবস্থায় আততায়ীকে দেখবার মত অবস্থা কি থাকতে পারে!

তা সত্যি।

তা উনি—সুব্রতকে দেখিয়ে সুজিত বললে, ওঁকে তো চিনতে পারছি না!

উনি আমার এক ছোটবেলার বন্ধু, কৃষ্ণনগরে চাষাপাড়ায় ওর বাড়ি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, আপনারও কৃষ্ণনগরে ঐ পাড়াতেই বাড়ি সুজিতবাবু, তাই না? ভাল কথা, রঞ্জিত বিশ্বাসকে আপনি চেনেন?

রঞ্জিত বিশ্বাস! কে বলুন তো?

চিনতে পারছেন না, অথচ তিনি বলছিলেন, একসঙ্গে এক বছর আপনারা আর্ট স্কুলে পড়েছিলেন! কিরীটী বললে।

ও! হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা তাকে আপনি চেনেন নাকি?

চিনতাম না, তবে—

তবে?

সেদিন চেনা-পরিচয় হল, তাঁর কাছেই শুনছিলাম—

কি শুনেছেন?

আপনি ছোটবেলা থেকেই ভাল অভিনয় করতে পারতেন, শেষ পর্যন্ত তাই বোধ হয় আঁকার লাইন ছেড়ে অভিনয়ের লাইনটাই বেছে নিলেন।

হ্যাঁ, ও হল কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আর আমি হলাম অভিনেতা। তা রঞ্জিত বিশ্বাস এখন কোথায়? অনেক দিন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

এবারে হয়তো হবে।

কলকাতায় থাকলে হবে বৈকি। কিন্তু আপনি একটু আগে যেন বলছিলেন আমাকে আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে?

হ্যাঁ, দুটো কথা।

কি বলুন তো?

দুর্ঘটনার রাত্রে—অর্থাৎ যে রাত্রে হরিদাস সামন্তকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়—মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে—

বলেন কি! সত্যি নাকি ব্যাপারটা?

পনের

হ্যাঁ সুজিতবাবু, ব্যাপারটা নিষ্ঠুর সত্য এবং সেটা কি বিষ জানেন—শান্ত গলায় কথাটা বলে কিরীটী পর্যায়ক্রমে সুজিত ও সুভদ্রার দিকে তাকাল।

কি বিষ? সুজিত প্রশ্ন করে।

কিরীটী পূর্ববৎ শান্ত গলায় বললে, অ্যাট্রোপিন সালফেট, যার থেকে দু গ্রেনেই অবধারিত মৃত্যু একজন মানুষের।

বলেন কি!

তাই, এবং সে বিষ তাঁকে তাঁর মদের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কে—কে তাকে মদের সঙ্গে বিষ দিতে পারে? ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয় তো! Suicide!

না। শান্ত গলায় কঠিন 'না' শব্দটা যেন উচ্চারিত হল কিরীটীর কণ্ঠ হতে, ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয়।

নয় কি করে জানলেন?

জেনেছি, এবং সে প্রমাণও আমার কাছে আছে। কথাটা বলে পুনরায় কিরীটী সুভদ্রার দিকে তাকাল।

সুভদ্রা যেন পাথর।

সে যেন কেমন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর দিকে।

সুভদ্রা দেবী, আপনি সম্ভবতঃ জানেন ব্যাপারটা, আপনিই বলুন না—হরিদাসবাবুকে মদের সঙ্গে বিষ কে দিতে পারে বা কার পক্ষে সম্ভব ছিল সে-রাত্রে?

আমি—আমি কি করে জানব?

কিন্তু আমার মনে হয় সুভদ্রা দেবী, ব্যাপারটা আপনি জানলেও জানতে পারেন।

আমি?

হ্যাঁ—বলুন সুভদ্রা দেবী, কে সে রাত্রে সামন্ত মশাইয়ের মদের সঙ্গে বিষ দিতে পারে? কিরীটীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ।

সুভদ্রা, সত্যি তুমি জান? প্রশ্ন করল এবার সুজিত—

না, না—

বলুন সুভদ্রা দেবী, বলুন—কারণ, রাত সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে সে-রাত্রে আপনি হরিদাসবাবুর ঘরে দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন।

প্রমাণ—

হ্যাঁ, এই ভাঙা—বলতে বলতে পকেট থেকে সে-রাত্রে সাজঘরে কুড়িয়ে পাওয়া কাচের আয়না-বসানো চুড়ির টুকরোটা বের করে বললে, চুড়ির টুকরোটাই সে প্রমাণ দেবে, দেখুন তো, চিনতে পারছেন কি না, এই ভাঙা টুকরোটা যে চুড়ির সেটা সে-রাত্রে অভিনয়ের সময় আপনার হাতে ছিল—

সুভদ্রা বোবা।

এখন বলুন সুভদ্রা দেবী, দ্বিতীয়বার কেন আপনি আবার সে-ঘরে গিয়েছিলেন?

না—আমি যাইনি। বিশ্বাস করুন—

গিয়েছিলেন। শান্ত কঠিন গলা কিরীটীর। বিষ মেশানো মদের বোতলটা সরিয়ে আনবার জন্য, তাই না?

আমি কিছু জানি না।

জানেন। বলুন সে বোতলটা কোথায়?

আমি জানি না—কিছু জানি না—বলতে বলতে সুভদ্রা সুজিতের দিকে তাকাল।

স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন কি? আমার দিকে তাকিয়ে বলুন। কিরীটী আবার বললে।

কি বলছেন? উনি আমার স্বামী হতে যাবেন কেন? সুভদ্রা বলে ওঠে।

নন বুঝি! কিরীটীর কণ্ঠে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গের স্বর, কি সুজিতবাবু, উনি আপনার স্ত্রী নন? অবিশ্যি এখনও জানি না বিবাহটা দশ বছর আগে আপনার কোন্ মতে হয়েছিল। হিন্দুমতে পুরুত ডেকে, না রেজেষ্ট্রি করে, না শৈবমতে, না কেবল কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে—

কোন মতেই আমাদের বিবাহ হয়নি। কি সব পাগলের মত যা-তা বলছেন। সুজিত বলে ওঠে।

আমি পাগল, তাই না! এবারে বলুন সুভদ্রা দেবী, আপনার গলার হীরের লকেটটা কোথায় গেল? কিরীটী বললে।

লকেট। কিসের লকেট?

আপনার গলায় যে সরু হারটা আছে তার সঙ্গে একটা লকেট ছিল, লকেটটা কোথায়? সেই লকেটটা যে হরিদাসবাবুর হাতে গিয়ে পড়েছিল সেটা জানতে পেরেই বোধ হয় মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, যেহেতু বুঝেছিলেন আসল সত্যটা তাঁর কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, তাই না? এতদিনের অভিনয়টা আপনাদের ধরা পড়ে গেছে তাই ভেবে মরীয়া হয়ে, না সুভদ্রা দেবী—উঁহু, কোমরে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি কোমরে দোক্তার কৌটোর মধ্যে দোক্তার সঙ্গে কি মেশানো আছে।

সুভদ্রা হাতটা কোমর থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

সুব্রত, সুভদ্রা দেবীর কোমরে দোক্তার কৌটোটা গোঁজা আছে, ওটা নিয়ে নে।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার কোমরে গোঁজা দোক্তার ছোট্ট কৌটোটা ছিনিয়ে নিল।

আমি জানি সুভদ্রা দেবী, অবশ্যই অনুমানে নির্ভর করে, সুজিতবাবু আজ যদি আপনার গর্ভের সন্তানকে স্বীকৃতি না দিতেন তাহলে আপনি শেষ পথটাই নিতেন।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে সুজিত হেসে উঠে বললে, চমৎকার একটা নাটক রচনা করেছেন তো কিরীটীবাবু!

সত্যিই নাটকটা চমৎকার সুজিতবাবু, আপনার ভিলেনের রোলটিও অপূর্ব হয়েছে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত। তবে জানেন তো, সব নাটকেই ভিলেনের শেষ পরিণতি হয় জেল, নয় ফাঁসী!

কিরীটীর কথা শেষ হল না, অকস্মাৎ'যেন বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা ধারাল ছোরা কোমর থেকে টেনে নিয়ে সুজিত কিরীটীর উপরে।

কিন্তু কিরীটী অসতর্ক ছিল না, চকিতে সে সরে দাঁড়ায়।

সুজিত হুমড়ি খেয়ে দেওয়ালের উপর গিয়ে পড়ে গেল।

সুব্রত সেই সুযোগটা হেলায় হারায় না, লাফিয়ে পড়ে সুজিতের উপর। সুজিতের সাধ্য ছিল না সুব্রতর শারীরিক বলের কাছে দাঁড়ায়। তাই সহজেই সুব্রত তাকে চিৎ করে ফেলে মাটিতে।

কিরীটী তার পকেটে যে বাঁশীটা ছিল তাতে সজোরে ফুঁ দিল।

মল্লিক সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে প্রস্তুতই ছিলেন কিরীটীর পূর্ব নির্দেশ মত বাড়ির সামনে, সকলে ছুটে এল ঘরে।

ষোল

পরের দিন সকালে দুই প্রস্থ চা হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় প্রস্থের সঙ্গে কিরীটী, সুব্রত, মল্লিক সাহেব, মণীশ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণা—কিরীটীর বাড়ির বসবার ঘরে হরিদাস সামন্তর মৃত্যুর ব্যাপারেই আলোচনা চলছিল।

আলোচনা ঠিক নয়।

একজন বক্তা। সে কিরীটী। এবং অন্য সকলে শ্রোতা।

কিরীটী বলছিল: ব্যাপারটা সত্যিই একটা রীতিমত নাটক। এবং নাটকের শুরু নবকেতন যাত্রা পার্টিতে সুভদ্রার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং শেষ সুজিতের হাতে হাতকড়া পড়ার সঙ্গে।

সুভদ্রা তার মাসীর আশ্রয় থেকে পালিয়ে যখন যায় তখনই সুজিতের সঙ্গে তার সামান্য

পরিচয়। সুজিত সুভদ্রাকে ঠিকমত আইনানুগভাবে কোনদিন বিবাহ করেছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সুভদ্রার বোধ হয় তা সত্ত্বেও সুজিতের উপর একটা দুর্বলতা ছিল, আর সে দুর্বলতাটুকুর পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল শয়তান সুজিত।

সুজিতের চরিত্রে নানা দোষ ছিল, তার মধ্যে রেসের মাঠ ও জুয়া—অভিনয় সে ভালই করত, কিন্তু ঐ মারাত্মক নেশার দাস হওয়ায় তার সে প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও খারাপ হয়ে যায় চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য। সে ক্রমশঃ পারফেক্ট ভিলেনের রূপান্তরিত হয়।

এদিকে সুভদ্রাও তাকে ছাড়বে না, সুজিতের পক্ষে তার ভার বয়ে চলা সম্ভব নয়। তখন সুজিতই এক উপায় বের করল। সুভদ্রার অভিনয়ের নেশা ছিল, সে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল পাল মশাইয়ের কাছে। বেশ চলছিল এবং চলতও হয়তো দুজনের, কিন্তু মাঝখানে প্রৌঢ় হরিদাস সামন্ত পড়ে সব গোলমাল করে দিল।

হরিদাস সামন্তর লোভ পড়ল সুভদ্রার যৌবনের প্রতি। সে আকৃষ্ট হল এবং শয়তান সুজিত তখন দেখল ব্যাপারটায় তার লাভ বই ক্ষতি নয়। সে আর এক কৌশলে সুভদ্রাকে হরিদাস সামন্তর হাতে তুলে দিয়ে হরিদাসকে শোষণ শুরু করল।

হরিদাস টাকা যোগাতে লাগল, সুভদ্রার বোধ হয় ব্যাপারটা আগাগোড়াই পছন্দ হয়নি, সে অনন্যোপায় হয়ে শয়তান সুজিতের শাসানিতে হরিদাসের রক্ষিতা হয়ে রইল।

কয়েক বছর বেশ ঐভাবেই হয়তো চলছিল, তারপরই ব্যাপারটা হরিদাসের কাছে ফাঁস হয়ে গেল।

কিন্তু কেমন করে ফাঁস হল, সেটাও অবিশ্যি আমার অনুমান, হরিদাস সামন্ত হঠাৎ কোন এক সময় সুভদ্রার গলার হারের লকেটটা বোধ হয় পায়। সেই লকেটের মধ্যে ছিল সুভদ্রা ও সুজিতের যুগল ফটো। হরিদাস ব্যাপার বুঝতে পেরে (আমার অনুমান অবশ্য) সুভদ্রাকে তিরস্কার করে এবং টাকা দেওয়া বন্ধ করে। কারণ, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল সুভদ্রার হাত দিয়েই সুজিত তাকে শোষণ করে চলেছে।

সুজিত ব্যাপারটা জানতে পারল। এবং সে তখন হরিদাসকে নিশ্চয়ই শাসায়, প্রাণভয়ে ভীত হরিদাস তখন আমার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে বলতে সাহস পায় না।

তবে সব কথা না বললেও স্পষ্ট করে আভাসে যেটুকু বলে তাতে আমার বুঝতে কষ্ট হয় না, তার বিপদ যাত্রাদলের মধ্যেই।

সন্দেহটা আমায় আরও ঘনীভূত হয় সুভদ্রা-হরণ নাটকের বিষয়বস্তু শুনে। তবে একটা এখানে অস্বীকার করব না, শ্যামলকেই প্রথমে নাটকের বিষয়বস্তু শোনার পর সন্দেহ করি, তাই আমি নাটকটা দেখতে যাই।

সুব্রত প্রশ্ন করে, কিন্তু সুজিতকে তুই সন্দেহ করলি কখন ?

সুজিতকে ঠিক প্রথমটায় সন্দেহ করিনি—কিরীটী বলতে থাকে, এইমাত্র তো বললাম আমার প্রথম সন্দেহ পড়ে শ্যামল ও সুভদ্রার উপরে। তাদের উপরেই আমি নজর রেখে-ছিলাম। কিন্তু বিষ ও চুড়ির টুকরো আমার মনের চিন্তাধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে।

হরিদাস সামন্তকে মদের সঙ্গে বিষ দেওয়া হয়েছিল, শ্যামল মদ্যপান করে না, কিন্তু সুজিত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল—তাতেই মনে হয় আর যে-ই বিষ দিক না কেন মদের সঙ্গে মিশিয়ে শ্যামল নয়, শ্যামল যদি বিষ না মিশিয়ে থাকে মদে তবে আর কে মেশাতে পারে—আর কে ঐ ব্যাপারে, অর্থাৎ হরিদাসকে পৃথিবী থেকে সরানোর ব্যাপারে interested থাকতে পারে!

প্রথমেই তারপর মনে হয়েছিল সুভদ্রার কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারলাম সুভদ্রা অন্তঃসত্ত্বা, তখুনি বুঝলাম সুভদ্রা তাকে বিষ দেয়নি, তার গর্ভের সন্তানের জন্মদাতাকে সে বিষ দেবে না।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, হরিদাস সুজিতকে টাকা দেওয়া বন্ধ করায় হয়ত সুজিত তাকে চাপ দিচ্ছিল, অথচ নিজের জালে জড়িয়ে সুভদ্রাকেও আর টাকা দেবার জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করবার উপায় ছিল না। এমন সময় হয়ত একটা কথা তার মনে হয়েছিল, হরিদাসকে যদি বোঝাতে পারে গর্ভের সন্তান হরিদাসেরই তখন হয়ত হরিদাস আবার সুজিতকে টাকা দিতে পারে, সুভদ্রার প্রতি সন্দেহটা যেতে পারে, তাই আমার মনে হয়েছিল সুভদ্রা হরিদাসকে বিষ দেয়নি।

কাজেই সুভদ্রা যদি বিষ না দিয়ে থাকে তবে আর কে হতে পারে! শ্যামলও নয়—তাছাড়া শ্যামল তো সুভদ্রার মন পেয়েছিলই—সে কেন তবে হরিদাসকে হত্যা করতে যাবে? তাহলে আর কে—হঠাৎ তখন মনে পড়ল সুজিতের কথা। সুজিতই সুভদ্রাকে যাত্রার দলে এনেছিল। Then why not সুজিত?

ঐ পথেই তখন চিন্তা শুরু করলাম। মনে আরও সন্দেহ জাগল সুজিত সম্পর্কে, কারণ, সে-ই বলেছিল সে-রাত্রের জবানবন্দীতে, সে নাকি সুভদ্রা ও শ্যামলকে হরিদাসের সাজঘরে সে রাত্রে ঢুকতে দেখেছিল। মনে হল তবে কি ওদের উপরে সন্দেহ জাগানোর জন্যই সুজিত ওদের নাম করেছিল!

মনের মধ্যে কথাটা দানা বাঁধতে শুরু করল। তারপর ঐ চিরকুটটা—যেটা রাধারাণী ভোলাকে দিয়েছিল শ্যামলকে দিতে।

নাটকের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় হরিদাসের হাতের নোটিস্ ছিল, সে লেখার সঙ্গে চিরকুটের লেখা যখন মিলল না, তখন বুঝতে বাকি রইল না চিরকুটটা জাল এবং শ্যামলকে ফাঁসানোর সেটা আর একটা ষড়যন্ত্র।

কার লেখা তবে চিরকুটটা ! সে লিখতে পারে ! শ্যামল নয়—তবে আর কে ? আমার মনে হল, why not সুজিত ?

সুজিতের উপরে সন্দেহটা আরও বেশি ঘনীভূত হওয়ায় তার সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কৃষ্ণনগরে খোঁজ নিতেই বের হয়ে গেল সে এককালে এক বছর আর্ট স্কুলে পড়েছিল। বুঝলাম তখন সে-ই ঐ চিঠি লিখেছে হরিদাসের হাতের লেখা নকল করে। কিন্তু কেন ? What was his motive ?

নজর রাখলাম সুভদ্রা ও সুজিতের উপর। দেখা গেল সুজিত যাতায়াত করে সুভদ্রার ঘরে। তার ঘরের শয্যাও সেই সাক্ষ্যই দিয়েছিল।

সুজিত তখন আর একটা চাল চালল, একটা self-inflicted injury করে দেখাতে চাইল তাকে কেউ হত্যার চেষ্টা করেছে। হাসপাতালে attending ফিজিসিয়ানের রিপোর্ট থেকেই ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়ে গেল, কেউ তাকে ছুরি মারেনি, তাহলে ঐ ধরনের injury হতে পারে না।

যে কুয়াশাটা সুজিতকে ঘিরে ছিল সেটা এবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এদিকে ওদের দুজনের উপর থেকে নজর কিন্তু আমি সরাইনি।

সুভদ্রা অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝতে পেরেছিল তাকে আমি সন্দেহ করেছি, সেটা অবিশ্যি তাকে আমি কিছুটা কথায়বার্তায় বুঝিয়েও দিয়েছিলাম এবং অনুমান করেছিলাম ঐ কারণেই যে সে এবারে নিশ্চয়ই ছুটে যাবে সুজিতের কাছে।

অনুমান যে আমার মিথ্যা নয়, প্রমাণিত হয়ে গেল। সে ছুটে গেল। যে মুহূর্তে সংবাদ পেলাম, আমরাও সুজিতের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। অবশ্য সুজিত দুটো মারাত্মক ভুল করেছিল।

সুব্রত শুধায়, কি ?

কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কিরীটী বললে, প্রথমতঃ সে অর্থাৎ সুজিত তার জবানবন্দিতে শ্যামলকুমার ও সুভদ্রার উপরে সকলের সন্দেহটা ফেলবার জন্য তাদের সে হরিদাস সামন্তর ঘরে ঢুকতে দেখেছিল কথাটা আমার কাছে বলে।

ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে, অর্থাৎ শুরুতে হরিদাস সামন্তর কিছুক্ষণ appearance ছিল—বোধ হয় মিনিট কুড়ির, তারপরই সে চলে আসে এবং সে সময় সুজিতের নাটকে কোন appearance ছিল না।

হিসাবমত সেটা রাত সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা। এবং আমার অনুমান সেটা কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যেই কোন এক সময় সুজিত সবার অলক্ষ্যে হরিদাসের সাজঘরে ঢুকে—যেহেতু everything was pre-arranged—পূর্ব-পরিকল্পিত, সে

যাকে follow করে প্রস্তুতই ছিল, হরিদাসের মদের বোতলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসে। একটাই দ্বিতীয়

সুব্রত শুধায়, সে বিষটা তাহলে—

কিরীটী বললে, ঐ সাজঘরের মধ্যেই ছিল, রাধারমণের চোখের অসুখের জন্য স্পষ্ট যে eye drop দিয়েছিল তার মধ্যেই অ্যাট্রোপিন সালফেট মারাত্মক বিষ ছিল।

বিষের শিশির সবটাই সুজিত হয়তো মদের বোতলে ঢেলে শিশির মধ্যে তার বোতল থেকে মদ ঢেলে রাখে, যেটা পরে chemical analysis-এও প্রমাণিত হয়েছে। আর সেই কারণেই সুজিতের বোতলে কোন অ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া যায়নি analysis-এ।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ভুলটা কি? এবং কোথায়? সুভদ্রা নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে আসরেই ছিল—তাই তার পক্ষে বিষ মেশানো সম্ভবপর ছিল না, অথচ সুজিত সেটা হিসাবের মধ্যে গণ্য করেনি। সে শ্যামলকুমারের সঙ্গে সুভদ্রার নাম করে একই ঢিলে দুই পাখি মারবার ফন্দিতে সুভদ্রার নামটা করেছিল! এবং সে হয়তো জানত না, হরিদাস সুভদ্রাকে টাকা দেবার জন্য তৃতীয় অঙ্কে সে যখন free থাকবে তখন তাকে একবার তার সাজঘরে যেতে বলেছিল।

সুজিত যদি ঐ মারাত্মক ভুলটা না করত, অর্থাৎ শ্যামলকুমারের সঙ্গে সুভদ্রারও নামটা আমাকে না জানাত তাহলে হয়তো তার গিল্টি কনসান্সটা অত সহজে আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠত'না। সন্দেহের তার প্রতি শুরু আমার সেখান থেকেই।

মণীশ চক্রবর্তী বললেন, তবে সুজিতই হরিদাস সামন্তকে বিষ দিয়েছিল?

হ্যাঁ। কিরীটী বললে, সুজিত মিত্রই। তবে সুভদ্রা বোধ হয় সুজিতকে হরিদাস সামন্তর সাজঘর থেকে বেরুবার সময় দেখে ফেলেছিল। যে কারণে তার মনে তার প্রতি সন্দেহ জাগে।

কৃষ্ণা বললে, তবে সুভদ্রা সে কথা তোমাকে জানায়নি কেন তার জবানবন্দিতে?

কিরীটী বললে, ভুল তো তোমার সেইখানেই হয়েছে কৃষ্ণা।

ভুল! কৃষ্ণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে সুজিতকে সুভদ্রা প্রথমদিকে ভালবাসলেও, সুজিত যখন অর্থের লোভে অনায়াসেই তাকে হরিদাস সামন্তর মত এক প্রৌঢ় কামুকের হাতে তুলে দিল সে ভালবাসার আর অবশিষ্ট মাত্রও ছিল না—থাকতে পারে না, নারীর মন সে ব্যাপারে বড় কঠিন। অথচ সুজিতের কবল থেকে মুক্তিরও তখন আর তার কোন উপায় ছিল না।

আশ্চর্য! একবারও আমার সে কথা মনে হয়নি!

কিরীটী বললে, জানি, আর সেই ভুলেই তোমার কাগজে হয়তো লিখে রেখেছ হত্যাকারী সুভদ্রা, তাই না?

কার লেখা তবে

মনে হল, whজ্বাসল।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করল, যাক যা বলছিলাম, সুজিত যে মুহূর্তে বুঝতে পেরে-ছিল সুভদ্রার মন শ্যামলকুমারের দিকে ঝুঁকেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছে, সুভদ্রার গর্ভে হরিদাসের সন্তান থাকা সত্বেও, তখনই সে স্থির করে তার plan of action—একই সঙ্গে শ্যামল ও সুভদ্রাকে সরাতে হবে। কারণ, সে তো বুঝেছিলই— সুভদ্রা হরিদাসের কাছে না থাকলে তাকে দোহন আর চলবে না। শ্যামলকুমারকে দোহন করা সম্ভবপর হবে না।

মল্লিক সাহেব শুধালেন, তারপর? বলুন, থামলেন কেন মিঃ রায়?

কিরীটী আবার বলতে লাগল, শ্যামল ও সুভদ্রা দুজনকেই একসঙ্গে কেমন করে ফাঁসানো যায় ভাবতে ভাবতেই হয়তো সুজিত ঐ পথটি বেছে নিয়েছিল and plan was successful—কেউ ধরতে পারত না তাকে অত সহজে, যদি না সে আগ বাড়িয়ে ওদের দুজনের নাম করে বসত আমার কাছে।

আচ্ছা, একটা কথা—কৃষ্ণা বলে, সুভদ্রা কি কোনদিনই সুজিতকে ভালবাসেনি?

বাসেনি—তা তো বলিনি! তবে রমণীর মন তো—আর তার বদলের কারণও তো আগে কিছুটা বলেছি! এবং শেষে শ্যামলকুমারের আবির্ভাব রঙ্গমঞ্চে, যার প্রতি মন যে কোন নারীর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল।

আচ্ছা, তোমার কি ধারণা—কৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করে, শ্যামল জানতে পেরেছিল সুভদ্রা মা হতে চলেছে?

সম্ভবতঃ জানতে পেরেছিল—বা হয়তো সুভদ্রা ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবে সেটা তো ওদের মিলনের ব্যাপারে আজকালকার দিনে কলকাতা শহরে অসংখ্য ব্যবস্থা থাকায় এমন কোন অন্তরায় হত না। তখন ঐ ধরনের কাঁটা অনায়াসেই তারা পরে দূর করে নিতে পারত।

থাক সে কথা। এবারে সুজিতের দ্বিতীয় ভুলের কথায় আসা যাক—What was his second mistake!

কিরীটী বলতে লাগল, সুজিত নিশ্চয়ই হরিদাসের সাজঘর থেকে বের হয়ে আসবার সময় সুভদ্রাকে লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু সুভদ্রা যখন হরিদাসের ঘরে গিয়ে ঢোকে, হরিদাসের তখন already মৃত্যু হয়েছে—সে কথাটা সুজিত জানত, কারণ হরিদাস অভিনয় করার সময় ঘন ঘন মদ্যপান করত। আর সে-রাত্রে সুভদ্রার বর্ধমানে চলে যাবার কথা শুনে আরও নিশ্চয়ই মনটা তার বিক্ষিপ্ত ছিল, তাই হরিদাস আসর থেকে এসেই মদ্যপান করবে যেমন সে জানত, তেমনি এও সে জানত সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে।

কাজেই সুভদ্রা যখন টাকার জন্য হরিদাসের সাজঘরে ঢুকেছিল—তাকে follow করে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে নিঃসন্দেহে—সুজিতের ঐ সময় সাজঘরে ঢোকাটাই দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল।

দুজনে সাজঘরে মুখোমুখি হল। যা ছিল অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে—সুভদ্রার মনে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঐ জন্যই পরে। তবে এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার বোধ হয় ঘটেছিল। সুজিতকে বোধ হয় সুভদ্রা কিছু বলে, ফলে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হয় যে সময় সুভদ্রার হাতের চুড়ি একটা ভেঙে যায়। আর ঐ চুড়িরই ভগ্নাংশ প্রমাণ দেয় ঘরের মধ্যে মৃত্যু[illegible] ঠিক আগে বা পরে কোন এক সময় সুভদ্রা হরিদাসের ঘরে দ্বিতীয়বার প্রবেশ ক[illegible]।

যা হোক, সুজিতের প্রতি আমার সন্দেহ[illegible]অ্যাসিস্ট্যান্ট। একই গ্রামে ছিল সাধনের

কন্যা প্রহ[illegible]

জানা[illegible] স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল সাধন। নয় [illegible]ও অনেক চেষ্টা করে, কোন সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে একটি [illegible]

[illegible] শরণাপন্ন হয়। [illegible]নিটের জন্য ঐ অঞ্চল নিষ্প্রদীপ হয়।

ক[illegible] জানি কেন যে ব্রজদুলাল সিনেমা থেকে ফিরে এসে তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠবার [illegible]ত বা অন্যান্য ভা[illegible]লের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে। তার কৌতূহল হয় এবং গিয়ে [illegible] আত্মীয়স্বজন বা প[illegible] হা-হা করছে খোলা। খোলা দরজা-পথে উঁকি দিতেই ব্রজদুলালের কারণ হয়ত [illegible] তার চোখে পড়ে।

[illegible]ইঝি ছিল। [illegible]উন ও পায়জামা পরিহিত ব্রজদুলাল সাহা একটা সোফার উপরে উপবিষ্ট, [illegible] দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও মাথাটা সোফার হাতলের উপর থেকে অসহায় ভাবে নীচের দিকে [illegible] একটা হাত ঝোলা অবস্থায় মাটিতে ঠেকে রয়েছে।

[illegible]থকে যায় [illegible], ব্রজদুলাল সাহার চেয়ারে বসে থাকার সমস্ত ভঙ্গীটাই এমন যে—রেবেকা সেও[illegible]ক দৃষ্টি পড়ামাত্রই ভয়ানক চমকে ওঠে।

[illegible] ব্রজ[illegible]ন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে খোলা দরজা-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। [illegible] গিয়ে দাঁড়াতেই ঝুলে-থাকা ব্রজদুলালের মুখটা সে দেখতে পায়।

[illegible] চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসছে। সমস্ত মুখে তখনও স্পষ্ট হয়ে [illegible]ছে যেন অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন। [illegible]হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ।

বিশ্রামনের একটা গোলাকার [illegible]থরের টেবিলের উপরে জ্বলছে সুদৃশ্য একটি টেবিল-[illegible]ল্প। তার পাশে একটি অর্ধসমাপ্ত ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের বোতল, একটি দামী কাচের [illegible]র গ্লাস উল্টে পড়ে [illegible]। তার পাশে সোডা সাইফন ও চাবির একটা রিং।

[illegible]স্ফুট চিৎকার রেবেকার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে।

[illegible]টনার আকস্মিকতায় কি করবে সে বুঝতে পারে না[illegible] তাকিয়ে থাকে আরও

তেমনি শক্ত তার, এবং আমরা সেখানে ঐ

লুকনো ছোরার আঘাতেই সুভদ্রাকেও হয়তো

এই হচ্ছে মোটামুটি কাহিনী।

কিরীটী থামল।

হাত বাড়িয়ে চুরোটের বাক্স থেকে একটা চুরোট ও লাই

রত বললে, কৃষ্ণা, চা।

acti উঠে গেল।

সুভদ্রা হরিদাস বললে, ওরা—সুভদ্রা ও শ্যামল স্থির

দোহন করা সম্ভবপর হবে না।

মল্লিক সাহেব শুধালেন, তারপর? বলুন, থামলেন কেন।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, শ্যামল ও সুভদ্রা দুজনকেই একসঙ্গে ফাঁসানো যায় ভাবতে ভাবতেই হয়তো সুজিত ঐ পথটি বেছে নিয়েছিল and plan successful—কেউ ধরতে পারত না তাকে অত সহজে, যদি না সে আগ বাড়িয়ে দুজনের নাম করে বসত আমার কাছে।

আচ্ছা, একটা কথা—কৃষ্ণা বলে, সুভদ্রা কি কোনদিনই সুজিতকে ভালবাসেনি?

বাসেনি—তা তো বলিনি! তবে রমণীর মন তো—আর তার বদলের কারণও আগে কিছুটা বলেছি! এবং শেষে শ্যামলকুমারের আবির্ভাব রঙ্গমঞ্চে, যার প্রতি মন যে কোন নারীর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল।

আচ্ছা, তোমার কি ধারণা—কৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করে, শ্যামল জানতে পেরেছিল সুভদ্রা মা হতে চলেছে?

সম্ভবতঃ জানতে পেরেছিল—বা হয়তো সুভদ্রা ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবে সেটা তো ওদের মিলনের ব্যাপারে আজকালকার দিনে কলকাতা শহরে অসংখ্য ব্যবস্থা থাকায় এমন কোন অন্তরায় হত না। তখন ঐ ধরনের কাঁটা অনায়াসেই তারা পরে দূর করে নিতে পারত।

থাক সে কথা। এবারে সুজিতের দ্বিতীয় ভুলের কথায় আসা যাক—What was his second mistake!

কিরীটী বলতে লাগল, সুজিত নিশ্চয়ই হরিদাসের সাজঘর থেকে বের হয়ে আসবার সময় সুভদ্রাকে লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু সুভদ্রা যখন হরিদাসের ঘরে গিয়ে ঢোকে, হরিদাসের তখন already মৃত্যু হয়েছে—সে কথাটা সুজিত জানত, কারণ হরিদাস অভিনয় করার সময় ঘন ঘন মদ্যপান করত। আর সে-রাত্রে সুভদ্রার বর্ধমানে চলে যাবার কথা শুনে আরও নিশ্চয়ই মনটা তার বিক্ষিপ্ত ছিল, তাই হরিদাস আসর থেকে এসেই মদ্যপান করবে যেমন সে জানত, তেমনি এও সে জানত সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে।

যখানে তিনি এবং লোকজনের মধ্যে চারজন ভৃত্য, দু'জন ঠাকুর, দু'জন দারোয়ান, ও একজন অল্পবয়েসী সেক্রেটারী ছিল—ভারতীয় খৃষ্টান, বছর চব্বিশের তরুণী,

পটা নিচে

কিরীটী াকে থাকবার জন্য তিনতলায় দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্রজদুলাল।

াকটা ধোঁ

দুই

দন সকালে

ন এবং রেবেকা কেবল সেক্রেটারীই নয়, বাড়ির কেয়ারটেকার হিসাবেও ছিল। অ

দ্বি একজন, সাধন মিত্র।

তা সাধন ছিল সাহার অফিসে তাঁর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। একই গ্রামে ছিল সাধনের

ীটী।

এইটুকু র স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল সাধন।

প্রদীপের াও অনেক চেষ্টা করে, কোন সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে একদি

সম্ব্যবহ শরণাপন্ন হয়। মিনিটের জন্য ঐ অঞ্চল নিষ্প্রদীপ হয়।

ত জানি কেন যে ব্রজদুলাল সিনেমা থেকে ফিরে এসে তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠবার

চত বা অন্যান্য ভা লালের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে। তার কৌতূহল হয় এবং গিয়ে

আত্মীয়স্বজন বা পরি হা-হা করছে খোলা। খোলা দরজা-পথে উঁকি দিতেই ব্রজদুলালের

কারণ হয়ত া তার চোখে পড়ে।

াইঝি ছিল। টন ও পায়জামা পরিহিত ব্রজদুলাল সাহা একটা সোফার উপরে উপবিষ্ট, দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও মাথাটা সোফার হাতলের উপর থেকে অসহায় ভাবে নীচের দিকে

কে একটা হাত ঝোলা অবস্থায় মাটিতে ঠেকে রয়েছে!

াকে যায় র, ব্রজদুলাল সাহার চেয়ারে বসে থাকার সমস্ত ভঙ্গীটাই এমন যে—রেবেকা

সেও কে দৃষ্টি পড়ামাত্রই ভয়ানক চমকে ওঠে।

ব্রজ ান সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে খোলা দরজা-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

দুনি গিয়ে দাঁড়াতেই ঝুলে-থাকা ব্রজদুলালের মুখটা সে দেখতে পায়।

চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসছে। সমস্ত মুখে তখনও স্পষ্ট হয়ে

ছে যেন অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন। দু'হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ।

বিদ্যাসনের একটা গোলাকার শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে জ্বলছে সুদৃশ্য একটি টেবিল-ল্প। তার পাশে একটি অর্ধসমাপ্ত ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের বোতল, একটি দামী কাচের

র গ্লাস উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে সোডা সাইফন ও চাবির একটা রিং।

একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার রেবেকার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে।

টার ঘটনার আকস্মিকতায় কি করবে সে বুঝতে পারে না। তাকিয়ে থাকে আরও

কিরীটী (৮

সাধনেরও আপনার বলতে ত্রিসংসারে কেউ ছিল না। ছোটবেলায় একই দিনে কলেরায় মা বাপ হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সে গাঁয়ে দূরসম্পর্কীয় এক দিদির বাড়িতে।

গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকটা পাস করবার পর দিদির আশ্রয়ে আর ভার-বোঝা না হয়ে থেকে একদিন সামান্য একটি সুটকেসে খান দুই জামা-কাপড় নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হল। পাইস হোটেলে খেয়ে এখান-ওখানে অনেক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোন সুরাহাই হয় না। অবশেষে একদিন ব্রজদুলালের অফিসে গিয়ে সাহসে ভর করে দেখা করল। গ্রামের কৃতী পুরুষ ব্রজদুলাল যদি একটা হিল্লে করে দেন এই আশায়। ব্রজদুলাল ছেলেটির চেহারায় ও তার সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হলেন। স্থান দিলেন নিজের গৃহে। ব্রজদুলালের আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে পেরে সে যেন বেঁচে গিয়েছিল। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ব্রজদুলালের কাছে সাধন একটা চাকরিই চেয়েছিল কিন্তু ব্রজদুলাল বললেন, চাকরি দেখা যাবে পরে, এখন পড়াশুনা কর।

action

সুভদ্রা

successful—কেউ ধরতে পারত না। তাকে অত সহ.

দুজনের নাম করে বলত আমার কাছে। ...য়ে যাও।

আচ্ছা, একটা কথা—কৃষ্ণা বলে, সুভদ্রা কি কোনদিনই সুজি.

বাসেনি—তা তো বলিনি! তবে রমণীর মন তো—আর তার বার্ণনীতিতে এম. এ. পাস

আগে কিছুটা বলেছি! এবং শেষে শ্যামলকুমারের আবির্ভাব রঙ্গমঞ্চে, যা

কোন নারীর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল। ...অধিক ভালবেসে-

আচ্ছা, তোমার কি ধারণা—কৃষ্ণা আবার প্রশ্ন করে, শ্যামল জানতে পেরেছিল... বঞ্চিত

মা হতে চলেছে?

সম্ভবত: জানতে পেরেছিল—বা হয়তো সুভদ্রা ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবে সে

ওদের মিলনের ব্যাপারে আজকালকার দিনে কলকাতা শহরে অসংখ্য ব্যবস্থা থাক.

কোন অন্তরায় হত না। তখন ঐ ধরনের কাঁটা অনায়াসেই তারা পরে দূর ক...লের গর্ভা

পারত।

থাক সে কথা। এবারে সুজিতের দ্বিতীয় ভুলের কথায় আসা যাক—What w...

his second mistake!

কিরীটী বলতে লাগল, সুজিত নিশ্চয়ই হরিদাসের সাজঘর থেকে বের হয়ে আসবার

সময় সুভদ্রাকে লক্ষ্য করেছিল—কিন্তু সুভদ্রা যখন হরিদাসের ঘরে গিয়ে ঢোকে, হরিদাসে... এবং

তখন already মৃত্যু হয়েছে—সে কথাটা সুজিত জানত, কারণ হরিদাস অভিনয় করা...

সময় ঘন ঘন মদ্যপান করত। আর সে-রাত্রে সুভদ্রার বর্ধমানে চলে যাবার কথা শুনে আর... কটা

নিশ্চয়ই মনটা তার বিক্ষিপ্ত ছিল, তাই হরিদাস আসর থেকে এসেই মদ্যপান করবে যেমন... রাত্রে

সে জানত, তেমনি এও সে জানত সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে।

সন্ধ্যা রাত সোয়া সাতটা নাগাদ গৃহে এসে পৌঁছুবার জন্য।
নিজেরই গাড়িতে গর্চা লেনের বাড়িতে। ‑‑‑ প্রশ্ন করেন।

রাত আটটা থেকে ন'টা তাঁর শোবার ঘরে সাধনের সঙ্গে কি সব বলেন।
পরই সাধনকে তিনি একটি জরুরী ব্যাপারে সেই রাত্রেই গাড়ি নিয়ে পাট-
পূর্বে লাহা অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর নতুন ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হয়েছিল, সেই অফিসে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে
বলেন।

সাধন নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে রাত সাড়ে নটা নাগাদ চলে যায় পাটনায়।

যতদূর জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার রাত্রে ব্রজদুলালের বাড়িতে তিনি এবং ভৃত্যের দলই ছিল। কারণ, দুপুরের দিকে বের হয়ে গিয়ে রাত সাড়ে আটটার শোতে রেবেকা মেট্রোতে সিনেমা দেখতে যায়।

তাছাড়া সে জানত না যে ঐ রাত্রেই ফিরে আসবেন ব্রজদুলাল।

রাত দশটায় ডিনার শেষ করে ব্রজদুলাল শুতে যান।

রাত পৌনে এগারোটায় কুড়ি মিনিটের জন্য ঐ অঞ্চল নিষ্প্রদীপ হয়।

সোয়া বারোটায় রেবেকা সিনেমা থেকে ফিরে এসে তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় দোতলায় ব্রজদুলালের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে। তার কৌতুহল হয় এবং গিয়ে দেখে ঘরের দরজা হা-হা করছে খোলা। খোলা দরজা-পথে উঁকি দিতেই ব্রজদুলালের ঘরের মধ্যের দৃশ্যটা তার চোখে পড়ে।

স্লিপিং গাউন ও পায়জামা পরিহিত ব্রজদুলাল সাহা একটা সোফার উপরে উপবিষ্ট, কিন্তু দেহের উর্ধ্বাংশ ও মাথাটা সোফার হাতলের উপর থেকে অসহায় ভাবে নীচের দিকে ঝুলছে। একটা হাত ঝোলা অবস্থায় মাটিতে ঠেকে রয়েছে।

ঐভাবে, ব্রজদুলাল সাহার চেয়ারে বসে থাকার সমস্ত ভঙ্গীটাই এমন যে—রেবেকা যেন সেদিকে দৃষ্টি পড়ামাত্রই ভয়ানক চমকে ওঠে।

কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে খোলা দরজা-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ঝুলে-থাকা ব্রজদুলালের মুখটা সে দেখতে পায়।

চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসছে। সমস্ত মুখে তখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে যেন অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন। দু'হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ।

সামনের একটা গোলাকার শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে জ্বলছে সুদৃশ্য একটি টেবিল-ল্যাম্প। তার পাশে একটি অর্ধসমাপ্ত ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের বোতল, একটি দামী কাচের শূন্য গ্লাস উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে সোডা সাইফন ও চাবির একটা রিং।

একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার রেবেকার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে।

‑‑টায় ঘটনায় আকস্মিকতায় কি করবে সে বুঝতে পারে না।‑‑ তাকিয়ে থাকে আরও

সাধনেরও আপনার বলতে ত্রিসং ... ত সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ... । একবার

লেরায় মা বাপ হারিয়ে আশ্রয় ... তাকে।

গ্রামের স্কুল থেকে ম...

য়ে থেকে একদিন ...। ব্রজদুলাল সাহা যে মৃত সে কথাটা বুঝতে রেবেকার কেন যেন পস্থিত হল। তবু সম্বিৎ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই—সোজা ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পান ... এসে দাঁড়ায়।

ভাবে, কি করা কর্তব্য—কি সে করবে!

অবশেষে কি মনে হওয়ায় পাশের ঘরে গিয়ে সাহার পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ চক্রবর্তীকে ফোন করে দেয় অবিলম্বে একবার আসার জন্য।

ফার্ন রোডেই ডাঃ চক্রবর্তী থাকেন। ব্রজদুলালের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়। ফোন পেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসেন তিনি।

রেবেকা বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল, ডাঃ চক্রবর্তীর গাড়ির সাড়া পেয়ে নিজে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

ডাঃ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার, কেমন আছেন মিঃ সাহা?

চলুন, দেখবেন।

উপরে গিয়ে ব্রজদুলালকে পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন ডাঃ চক্রবর্তী তিনি মৃত।

এতটুকুও আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিকটবর্তী থানায় ফোন করে দেন।

আরও আধ ঘণ্টা পরে থানা-অফিসার সুখময় মল্লিক এসে হাজির হন।

ডাঃ চক্রবর্তীর মৃতদেহ দেখেই মনে হয়েছিল, কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় ব্রজদুলালের মৃত্যু ঘটেছে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে পুলিসকে খবর দিয়েছিলেন।

পুলিস অফিসার সুখময় মল্লিক ও ডাঃ চক্রবর্তীর প্রথমটায় ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা আত্মহত্যা। মদের সঙ্গে কোন তীব্র বিষপান করে তিনি বুঝি আত্মহত্যা করেছেন এবং সেইভাবে তদন্ত শুরু করেছিলেন সুখময় মল্লিক।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ওলট-পালট হয়ে গেল আকস্মিক ভাবে অকুস্থানে কিরীটীর আবির্ভাবে পরের দিন সকালে।

চার

সুখময় মল্লিক যখন নীচের পারলারে বসে সকলের জবানবন্দি নিচ্ছেন—কিরীটী সেখানে গিয়ে উপস্থিত।

মল্লিকের সঙ্গে কিরীটীর পূর্বপরিচয় ছিল। কিরীটীকে আসতে দেখে ঐ সময় মল্লিক একটু যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই শুধায়, কি ব্যাপার মিঃ রায়, আপনি?

সে জানত, তেমনি ... কাল রাত দশটা নাগাদ মিঃ সাহা আমাকে ফোন করেছিলেন আজ

সকালে আটটা নাগাদ একবার তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করবার জন্ম।

কেন বলুন তো? মল্লিক যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করেন।

কি একটা জরুরী ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য চান বলেছিলেন।

কি জরুরী ব্যাপার, কিছু বলেন নি আপনাকে?

না, তা অবিশ্যি কিছু ফোনে বলেন নি। কিন্তু আপনি এখানে—কি ব্যাপার বলুন তো সুখময়বাবু?

কিরীটীর জ্ঞাতার্থে সুখময় মল্লিক তখন গতরাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা বিবৃত করেন।

সব শুনে কিরীটী তো একেবারে বোবা। বলে, সে কি! তিনি মৃত?

হ্যাঁ। খুব সম্ভবতঃ সুসাইড্ বলে মনে হচ্ছে।

সুসাইড্!

হ্যাঁ, সেই রকম মনে হচ্ছে।

হুঁ, তা মৃতদেহ কোথায়?

ওপরে তাঁর শোবার ঘরে।

মৃতদেহটা আমি একবার দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই। চলুন না।

আর কালবিলম্ব না করে কিরীটী সুখময় মল্লিকের সঙ্গে দ্বিতলে যায় এবং যে ঘরের মধ্যে তখনও সোফার উপরে মৃতদেহটা ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

মৃতদেহের ভঙ্গীটাই যেন প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিরীটীর।

মৃতদেহের ভঙ্গী দেখলে মনে হয় যেন মৃত্যুর কারণটাই যাই হোক না কেন, ঐ ভাবে চেয়ারের উপরে বসে বসে তাঁর মৃত্যু হয়নি।

মৃত্যুর পরে কেউ ব্রজদুলালকে ঐ ভাবে সোফাটার উপরে বসিয়ে দিয়েছে যেন।

মৃতের দু'চোখে আতঙ্ক নয়, যেন এখনও বিস্ময়ের আকস্মিকতা স্পষ্ট হয়ে আছে।

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে মল্লিক প্রশ্ন করে, কি মনে হচ্ছে আপনার মিঃ রায়?

আমার কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না মিঃ মল্লিক। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে।

মনে হচ্ছে না?

না।

তবে?

কি জানি কেন মনে হচ্ছে, দেহের ভঙ্গী যেন ঠিক আত্মহত্যা নয়। তাছাড়া কোন তীব্র বিষের ক্রিয়াতেই যদি আকস্মিক মৃত্যু ঘটে থাকে, মৃত্যু মুহূর্তের বিক্ষেপ ও কুঞ্চনের কোন চিহ্নই তো মৃতের দেহে দেখা যাচ্ছে না।

কথা বলে পুনরায় কিরীটী প্রখর দৃষ্টি নিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকে আরও

কিছুক্ষণ।

দেখতে দেখতেই তার নজরে পড়ে মৃতের ঝুলন্ত ডান হাতের তর্জনীর দিকে। তর্জনীর মাথায় কালো একটা দাগ।

এগিয়ে গিয়ে মৃতের মুখটাও একবার তুলে দেখল। ঘাড়টা শক্ত হয়ে রয়েছে।

বুঝতে পারে কিরীটী, মৃতদেহে রাইগার মর্টিস সেট্ ইন করেছে ইতিপূর্বেই।

তারপর তর্জনীর মাথায় ছোট কালো দাগটিও বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মিঃ মল্লিক কিরীটীকে লক্ষ্য করতে থাকেন নিঃশব্দে।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল কিরীটী।

বেশ বড় সাইজের ঘর। চারিদিকে বড় বড় জানলা। দক্ষিণে একটিমাত্র জানলার কবাট ব্যতীত সব বন্ধ। এবং সব জানলাতেই পর্দা টানা। রুচি আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের চিহ্ন—যা কিছু ঘরের মধ্যে আছে সবকিছুর মধ্যেই যেন বিরাজ করছে। একধারে কোণা-কুনি একটি সিঙ্গল বেড।

মাথার ধারে ত্রিপয়ের উপরে ঈষৎ নীলাভ রংয়ের ফোন।

অন্যদিকে একদিকে একটি গড্‌রেজের স্টীলের প্রমাণ সাইজের আলমারি, তার পাশেই দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা একটি লোহার সেফ্।

আর এক পাশে একটি কাঁচের ছোট আলমারি। তার মধ্যে কিছু ফরেন লিকারের বোতল ও কাচের গ্লাস ইত্যাদি সাজানো। এবং ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় সুদৃশ্য মাঝারি সাইজের একটি সোফা সেট।

আর কোন আসবাবপত্র নেই ঘরের মধ্যে। মেঝেতে দামী পুরু কাশ্মীরী কার্পেট বিস্তৃত। ঘরের মধ্যে দুটি দরজা।

একটি দরজা খোলাই ছিল। অন্য দরজাটি পাশের ঘরে যোগাযোগ রেখেছে। সেটা এ-ঘর থেকে বন্ধ। দুটি দরজায়ই ইয়েল লক্ লাগানো।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুমও আছে। বাথরুমের দরজাটা ভেজানোই ছিল। বাথরুমের ভিতরে গিয়েও একবার ঘুরে এল কিরীটী।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকে আবার যেখানে সোফার উপরে মৃতদেহ ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল।

সামনে ত্রিপয়ের উপরে টেবিল-ল্যাম্পটা তখনও জ্বলছিল।

নতুন ঝকঝকে দামী একটা টেবিল-ল্যাম্প। প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে লাগানো ল্যাম্পটা। ল্যাম্পের সঙ্গে যে সুইচ সেটা টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল কিরীটী।

তারপরই হঠাৎ সুখময় মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললে কিরীটী, সব চাইতে পুরনো

কর এ-বাড়িতে কে মিঃ মল্লিক ?

জীবন।

তাকে একবার ডাকতে পারেন এ-ঘরে ?

এখুনি ডাকছি। সুখময় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

পাঁচ

মিনিটের মধ্যেই ভৃত্য জীবনকে সঙ্গে নিয়ে সুখময় ঘরে এসে ঢুকলেন।

লোকটার বয়স হয়েছে। চামড়ার কুঞ্চন ও চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে-খাটো নাদুস-নুদুস চেহারা, ভারী একজোড়া গোঁফ। পরনে একটা ফর্সা ধুতি ও গায়ে অনুরূপ ফতুয়া।

কিরীটী লোকটার মুখের দিকে তাকাল।

বড় ড্যাবডেবে চোখ। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ভীতি।

এরই নাম জীবন, মিঃ রায়। সুখময় পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তুমি বাবুর কাছে কত দিন আছ জীবন ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে তা প্রায় বছর চোদ্দ তো হবেই।

তোমার চাইতে তাহলে বোধ হয় পুরনো আর কেউ এ বাড়িতে নেই ?

না।

বাবুর কাজকর্ম কে বেশী দেখাশোনা করত ?

আজ্ঞে বরাবর আমিই করতাম।

তুমিই ?

আজ্ঞে। এবং ঘরে আমি ছাড়া আর কোন চাকরবাকরকে তো তিনি ঢুকতেই দিতেন না।

হুঁ। আচ্ছা জীবন, দেখ তো এই ঘরের মধ্যে ভাল করে চেয়ে কোন কিছু খোয়া গিয়েছে বা নতুন কিছু তোমার নজরে পড়ছে কিনা।

কিরীটীর নির্দেশে জীবন অনেকক্ষণ ধরে ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ মৃতের সামনে ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে বলে, আজ্ঞে ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা—

কি ?

ওটা তো ছিল না মনে হচ্ছে।

ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা ছিল না ?

আজ্ঞে না।

ভাল করে দেখে বল।

জীবন আরও এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা দেখে বলে, না বাবু, এটা ছিল না। তবে অনেকটা এই রকমই দেখতে টেবিল-ল্যাম্প ছিল এখানে। এটা নতুন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া সেটার ঢাকনাটা ছিল নীল রংয়ের রেশমী কাপড় ঝালর দেওয়া। আর এটা তো দেখছি সবুজ প্লাস্টিকের। না, এ সে ল্যাম্প নয়।

ঠিক বলছ ?

আজ্ঞে।

এটা এর আগে দেখেছ ?

না।

আচ্ছা জীবন, তোমার বাবু কি প্রত্যহ মদ খেতেন ?

হ্যাঁ। শোবার আগে ঐখানে বসে প্রত্যহ খেতেন। এবং খেতে খেতেই রাত্রে সংবাদ-পত্র পড়তেন।

কিন্তু কোন কাগজ তো দেখছি না। কাল রাত্রে কি কাগজ পড়েননি ?

কাল রাত্রে তো আমি কাগজ দিয়েছিলাম। তিনি নিজে চেয়ে নিয়েছিলেন কাগজটা।

কি কাগজ পড়তেন তিনি ?

আজ্ঞে স্টেটস্‌ম্যান কাগজ।

কাল রাত্রে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

আজ্ঞে।

কখন কাল রাত্রে তুমি তোমার বাবুকে শেষ জীবিত দেখ ?

রাত সাড়ে ন'টায় সাধনবাবু ঘর থেকে চলে যাবার পরই বাবু আমাকে আবার নীচে থেকে ডাকেন।

কলিং বেল আছে নাকি এ ঘরে ?

আছে। দুটো কলিং বেল, এই যে দেখুন না—সোফার গায়ে একটা, আর একটা খাটের সঙ্গে।

হুঁ। তারপর ?

আমি ঘরে এলে বাবু আমাকে সোডা বোতল ও গ্লাস সব দিতে বললেন। আমি সব দেবার পর তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কাল রাত্রে ?

হ্যাঁ।

ঘরের দরজা বন্ধ করেই কি তিনি রোজ শুতেন ?

হ্যাঁ। দরজা বন্ধ করেই বরাবর শুতেন।

আচ্ছা, ঐ যে বন্ধ দরজাটা দেখা যাচ্ছে—পাশের ঘরেরই তো ?

হ্যাঁ।

পাশের ঘরটায় কেউ থাকে?

আজ্ঞে না। ওটা বাবুর প্রাইভেট চেম্বার। তবে বাড়িতে যখন কাজ করতেন ঐ ঘরে বসেই করতেন।

ঐ দরজার তালার চাবিটা কোথায়?

চাবি কোথায় তা জানি না। তবে দরজাটা এ ঘর থেকে খোলা ও বন্ধ করা দুই গেলেও ও-ঘর থেকে চাবি ছাড়া খোলা যায় না।

কিরীটী অতঃপর দরজার চাবির 'নব' ঘুরিয়ে দরজা খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরটি মাঝারি আকারের। দু'দিকের দেওয়ালে স্টীলের আলমারি ও কিছু স্টীলের র‍্যাক। র‍্যাকে ফাইল-পত্র সব সাজানো।, মাঝখানে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুদৃশ্য দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটি দামী গদী-মোড়া রিভলভিং চেয়ার ছাড়াও গোটাচারেক চেয়ার অন্যদিকে টেবিলে রয়েছে, টেবিলের উপরে একটি টেবিল-ল্যাম্প ও ফোন।

ঘরটি এয়ার-কণ্ডিশন করা। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ এবং ভারী লাল রঙের দামী পর্দা ঝোলানো জানলায় দরজায়। মেঝেতে দামী কার্পেট বিস্তৃত। এ ঘরেও দুটি দরজা। ঐ মধ্যবর্তী দরজাটা ছাড়াও অন্য একটি দরজা।

সেই দরজাটিও বন্ধ ছিল এবং কিরীটী পরীক্ষা করে দেখল—ঐ দরজাতেও ইয়েল লক্ সিস্টেম।

ছয়

অফিস-রুমটা পরীক্ষার পর কিরীটী সুখময়কে নিয়ে আবার নীচে এল যে ঘরে বসে সুখময় সকলের জবানবন্দি নিচ্ছিলেন।

সুখময় প্রশ্নটা করেন, তাহলে অন্যরকম কিছু বলেই তো আপনার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, মিঃ রায়?

কিরীটী পাইপটায় পাউচ থেকে তামাক ভরতে ভরতে মৃদু কণ্ঠে বলে, আই অ্যাম সরি সুখময়বাবু, আমার কিন্তু সেরকমই বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা—

কি মনে হচ্ছে?

ইট ইজ নট এ কেস অফ সুসাইড! মনে হচ্ছে ডেফিনিট কেস অফ হোমিসাইড!

হোমিসাইড? মানে হত্যা?

হ্যাঁ।

কিন্তু—কেন?

দেখুন মিঃ মল্লিক, আপনার নজর পড়েছে কিনা জানি না—তবে আমার কিন্তু তিনটে

ব্যাপার অত্যন্ত 'কুইয়ার' লাগছে।

'কুইয়ার' লাগছে, কি?

প্রথমত: ধরুন লোকটার যে পরিচয় এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে পেয়েছি—নিশ্চয়ই বলতে পারি আমরা লোকটা সেল্‌ফ-মেড-ম্যান এবং জীবনে যাকে বলে সত্যিকারের সাকসেসফুল ম্যান, তাই। সেক্ষেত্রে ঐ ধরনের একজন লোক হঠাৎ কেন সুইসাইড করতে যাবেন?

তা অবিশ্যি—

দ্বিতীয়ত: ধরুন, ঐ ধরনের লোকদের শত্রু থাকাটা এমন কিছু বিচিত্র যেমন নয়, তেমনি লোকটা যে একেবারে সাধু-চরিত্রের ছিলেন তাও মনে করবার কিছু নেই এবং সেক্ষেত্রে সেদিক থেকে গোপন আঘাত আসাটাও খুব একটা অস্বাভাবিক কি?

বুঝলাম না আমি ঠিক!

বুঝলেন না?

না।

লোকটা বিপত্নীক ছিল, অর্থ ছিল এবং কিছু কিছু দোষও যে ছিল তাও জেনেছি আমরা। আর—

আর?

সুন্দরী তরুণী সেক্রেটারীও ছিল এবং তার থাকবার ব্যবস্থাও এই বাড়িতেই। ওয়েল—

তবে কি আপনি মিঃ রায়—

কিছুই আমি বলছি না সুখময়বাবু—ব্যাপারগুলো শুধু চিন্তা করতে বলছি। এবং সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রব্যাবিলিটি কোথায় বেশী? হত্যার না আত্মহত্যার? তারপর কাম টু আওয়ার থার্ড পয়েন্ট—যে লোকটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুইসাইড করবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার পক্ষে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার ডিসকাশন করে তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্টকে অমন কুল ব্রেনে পাটনা পাঠানো কি খুব স্বাভাবিক?

সুখময়বাবু চুপ করে থাকেন।

কিরীটী ইতিমধ্যে হস্তধৃত পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করেছিল। পাইপটায় গোটা দুই টান দিয়ে বলে, আরও কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনার কাছে বিচিত্র লেগেছে!

কি বলুন তো?

প্রথমত: উপরের ঘরের ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা। আগেরটা কোথায় গেল এবং নতুনটাই বা কে আনল এবং কেন আনা হল?

ল্যাম্পটা!

হ্যাঁ। দ্বিতীয়তঃ ঐদিনকার স্টেটসম্যান কাগজটা কোথায় গেল?

কাগজটা!

হ্যাঁ। তৃতীয়তঃ ঘরের যে দরজাটা নিজ হাতে ব্রজদুলাল বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটা কে খুলল?

কেমন যেন বোকার মতই ফ্যালফ্যাল করে সুখময় মল্লিক কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কি বলবেন জবাবে বুঝতে পারেন না। বলে কি লোকটা!

প্রথম দিককার তিনটি যে পয়েন্ট বললেন তার অবিশ্যি কিছু অর্থ হয়। কিন্তু শেষে যে কথাগুলো বললেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই যেন বুদ্ধির গোচর হয় না মল্লিকের।

নতুন টেবিল-ল্যাম্পটা কোথা থেকে এল? ঐদিনের স্টেটসম্যান কাগজটা কোথায় গেল?

যে দরজাটা ব্রজদুলাল নিজে হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে দরজাটা কে খুললে?

কিরীটী বোধ করি মল্লিকের মনের ভাবটা অনুধাবন করতে পারে।

অতঃপর মৃদু হেসে বলে, বসুন, সুখময়বাবু—আপনার জবানবন্দি নেওয়া নিশ্চয়ই শেষ করতে পারেননি এখনো?

না। সবে শুরু করেছিলাম।

তাহলে শেষ করুন।

আপনি যা বললেন তাই যদি হয় তো মিঃ রায় তাহলে এখন তো দেখছি সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে। সুখময় বসতে বসতে বলেন কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ, ব্রজদুলাল সাহাকে কেউ গতরাত্রে হত্যা করেছে যখন আমরা বুঝতেই পারছি, জবানবন্দির ব্যাপারেও দৃষ্টিটা আপনার সেই দিকেই দিতে হবে।

মৃদু শান্ত কণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বলে।

সাত

জবানবন্দি নেওয়া শুরু করলেন অতঃপর সুখময় মল্লিক।

বাড়ির লোকজনেরা তখনও ঘরের বাইরে বারান্দাতেই সবাই দাঁড়িয়েছিল পুলিস প্রহরায়।

ভৃত্য জীবন, রামখেলন, হরি ও নারাণ। রাঁধুনী বামুন ব্রিজনন্দন। দারোয়ান মিশির ও ধনবাহাদুর। ড্রাইভার, কেরামৎউল্লা—অফিসের ড্রাইভার সেও থাকত দুলালের গৃহে সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারে।

বাড়ির নীচের তলায় একেবারে পশ্চিম দিকে ভৃত্য ঠাকুর ও ড্রাইভারদের থাকবার

জন্য আলাদা ব্যবস্থা। তারা সব ঐখানেই থাকে।

জীবন ব্রজদুলালের খাস ভৃত্য। সে একমাত্র ব্রজদুলালের কাজকর্ম ছাড়া অন্য কিছুই করত না।

নতুন লোক বলতে ওদের মধ্যে কেউই নয়।

চার-পাঁচ বছর ধরে সকলেই ঐ বাড়িতে কাজ করছে।

ভৃত্যদের মধ্যে জীবন আর নারাণ ব্যতীত অন্য কেউ তো বড় একটা উপরেই যেত না। কাজেই ভৃত্যদের কারও কাছ থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদই পাওয়া গেল না।

সবাই রাত সাড়ে ন'টায় ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল একমাত্র ভৃত্য জীবন বাদে।

সে শুতে যায় রাত দশটা নাগাদ।

কিরীটী জীবনকেই একবার জিজ্ঞাসা করে, রেবেকা রাত্রে কখন ফিরেছে, সে জানে কিনা?

জীবন বলে, জানি না।

দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে কোলাপসিবল গেট দেখলাম জীবন. ওটা রাত্রে বন্ধ থাকে, না খোলা থাকে?

আমি শোবার আগে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ রোজ বন্ধ করে দিই। জীবন জবাব দেয়।

কাল রাত্রে বন্ধ করেছিলে?

হ্যাঁ। রাত দশটায়।

রেবেকা তাহলে তিনতলায় গেল কি করে?

আজ্ঞে উনি তো প্রায়ই রাত করে ফেরেন—ওঁর কাছে ঐ গেটের একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, রাত পৌনে বারোটা নাগাদ গতরাত্রে রেবেকাকে সে গেট খুলে দিয়েছে।

কিরীটী শুধোয়, আচ্ছা মিশির, কাল রাত্রে সাধনবাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া ও রেবেকার রাত্রে ফেরা ছাড়া আর কেউ রাত সাড়ে ন'টার পরও এ বাড়ি থেকে বের হয়েছে বা এসেছে কিনা মনে পড়ে?

জী, না।

বাবু যে ক'দিন বাড়িতে ছিল না তার মধ্যে অপরিচিত কেউ এ বাড়িতে এসেছে?

হ্যাঁ।

কে ?

একজন বুড়ো সাহেব।

একজন বুড়ো সাহেব ?

জী।

সে কেন এসেছিল ?

সে বলেছিল সে মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে নাকি মেমসাহেবের আত্মীয়।

দেখা করেছিল বুড়ো সাহেব রেবেকার সঙ্গে ?

তা জানি না, তবে ভিতরে গিয়েছিল।

কিরীটী তখন জীবনকে ডেকে সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করে। সাহেব সম্পর্কে সে কিছু জানে কিনা।

জীবন বলে, হ্যাঁ, সেই বুড়ো সাহেব মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিল। মেমসাহেব সে-সময় বাবুর চেম্বারে কি সব লেখাপড়া করছিল। সাহেবের কথা বলতে তিনি সাহেবকে ঐ ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলেন। আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সাহেব কতক্ষণ ছিল ?

তা প্রায় ঘণ্টাখানেক তো হবেই। জীবন বলে।

আর একটা কথা জীবন, সাধনবাবু কাল সে-সময় কি বাড়িতেই ছিলেন ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে না।

সাধনবাবু তাহলে কাল সারাদিন বাড়িতে ছিলেন না তুমি বলছ জীবন ?

আজ্ঞে।

সবার শেষে রেবেকাকে ঘরে ডাকা হল।

বছর চব্বিশ বয়স হবে রেবেকার।

নিঃসন্দেহে রেবেকাকে সুন্দরী বলা চলে। গায়ের রঙ চকচকে না হলেও বেশ ফর্সা। রোগা দোহারা দীর্ঘাঙ্গীই বলা চলে। মুখখানি লম্বাটে ধরনের হলেও চোখ নাক ও ভ্রূ দুটি সত্যিই সুন্দর। গতরাত্রের প্রসাধনের প্রলেপটা তখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

পরিধানে দামী একটা তাঁতের কালো সরুপাড় শাড়ি। হাতে চারগাছি করে সরু সোনার চুড়ি।

ভারতীয় খ্রীশ্চান না জানা থাকলে এবং হঠাৎ দেখলে অবস্থাপন্ন বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বলেই মনে হবে বুঝি রেবেকাকে।

আপনারই নাম মিস রেবেকা মণ্ডল ? এবার ও. সি. মিঃ মল্লিকই প্রশ্ন শুরু করেন।

হ্যাঁ।

এখানে আপনি ব্রজদুলালবাবুর সেক্রেটারী হয়ে ছিলেন ?

হ্যাঁ।

কতদিন এখানে আছেন ?

এক বছর পাঁচ মাস।

এক্সকিউজ মি, কত করে মাইনে পান আপনি ?

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটীই প্রশ্নটা করে রেবেকা মণ্ডলকে।

কিরীটীর প্রশ্নে রেবেকা মণ্ডল ওর মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকাল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, পাঁচশো টাকা।

পাঁচশো টাকা! কিরীটী কথাটা পুনরাবৃত্তি করে।

হ্যাঁ।

কিরীটী টাকার অঙ্কটা শুনে কয়েক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে বলে, তার মানে মাইনের ঐ পাঁচশো টাকা একরকম আপনার অল ফাউণ্ডই ছিল। কারণ, থাকা-খাওয়া যখন আপনার এইখানেই ছিল।

তা বলতে পারেন।

হুঁ। Decent pay! কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই কথাটা নিম্নকণ্ঠে উচ্চারণ করে কিরীটী আবার। ও. সি.র দিকে তাকিয়ে বলে, yes carry on—

আবার প্রশ্ন শুরু হয়।

মিস মণ্ডল, আপনার আপনজন কে আছে ?

আপনার বলতে আমার সংসারে এক মামা। তিনি আসানসোলে স্টেশনমাস্টার।

আর কোন আত্মীয়স্বজন—

না।

আচ্ছা, বাড়ি কোথায় আপনার ?

মুর্শিদাবাদ।

সেইখানেই কি বরাবর থাকতেন ?

ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম।

কিন্তু আপনি তো বললেন আপনার বলতে এক মামা ছাড়া আর কেউ নেই।

এক পিসী ছিল, বছর দেড়েক হল মারা গেছেন। তাঁর কাছেই থাকতাম মুর্শিদাবাদে।

কতদূর পড়াশুনা করেছেন ?

আই. এ. পাস করে স্টেনো টাইপিং শিখেছি।

এখানে চাকরি নিয়ে আসবার আগে কোথাও চাকরি করেছেন ?

হ্যাঁ, বছর দুই কলকাতাতে একটা বিলাতী ফার্মে স্টেনো-টাইপিস্ট ছিলাম। সেখান থেকেই সাহা স্টীল অ্যাণ্ড কোম্পানীতে চাকরি পাই। এক বছর অফিসে কাজ করবার পর মিঃ সাহা আমাকে পার্সোন্যাল সেক্রেটারী করে এখানে নিয়ে আসেন।

আপনার 'বস' কেমন লোক ছিলেন বলে আপনার ধারণা?

হি ওয়াজ এ পারফেক্ট জেণ্টলম্যান! ঠাণ্ডা মেজাজের এবং অত্যন্ত ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজের এমপ্লয়িদের উপরে তাঁর অত্যন্ত দরদ ছিল। তাই তো অবাক হয়ে গিয়েছি, কেন তিনি ঐভাবে আত্মহত্যা করলেন!

রেবেকা মণ্ডলের কথা শুনে মনে হল তার 'বস' ব্রজদুলাল সাহার আকস্মিক আত্মহত্যায় সে শুধু ব্যথিতই নয়, বিস্মিতও।

আট

কিছুক্ষণ অতঃপর সকলেই চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে।

সেই স্তব্ধতা আবার ভঙ্গ করল কিরীটীই। সে-ই প্রশ্ন করল।

আপনার ধারণা তাহলে মিস মণ্ডল, মিঃ সাহা আত্মহত্যাই করেছেন?

আত্মহত্যা যে করেছেন কথাটা বুঝতে কারোরই কষ্ট হবার তো কথা নয় মিঃ রায়।

কিন্তু কথা হচ্ছে তাই যদি হয়ে থাকে সত্যি তো নিশ্চয় ঐভাবে আত্মহত্যা করার কোন তাঁর কারণ ছিল বা ঘটেছিল!

হবে।

ব্যাপারটায় কোন রকম আলোকসম্পাত করতে পারেন আপনি?

না। আই অ্যাম র‍্যাদার বিউইলডার্ড।

আচ্ছা মিস মণ্ডল, আপনি যখন তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী ছিলেন নিশ্চয়ই তাঁর আপনি কনফিডেন্স-এ ছিলেন? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তা ছিলাম।

তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আপনি অনেক কিছু জানেন আশা করতে পারি? জিজ্ঞাসা করলেন এবার ও. সি.।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না, কারণ তিনি ও-ব্যাপারে অত্যন্ত রিজার্ভড ছিলেন। তবে তাঁর বিজনেস সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কথাই জানি।

বিজনেসের অবস্থা তাঁর কেমন ছিল?

দেখুন, ও ব্যাপারে জানেন—আমার ধারণা—মিঃ মিত্র, আমার চাইতেও বেশী।

ইউ মিন সাধনবাবু?

হ্যাঁ। তবে আমি যতদূর জানি তাঁর বিজনেসের অবস্থা ক্রমশঃ ভালর দিকেই

উত্তরোত্তর যাচ্ছিল।

আচ্ছা, এই সাধনবাবু লোকটিকে আপনার কেমন মনে হয় মিস মণ্ডল?

খুব ভদ্র, অমায়িক।

আপনার সঙ্গে আলাপ কেমন?

এক বাড়িতে থাকি, সর্বদা দেখাশোনা হয়, সেদিক দিয়ে আলাপ তো একটু বেশী হবারই কথা।

তা অবিশ্যি ঠিক। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম লোকটিকে কেমন মনে হয় আপনার? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

খুব ইনটেলিজেন্ট আর আ্যামবিশাস।

ইউ লাইক হিম?

কি বলতে চান আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় মিস রেবেকা মণ্ডল কিরীটীর মুখের দিকে। একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে বলেও সে মনে হয় কারণ ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রেবেকার।

না। এই বলছিলাম আর কি, ভদ্রলোকটিকে আপনার ভাল লাগে কিনা?

সত্যিকারের কোন ভদ্রলোককে না ভাল লাগবার তো কোন কারণ থাকতে পারে না।

তা অবিশ্যি ঠিক। আচ্ছা ভাল কথা মিস মণ্ডল, কাল দুপুরে কে একজন সাহেব আত্মীয় আপনার শুনলাম দেখা করতে এসেছিলেন? আপনার সেই মামা নাকি?

মামা? কই না!

তবে কে এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে কাল দুপুরে?

কাল দুপুরে?

হ্যাঁ।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিঃ আর্থার মুর, সিংগাপুর থেকে এসেছিলেন মিঃ সাহার সঙ্গে দেখা করতে, এজেন্সীর ব্যাপারে।

কিন্তু তিনি জীবনকে বলেছিলেন তিনি নাকি আপনার আত্মীয়!

ননসেন্স! একথা বলতেই পারে না। জীবন বলেছে ঐ কথা?

হ্যাঁ।

ওর কথায় কান দেবেন না আপনারা।

কেন বলুন তো?

লোকটা একের নম্বরের মিথ্যাবাদী! লায়ার!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ডাইনে-বাঁয়ে অকারণ মিথ্যে কথা বলে লোকটা।

তা কি করে জানলেন যে লোকটা মিথ্যাবাদী?

বহুবার বহু প্রমাণ পেয়েছি।

মিঃ সাহা জানতেন কথাটা?

জানতেন বৈকি। আর সেই জন্যই পুরনো বিশ্বাসী লোক হলেও ওকে তেমন পছন্দ করতেন না।

লোকটা তাহলে বিশ্বাসী?

অন্তত মিঃ সাহার তাই ধারণা ছিল।

আপনার?

বিশ্বাসী বলেই মনে হয়।

ঐ সময়কার মত জবানবন্দি শেষ করে থানার ও. সি. সুখময় মল্লিক উঠে দাঁড়ান।

কিরীটীও বিদায় নেয় অতঃপর।

নয়

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে পাটনা থেকে ফিরে এল সাধন মিত্র। এবং বাড়িতে পৌঁছে ব্রজদুলালের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তো একেবারে স্তম্ভিত।

কিরীটী সুখময় মল্লিককে পূর্বেই বলে রেখেছিল সাধন মিত্র ফিরলেই যেন তাকে একটা সংবাদ দেওয়া হয়।

যে পুলিস অফিসারটিকে কিরীটীর নির্দেশেই সুখময় মল্লিক গর্চা লেনের বাড়িতে প্রহরায় রেখে গিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে ফোনে সাধন মিত্রের পৌঁছনো সংবাদ পেয়েই সুখময় কিরীটীকে সংবাদটা দেন। এবং সাধন মিত্র গর্চা লেনের বাড়িতে এসে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কিরীটী সুখময়কে সঙ্গে নিয়ে গর্চা লেনের বাড়িতে এসে হাজির হল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতেই ভৃত্য জীবন এগিয়ে এল।

জীবন!

আজ্ঞে?

সাধনবাবু আছেন বাড়িতে? সুখময় মল্লিকই প্রশ্ন করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, উপরে আছেন তাঁর ঘরে।

তাঁকে একবার খবর দাও, বল আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

জীবন ওঁদের পারলারে বসিয়ে খবর দিতে গেল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাধন মিত্র এসে পারলারে প্রবেশ করল।

সাধন মিত্রের চেহারাটা সত্যিই দেখবার মত।

বেশ পরিষ্কার গায়ের রঙ। সুন্দরই বলা চলে। মুখে কয়েকটা বসন্তের ক্ষত চিহ্ন। চক্ষু দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। ছুরির ফলার মত যেন ধারাল চোখের দৃষ্টি।

সাধন মিত্রের দিকে তাকিয়ে সুখময় মল্লিকই প্রশ্ন করেন, সাধন মিত্র আপনার নাম?

হ্যাঁ।

বসুন।

কিরীটী একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সাধন মিত্রকে, মুখের মধ্যে কোথাও কোন সেরকম বেদনা বা দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই।

বেশভূষাও পরিপাটি। এবং পোশাক দেখে মনে হয় বোধ হয় কোথায়ও বেরুচ্ছিল। পরিধানে দামী লংস, ডবল কপের শার্ট, গলায় দামী একটি আমেরিকান টাই।

সুখময় মল্লিক বসবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাধন মিত্র কিন্তু বসে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই থাকে।

সুখময় মল্লিক আবার বলেন, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন সাধনবাবু?

হ্যাঁ। মৃদু শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় সাধন মিত্র।

এখানে এসেই খবরটা পেলেন বোধ হয়? সুখময় আবার জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ, terribly shocking! তাছাড়া রেবেকা বলছিল—

কি বলছিলেন মিস মণ্ডল? কিরীটীই এবার প্রশ্নটা করে।

বলছিল, আপনাদের ধারণা নাকি ব্যাপারটা হত্যা, homicide!

হ্যাঁ। জবাব দেন সুখময় মল্লিক।

কিন্তু—

হ্যাঁ, কারণ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যদিও এখনও আমরা পাইনি—সুখময়ই কথা বলেন, তবু ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয়—হত্যা, সেটাই আমাদের ধারণা।

সাধন মিত্র চোখ তুলে তাকাল সুখময়ের দিকে, হত্যাই তাহলে আপনাদের স্থির ধারণা?

হ্যাঁ।

কিন্তু হঠাৎ কে তাঁকে হত্যা করতে যাবে আর কেনই বা করবে, এটা তো আমি বুঝতে পারছি না মিঃ মল্লিক! সাধন মিত্র বলে।

Why and why অর্থাৎ কে করতে পারে আর কেন করল সেটুকু জানতে পারলে

আমাদের যাবতীয় মুশকিল আসানই হয়ে যেত সাধনবাবু। কিন্তু আপনার কি ধারণা, ।ারটা তা নয়? সুখময় মল্লিক শুধান।

To tell you frankly, আমার অন্ততঃ তা মনে হয় না। কারণ আপনারা জানেন কিন্তু আমি তাঁকে অনেকদিন ধরে জানতাম। তাঁর কোন শত্রু থাকতে পারে আমি াসই করতে পারি না। তাছাড়া—

বলুন, থামলেন কেন?

না। কিছু না। আই সিম্‌প্লি ডোণ্ট বিলিভ ইট, রাদার আই কাণ্ট্‌ বিলিভ ইট, মি বিশ্বাস করতে পারি না।

সহসা ঐ সময় কিরীটী শান্তকণ্ঠে সাধন মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে আপনার ধারণা মিঃ মিত্র, উনি আত্মহত্যাই করেছেন?

সত্যি কথা বলতে কি, সেরকম কিছুও আমি ভাবতে পারছি না। কেনই বা আত্মহত্য ়নি করতে যাবেন? সাধন মিত্র বলে।

কেন?

মিঃ সাহা সত্যিকারের বুদ্ধিমান, বিবেচক ও স্থিতধী লোক ছিলেন। আত্মহত্যা রবার মত টেমপারামেণ্ট কোনদিনই তাঁর ছিল না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া?

তা ছাড়া মান যশ অর্থ প্রতিপত্তি সবই তো বেশি পেয়েছিলেন এবং যতদূর জানি খুশিই ছিলেন। সেক্ষেত্রে হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করতে যাবেন?

আচ্ছা মিঃ মিত্র—কিরীটীই আবার কথা বলে।

বলুন?

অফিস-সংক্রান্ত কাজেই শুনলাম আপনি মিঃ সাহাকে নাকি মাদ্রাজ থেকে আকস্মিক ভাবে ট্রাঙ্ক কল করে ডেকে এনেছিলেন?

হ্যাঁ, এনেছিলাম। পাটনার ব্রাঞ্চ অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়েছিল বলে তাঁকে ডেকে আনতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তিনি পাটনা যাননি?

না। আমাকেই পাঠিয়েছিলেন।

আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনি তাঁর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট ছিলেন এবং আপনাকে তিনি যেমন স্নেহ করতেন তেমনি বিশ্বাসও করতেন শুনেছি।

ঠিক শুনেছেন।

তাঁর জীবনের অনেক কথাই আশা করতে পারি আপনি জানেন?

কি জানতেন চান বলুন স্পষ্ট করে, জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

মিঃ মিত্র ?

বলুন।

তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন কিন্তু একটা কথা বলেননি।

কি বলিনি ?

বলছিলাম তাঁর চরিত্র কেমন ছিল ? বহুদিন ধরে তিনি বিপত্নীক ছিলেন শুনেছি—

সেরকম একটু-আধটু দুর্বলতা মানুষ মাত্রেরই থাকে, বিশেষ করে ঐ রকম বয়সে উইডোয়ার হলে।

তাহলে খুলেই বলি মিঃ মিত্র—কিরীটী বলে, আমি জানতে চাইছিলাম তাঁর সঙ্গে রেবেকা মণ্ডলের সম্পর্কের কথাটা।

মুহূর্তকাল সাধন মিত্র চুপ করে থাকে, তারপর মৃদু একটু হাসি তার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দেয়।

কই, জবাব দিলেন না তো আমার প্রশ্নের ? কিরীটী আবার বলে।

বোধ হয় একটু দুর্বলতা ছিল ঐ দিকে তাঁর।

শুধু দুর্বলতাই ?

হ্যাঁ। আর কি বলব বলুন!

আর কিছু জানেন না আপনি ?

দেখুন, তাঁকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। এবং আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না, তাঁর স্নেহ ও সাহায্য না পেলে আজ আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না। আর বেশী কিছু তাঁর সম্পর্কে আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। আমাকে ক্ষমা করবেন।

দশ

অতঃপর উভয় পক্ষই কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না।

সুখময় মল্লিক বোধ হয় ভাবছিলেন, আর কি প্রশ্ন তাঁদের থাকতে পারে সাধন মিত্রকে!

কিরীটীর মুখের দিকে তাকান সুখময় মল্লিক।

কিরীটী একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করছিল একটা জলন্ত কাঠি দিয়ে, সিগারটা ধরে উঠলে কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলে দিয়ে তাকাল আবার সাধন মিত্রের মুখের দিকে।

আচ্ছা মিঃ মিত্র, মিঃ সাহার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে জানেন কিছু ?

তাঁর বড় ভাইয়ের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে জানি।

দুই ছেলে, এক মেয়ে ?

হ্যাঁ। এবং তাঁদের সম্পর্কে যতটুকু জানি—একজন প্রশান্ত সাহা, বেশীদূর লেখা-

পড়া শেখেননি, এই কলকাতা শহরেই অ্যালান ইলেকট্রিক্যালস কোম্পানিতে চাকরী করেন। বিয়ে-থা শুনেছি করেননি। দ্বিতীয় সুশান্ত সাহা আই. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, শেয়ার মার্কেটের দালাল, ভালই বোধ হয় উপায় করেন। তবে নেশা ও রেসের মাঠে শুনেছি পকেট সর্বদাই খালি থাকে। ভাইঝি শ্রীমতী দেবী, হাসপাতালের নার্স। বিয়ে-থা করেননি।

তাঁরা এ বাড়িতে যাতায়াত করেন না?

শ্রীমতী দেবী দু-একবার মনে পড়ে এসেছেন। তবে ভাইপোদের কখনও তিনি বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না। তবু অবিশ্যি মধ্যে মধ্যে সুশান্ত ঝড়ের মত তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হতেন।

কেন?

টাকার জন্য।

টাকা দিতেন মিঃ সাহা ভাইপোকে?

দিতেন। ভীষণ চটে রাগারাগি করতেন, কিন্তু দিতেন। কারণ আমার মনে হয়েছে বরাবর, ঐ জুয়াড়ী নেশাখোর উচ্ছৃঙ্খল লোকটাকে মুখে রাগারাগি করলেও উনি ভালই বোধ হয় সত্যি বাসতেন তাঁকে ভাইপো-ভাইঝিদের মধ্যে।

আচ্ছা, প্রশান্তবাবু আসতেন না কখনও তাঁর কাকার কাছে?

না। আসতে তাঁকে কখনও দেখিনি।

আচ্ছা সাধনবাবু, কোন উইল মিঃ সাহা করে গিয়েছেন বলে জানেন?

করেছেন বলেই জানি।

নিশ্চয় করে জানেন না কিছু?

না। তবে আপনি সাহা কোম্পানীর সলিসিটার রূপচাঁদ চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। তিনি সব জানেন।

সাধন মিত্রের কথাটা শেষ হল না, ঘরের মধ্যে স্যুট-পরিহিত সাতাশ-আটাশ বৎসরের একটি সুশ্রী যুবক এসে ঢুকল।

আগন্তুক কারোর দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজাসুজি সাধনের দিকেই তাকিয়ে বলে, এই যে সাধন মিত্তির, হোয়াট অল দিস? কাকা নাকি সুইসাইড করেছে?

সাধন মিত্র কোন জবাব দেয় না। তার আগেই সুখময় মল্লিক আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সুখময়ের প্রশ্নে আগন্তুক ফিরে তাকাল সুখময়ের দিকে, কে আমি? ইয়েস পুলিস অফিসার, অফ কোর্স ইউ ক্যান আস্ক দ্যাট। আমার নাম সুশান্ত সাহা।

আপনি কার কাছে শুনলেন সুশান্তবাবু যে আপনার কাকা সুইসাইড করেছেন?

কার কাছে আবার—আজ অফিসে গিয়েই তো শুনলাম।

আজ কখন অফিসে গিয়েছিলেন আপনি? কিরীটী এবারে প্রশ্নটা করল।

কেন, দুপুরবেলা।

আপনার দাদা কোন সংবাদ পাননি?

গড নোস্!

আপনি দেননি?

নো স্যার।

কেন?

কেন আবার কি? ইট ইজ দেয়ার হেডেক, নট মাইন। কথাটা বলে সুশান্ত সাহা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিরীটীর ইঙ্গিতে সুখময় তাকে ডাকল, সুশান্তবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?

উপরে।

কিরীটী বলে, এখন যাবেন না।

যাব না?

বাট হোয়াই? কেন যাব না বলুন তো? তাছাড়া who are you?

আমি থানার ও. সি.—সুখময় বলেন।

O. C.—I see! তা আমি উপরে যাব না কেন—শুনতে পারি কি?

জীবিত থাকতে তিনি আপনার এবাড়িতে আসা যখন পছন্দ করতেন না তখন তাঁর উইল না জানা পর্যন্ত আপনাকে তো আমরা এ বাড়ির উপরে যেতে দিতে পারি না!

পারেন না? বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল সুশান্ত সুখময়ের দিকে।

না।

ননসেন্স! আমার নিজের কাকার বাড়ি এটা—আর আমরাই তাঁর সব।

তা আমরাও জানি সুশান্তবাবু—তবু সেটা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। কিরীটী শান্তকণ্ঠে বলে।

মানে! কি আবার প্রমাণসাপেক্ষ—আমরা তাঁর ভাইপো কিনা?

না। তাঁর মৃত্যুর পর আপনাদের এ বাড়িতে প্রবেশের কোন সত্যিকারের আইনত অধিকার আছে কিনা সেইটাই প্রমাণসাপেক্ষ।

প্রমাণসাপেক্ষ! তা আমাদের নেই তো কার আছে শুনি? আইনত তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী আমরা ছাড়া আর কারা?

কথাটা আপনার যেমন মিথ্যা নয় সুশান্তবাবু তেমনি এও মিথ্যা নয় যে জীবিত থাকাকালীন কোনদিন আপনাদের এখানে তিনি প্রবেশ করতে দেননি।

কে বললে ?

যেই বলুক কথাটা যে সত্যি, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ?

নিশ্চয়ই করি। নিশ্চয়ই ঐসব আজগুবী কথা সাধন মিস্ত্রির বলেছে আপনাদের।

কে! দেখে নেব সাধন মিস্ত্রির, আমিও সুশান্ত সাহা—

কথাটা বলে সাধনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বোধ হয় ঘর থেকে পুনরায় বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায় দরজার দিকে সুশান্ত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী আবার বাধা দেয়, যাবেন না সুশান্তবাবু, আপনার সঙ্গে আরও কিছু আমাদের কথা আছে।

ঘুরে দাঁড়াল সুশান্ত সাহা দরজার মাঝবরাবর গিয়ে এবং ভ্রূ-দুটো কুঁচকে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলে, কথা আছে—আমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার আপনার সঙ্গে কোন কথা নেই। বলে আবার পা বাড়াবার চেষ্টা করে সুশান্ত।

বাধা দিলেন এবারে সুখময় মল্লিক, আপনার না থাকলেও আমাদের আছে। দাঁড়ান।

আমি যদি না শুনি আপনাদের কথা, আমাকে জোর করে শোনাবেন নাকি ?

শান্ত কণ্ঠে এবার কিরীটীই বলে, প্রয়োজন হলে শোনাতে হবে বৈকি। শুধু আপনি কেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতজনদের মধ্যে প্রত্যেকেই যাঁরা তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে ইণ্টারেস্টেড তাঁদের প্রত্যেককেই আমাদের প্রয়োজন। কারণ—

কারণ ?

কারণ—ব্রজদুলালবাবু আত্মহত্যা করেন নি, তিনি নিহত হয়েছেন।

কি—কি বললেন ?

বললাম কেউ তাঁকে হত্যা করেছে এবং তাদেরই কারও পক্ষে সেটা সম্ভব বেশী যারা তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে ইণ্টারেস্টেড ছিল।

সুশান্ত অতঃপর কিছুক্ষণ যেন কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, আই সি! তাহলে আপনার ধারণা আমাদের মধ্যেই কেউ-না-কেউ তাঁকে হত্যা করেছি তাঁর সম্পত্তির লোভেই ?

আপাততঃ সেটাই কি স্বাভাবিক ভাবে মনে হয় না সুশান্তবাবু ?

চমৎকার। তাহলে এই ধরে নেব যে আপনারা আমাকে কাকার সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসাবে অ্যারেস্ট করবেন ?

না, অ্যারেস্ট করছি না।

তবে ?

যতক্ষণ না আপনাদের প্রত্যেকের উপর থেকে পুলিসের সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়, আপনারা প্রত্যেকেই সন্দেহের তালিকার মধ্যে থাকবেন। বললে আবার কিরীটী।

হুঁ। তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে সেটা জানতে পারি কি ?

হ্যাঁ, যতক্ষণ না এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় আপনি এ বাড়িতে যেমন ঢুকতে পারবেন না তেমনি আপনার বর্তমান কলকাতার রেসিডেন্স থেকে কোথাও যেতে পারবেন না পুলিসের পারমিশন ব্যতীত।

বেশ তাই হবে।

আপনি এবারে যেতে পারেন।

সুশান্ত সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এগার

পরের দিন ময়না তদন্তের রিপোর্ট ও কাচের গ্লাস ও সঙ্গের বোতলের কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

গ্লাসে বা বোতলের মধ্যে কোন রকম বিষ যেমন পাওয়া যায় নি তেমনি মৃতদেহেও কোন রকম বিষের সন্ধান মেলেনি। ময়না তদন্তকারী ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন, মৃত্যুর কারণ হাই ভোল্টের ইলেকট্রিক কারেন্ট্।

তালুকদারই রিপোর্টটা নিয়ে এসেছিল কিরীটীর এখানে।

তিনি বলেন, ব্যাপারটা কেমন হল কিরীটী, এ যে কেমন গোলমেলে হয়ে গেল!

রিপোর্টগুলো দেখবার পরই কিরীটী যেন কেমন আত্মচিন্তায় সমাহিত হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। হাতের ধরা পাইপটা নিভে গিয়েছিল।

সেটায় পুনরায় অগ্নি সংযোগ করে কিরীটী বলে, যদিও হত্যাকারী নিঃসন্দেহে খুব চতুর এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে হত্যার ব্যাপারে তবু বলব সেদিনকার একটা ব্যাপার তাকে —যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন তালুকদার, সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল একটা ব্যাপার ?

হ্যাঁ।

কি বল তো ?

কারোরই তো ব্যাপারটা অজানা থাকবার কথা নয় তালুকদার, কারণ ঐদিন সকালেই কাগজে ঘোষণা করা হয়েছিল কলকাতা শহরে কোন কোন এলাকায় সেদিন রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল তো ?

এখনও ঠিক বলতে পারছি না তালুকদার, কারণ একটা জায়গায় এসে আমার চিন্তার

াগসূত্রটা ছিঁড়ে যাচ্ছে—

আচ্ছা কিরীটী, তালুকদার প্রশ্ন করেন, এখনও কি তোমার ধারণা ব্যাপারটা হত্যাই ?

নিঃসন্দেহে। আত্মহত্যা। আদৌ নয়। হতভাগ্য ব্রজদুলাল সাহার দেহে তাঁর জ্ঞাতেই হাই ভোল্টেজের ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করিয়ে তাঁকে মুহূর্তে হত্যা করা হয়েছে।

বল কি !

ঠিক তাই।

কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব হল ?

কেমন করে যে সম্ভব হল সেটাই ভাবছি এখনও। তবে সম্ভব হয়েছিল, নিশ্চয়ই, াচেৎ ঐ ভাবে তাঁকে অতর্কিতে মৃত্যুবরণ করতে হত না।

তারপরই একটু থেমে হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় কিরীটী বলে, ভাল কথা তালুকদার, সাহার সেই শয়নকক্ষটা লক-আপ করে রাখা হয়েছে না ?

হ্যাঁ। কেন তুমিই তো সুখময়বাবুকে ঘরটাতে তালাবন্ধ করে রাখতে বলে দিয়েছিলে !

একটু বস তালুকদার, আমি চট করে একটা টেলিফোন করে আসি।

কাকে ফোন করবে ?

সুখময়বাবুকে।

কিরীটী ঘর থেকে উঠে গেল।

তালুকদার অতঃপর সোফাটায় বসে একটা পিকটোরিয়াল সাপ্তাহিক ইংরাজী ম্যাগাজিনের পাতাগুলো উল্টে উল্টে ছবি দেখতে থাকেন।

পুলিসের বড়কর্তা ঐদিন সকালেই তালুকদারকে ডেকে ব্রজদুলাল সাহার হত্যার রহস্যজনক ব্যাপারটার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। সেই সূত্রেই ঐদিন সন্ধ্যায় কিরীটীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন তালুকদার।

কারণ থানা-অফিসার সুখময় মল্লিকের কাছে গিয়ে শুনেছিলেন কি ভাবে ঘটনাচক্রে কিরীটী ব্রজদুলালের হত্যার পরের দিন গিয়ে অকুস্থানে হাজির হয়েছিল।

কিন্তু কিরীটীর ওখানে এসে, তার মতামত শুনে ব্রজদুলালের হত্যার রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে যে খুব বেশী আশান্বিত হয়েছেন তা নয়।

অথচ এও সে ভালভাবেই জানে যে, কিরীটী ঐ হত্যারহস্যের মীমাংসায় পৌঁছবার একটা-না-একটা পথ খুঁজে পেয়েছে যদিও—তথাপি সে নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যতক্ষণ মুখ না খুলবে ততক্ষণ যতটুকু সে বলেছে তার বেশী জানবার আর কোন উপায়ই নেই।

একটু পরেই কিরীটী ফিরে এল একেবারে বাইরে বেরুবার বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে।

রাত তখন বোধ হয় পৌনে আটটা।

গ্রীষ্মের রাত। পৌনে আটটা বিশেষ করে কলকাতা শহরে তো এমন কিছুই নয়। একেবারে সন্ধ্যারাত্রি বললেও বেশী বলা হয় না।

কিরীটীর পরিবর্তিত বেশের দিকে তাকিয়ে তালুকদার প্রশ্ন করেন, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি এখন?

হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসা যাক। তোমার হাতে যদি তেমন জরুরী বা প্রয়োজনীয় কোন কাজ না থাকে তো আমার সঙ্গে যেতে পার।

কিরীটী টোবাকো পাউচ ও লাইটারটা হাতে তুলে নিতে নিতে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে কথাগুলো।

তালুকদার ম্যাগাজিনটা টেবিলের উপর রেখে দাঁড়িয়ে বলেন, না, অন্য কোন কাজ তেমন নেই, তোমার এখানেই তো এসেছিলাম। চল।

রাস্তায় বের হয়ে দুজনে একটা ট্যাক্সি নেয়।

ট্যাক্সিওয়ালা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ দিকে যাব বাবুজী?

গর্চা লেন চল। কিরীটী বলে।

পার্শ্বে উপবিষ্ট তালুকদার গর্চা লেন কথাটা কানে যেতেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকান।

গাড়ি তখন গর্চা লেনের দিকেই ছুটে চলেছে।

কিন্তু গাড়ি কিছুদূর এগুবার পরই কিরীটী ড্রাইভারকে সোজা এগিয়ে যেতে বলল একটা রেস্তোরাঁর দিকে চায়ের পিপাসা পেয়েছে বলে।

বারো

'পান্থশালা'।

ঐ পাড়ারই একটা আধুনিক রেস্তোরাঁ।

রেস্তোরাঁটি খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু বেশী দিনের না হলেও মালিক প্রচুর অর্থ-ব্যয় করে আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও আরামের ব্যবস্থায় রেস্তোরাঁটি সত্যিকারের যাকে বলে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

সামান্য কয়েক মাসেই 'পান্থশালা' রেস্তোরাঁ-প্রিয় লোকদের কাছে ঐ অঞ্চলের আকর্ষণের অন্যতম বিলাস ও আরামকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রেস্তোরাঁটির মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিশেষ ছিল। তরুণ ও তরুণী খরিদ্দারদের জন্য ছোট ছোট নির্জন কিউবিক্যালস। কাজেই অল্পবয়সের কলেজের ছাত্রছাত্রী ও তরুণ-তরুণী খরিদ্দারদের ভিড়ই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী 'পান্থশালা'য়।

কিরীটী ও তালুকদার যখন 'পান্থশালা'য় এসে ঢুকলো রাত তখন সোয়া আটটা। বিরাট হলঘরের এক কোণে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে দু'কাপ কফির অর্ডার দিল

কিরীটী দুজনের জন্য।

কিরীটী লক্ষ্য করেনি।

তার ঠিক হাত দশেক দূরেই দেওয়াল ঘেঁষে আলো-আঁধারির মধ্যে অন্য একটা টেবিলে মুখোমুখি বসেছিল দু'কাপ চকোলেট ড্রিংক ও কিছু স্যাণ্ডউইচ নিয়ে দুটি যুবক-যুবতী।

মিস রেবেকা মণ্ডল ও সাধন মিত্র।

তাদের পরস্পরের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা চলছিল।

রেবেকা বলছিল, কিন্তু ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায়টা কি বল সাধন—যার চাকরি করছিলাম, যে দয়া করে তার গৃহে স্থান দিয়েছিল সে-ই যখন চলে গেল তখন আর দাবী কোথায় আমার ওখানে থাকবার আর থাকতেই বা দেবে কে আমাকে ?

মৃদুকণ্ঠে সাধন বলে, নতুন করে দাবীরও তো সৃষ্টি হতে পারে আবার!

নতুন দাবী ? মন্দ বলনি কথাটা সাধন। প্রশান্ত, সুশান্ত ও শ্রীমতী সাহাও এসে ঐ বাড়ীতে আর যার যে ব্যবস্থাই করুক আমার ব্যবস্থাটা যে বাড়ির বাইরে হবে, সে কি আর আমি জানি না!

কিন্তু তারাই যে বাড়ির একমাত্র মালিক হচ্ছে তা তুমি জানলে কি করে ? ব্যাপারটা তো এখনও পর্যন্ত কেউই জানে না।

ওর আবার জানাজানির কি আছে সাধন! মিঃ সাহা নিজে বিপত্নীক ছিলেন, কোন সন্তানাদিও তাঁর নেই—সেক্ষেত্রে ওরা ছাড়া আর তাঁর টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি পাবে কে!

তুমি তো জান, তাদের প্রতি মিঃ সাহা কোনদিন এতটুকু সন্তুষ্টও ছিলেন না।

সে তুমি যাই বল সাধন, হাজার হোক নিজের ভাইপো-ভাইঝি তো—তাদের বঞ্চিত করে অপর কাউকে কিছু তিনি দিয়ে যাবেন, এটা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া আরও একটা কথা, নতুন ম্যানেজমেন্টে যদি আমার চাকরিই না থাকে তখন তো আমাকে চলে যেতেই হবে ঐ বাড়ি থেকে। সেক্ষেত্রে মানে মানে সময় থাকতে আগে-ভাগেই সরে পড়াই কি ভাল নয় ?

তুমি দেখছি বড় অল্পেতেই হতাশ হয়ে পড় রেবেকা—সাধন বলে।

মানে ?

তা নয় তো কি। সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও পর্যন্ত অন্ধকারে রয়েছে।

অন্ধকারে কেন হবে ? আমার মনে হয় সুশান্তবাবু উইলের সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন।

চমকে ওঠে যেন সাধন মিত্র। বলে, কে বললে ?

কেন, জান না ? আজ দুপুরে যে ঐ বাড়িতে এসে জীবনকে হম্বিতম্বি করছিল

সুশান্তবাবু।

হম্বিতম্বি করছিল?

হ্যাঁ। বলছিল পুরনো আগাছা নাকি সব কেটে সাফ করে দেবে বাড়ি থেকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তের

'পান্থশালা' থেকে যখন বের হয়ে এল কিরীটী ও তালুকদার রাত তখন পৌনে নটা।

আগের ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছিল ওরা।

নতুন একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা যখন গর্চা লেনে ব্রজদুলাল-ভবনে এসে পৌঁছল তখন নটা বেজে মাত্র সাত মিনিট।

ট্যাক্সির ভাড়া রাস্তা থেকেই মিটিয়ে দিয়ে কিরীটী আর তালুকদার গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। এবং কয়েক পা এগুতেই ওদের নজরে পড়ল, পারলারের কাচের জানলা-পথে আলো দেখা যাচ্ছে।

পারলারের দরজার দিকে এগুতেই ওদের কানে এল একটা রুক্ষ পুরুষের কণ্ঠস্বর: সেটাই তো আমি জানতে চাইছি মিঃ মল্লিক। কেন এখানে এ-সময় আমাকে ডেকে নিয়ে আসা হল? যে বাড়িতে ঘৃণায় আজ পর্যন্ত কখনও আমি পা ফেলিনি সেখানে কেন আমাকে ডেকে আনা হল?

সুখময় মল্লিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কিন্তু আজ যখন আপনাদের কাকা ব্রজবাবুর মৃত্যুতে আপনারাই এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন তখন আজ হোক কাল বা পরশুই হোক একদিন এখানে আসতেই হবে আপনাকেও।

কে বললে আপনাকে সে কথা? যার খুশি সে আসুক, জানবেন, প্রশান্ত সাহা এখানে জীবনেও পা দেবে না।

কিন্তু কেন বলুন তো প্রশান্তবাবু? এত রাগ কেন আপনার ব্রজবাবুর উপরে?

রাগ? একটা লম্পট, আউট অ্যাণ্ড আউট স্কাউণ্ড্রেল একটা।

লম্পট!

নয়? কারও জানতে আজও বাকি আছে, ঐ তাঁর সেক্রেটারী না কি সেই খ্রীশ্চান মেয়েটা রেবেকার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা?

সে কথাটা আপনি বিশ্বাস করেন প্রশান্তবাবু?

পৃথিবীসুদ্ধ লোক করে, আর আমিই বা করব না কেন?

কিন্তু এও শুনেছি অনেক লোকই নাকি বলে কথাটা মিথ্যে।

মিথ্যে ?

হ্যাঁ।

তারা জানে না।

আপনিই বা স্থির নিশ্চিত হলেন কি করে ? এ-বাড়িতে তো কখনও আসেন নি ?

না, আসিনি—

তবে ?

তবে আবার কি! ঐসব নোংরামি কখনও কেউ চাপা দিয়ে রাখতে পারে, না পেরেছে ?

বুঝলাম। কিন্তু যা আপনি নিজে চোখে কখনও দেখেন নি, কেবলমাত্র লোকের থা শুনে—

লোকেরাই বা তাঁর সম্পর্কে মিথ্যে রটনা করবে কেন বলতে পারেন মিঃ মল্লিক ? াদের কি স্বার্থ ?

স্বার্থ হচ্ছে ঈর্ষা। শান্তকণ্ঠে সুখময় জবাব দেন, হ্যাঁ, একটা কথা জানবেন, কেউ খনও আশাতিরিক্ত উন্নতি করলে তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু ও পরিচিত জনেরাই তার াড়ালে নিন্দে করে, কলঙ্ক রটায়, এবং সেটা করে নিছক ঈর্ষায়। এবং এ যে কত ড গোপন ও কুৎসিত ব্যাধি আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মনে সেটা যেন আমরা জেনেও ানতে চাই না।

না না,—সে আপনি যাই বলুন মিঃ মল্লিক, তার মুখ-চোখই আমাকে বলে দিত, কি টাইপের লোক সে। যাক গে মশায়, ও নিয়ে তর্ক আমি করতে চাই না। আমাকে যেতে দিন।

কিরীটী এতক্ষণ দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল, এবারে তালুকদারকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। এবং কতকটা যেন অকস্মাৎই গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ওদের পদশব্দে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সুখময় মল্লিক ও প্রশান্ত সাহা দুজনেই যুগপৎ ওদের দিকে ফিরে তাকায়।

এই যে মিঃ রায় এসে গিয়েছেন, প্রশান্তবাবু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাইছেন না। সুখময় মল্লিক কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই কথাটা উচ্চারণ করেন।

ওঁরই নাম প্রশান্ত সাহা ? কিরীটী সুখময় মল্লিকের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ, উনিই। আপনার ফোন পেয়ে তখুনিই ওঁকে আমি ফোন করি এখানে চলে আসবার জন্য। এসে দেখি আমার আগেই উনি এখানে এসে পৌঁছে গিয়েছেন।

কিরীটী প্রশান্ত সাহার দিকে চেয়ে ছিল।

সুশান্ত সাহাকে তার সুপুরুষ মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রশান্ত সাহা ততোধিক সুন্দর। যেমন লম্বাচওড়া চেহারা তেমনি উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ।

পরিধানে একটা রেয়ন সিল্কের সাদা লংস ও টেরিলিনের ঈষৎ নীলাভ রংয়ের বুস শার্ট এবং চোখে সোনার ফ্রেমের ফ্যান্সি চশমা। দাড়িগোঁফ নিখুঁত কামানো।

শুধু সুন্দর চেহারাই নয়, বেশভূষাও যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনই নিখুঁত রুচির পরিচায়ক।

চোদ্দ

আপনিই প্রশান্ত সাহা? কিরীটী প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনলাম না?

জবাব দিল এবারে তালুকদার পাশ থেকে, ওঁকে না চিনলেও নাম নিশ্চয়ই ওঁর শুনেছেন, উনি সত্যসন্ধানী শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়।

কিরীটী রায়! কথাটা যেন কিছুটা আত্মগত ভাবেই উচ্চারণ করে প্রশান্ত।

প্রশান্তবাবু, আপনি তো ম্যালেন ইলেকট্রিক্যালস কোম্পানীতে চাকরি করেন, তাই না? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

সেখানে কি কাজ করেন?

সেখানে আমি ওদের ওয়ার্কশপে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক।

কিছু মনে করবেন না, কত মাইনে পান?

তিনশো টাকা।

বিয়ে করেননি তো এখনও?

না।

কেন বলুন তো এখনও বিয়ে করেননি?

কেন আবার কি, তিনশো টাকা আবার একটা টাকা নাকি! একজন ভদ্র মানুষেরই ভদ্রভাবে জীবন ৩২ টাকাতে কাটে না তায় আবার পরিবার! ক্ষমা করবেন মশাই, এতবড় নিরেট গর্দভ আমি নই।

তা তো সত্যিই, আজকালকার দিনে তিনশো টাকা আবার কি! কিন্তু এবারে বোধ হয় বিয়ে করবেন—কি বলেন, কাকার সম্পত্তি যখন পাচ্ছেন?

কি বললেন? কাকার সম্পত্তি? তাহলেই হয়েছে! ব্রজদুলাল সাহাটি যে কী একখানা চিজ ছিল আপনারা তো আর জানতেন না। মশাই, ও আশা আমি করি না। যাক গে, লোকটার নামও আমার সহ্য হয় না। জীবনে এ বাড়িতে কখনও এর আগে আমি পা দিইনি। দিতামও না, আজ যদি আপনারা আমাকে এখানে ডেকে আনতেন। কেন ডেকেছেন এবারে বলুন?

কেন ডেকেছি? তার কারণ আছে—

কি কারণ ?

এক্ষুনি জানতে পারবেন, একটু অপেক্ষা করুন।

না মশাই, ক্ষমা করুন আমাকে। আমার কাজ আছে, এখুনি আমাকে যেতে হবে।

প্রশান্ত সাহার কথাটা শেষ হল না, দরজার বাইরে ভারী গলায় শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি মিঃ মল্লিক ?

কে ? সুখময় মল্লিক শুধান।

আমি রূপচাঁদ চ্যাটার্জী।

আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন।

ব্রজদুলাল সাহার সলিসিটার মিঃ রূপচাঁদ চ্যাটার্জী এসে ঘরে ঢুকলেন।

ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, অন্ততঃ পঞ্চাশের নীচে নয়। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা।

পরিধানে দামী সুট। হাতে একটা চামড়ার ফোলিও।

রূপচাঁদ চ্যাটার্জী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পরপর সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষে তাকালেন প্রশান্ত সাহার মুখের দিকে, প্রশান্তবাবু, আপনিও আছেন দেখছি! কিন্তু মিঃ মল্লিক কে ?

সুখময় মল্লিক তখন বললেন, আমারই নাম সুখময় মল্লিক। উনি ডি. সি. মিঃ তালুকদার আর উনি—

ওঁর আর পরিচয় দিতে হবে না মিঃ মল্লিক, কিরীটী রায়কে আমি চিনি। যদিচ আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আজও হয়নি।

একটু থেমে রূপচাঁদ চ্যাটার্জী আবার বলেন, আপনি যখন আমার অফিসে ফোন করেন তখন আমি অফিসে ছিলাম না। বাইরে বারলো সাহেবের চেম্বারে একটা কনসালটেশনে গিয়েছিলাম। ফিরে আসতেই আমার জুনিয়ার বললে, আমাকে নাকি আপনি চেম্বারে ফোন করে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে চলে আসতে বলেছেন। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো ?

পনের

কথা বলে এবারে কিরীটী, আমিই সুখময়বাবুকে বলেছিলাম ফোনে আপনাকে আজ একবার এখানে আসবার জন্য খবর দিতে মিঃ চ্যাটার্জী। ব্রজদুলাল সাহা, আপনার ক্লায়েন্টের উইল সম্পর্কে কয়েকটা ইনফরমেশান আমার দরকার।

উইল সম্পর্কে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কিরীটীবাবু, আমার ক্লায়েন্ট তো কোন উইল শেষ পর্যন্ত করে যেতে পারেন নি ?

কেন, প্রশান্তবাবু তো জানেন সেকথা। ওঁকে তো আজই বলেছি।

রূপচাঁদ চ্যাটার্জী কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী প্রশান্ত সাহার দিকে তাকাল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য।

পরক্ষণেই তাকাল আবার রূপচাঁদ চ্যাটার্জীর দিকে, আপনার ক্লায়েন্টের কোন উইল নেই ?

না। মাদ্রাজ যাবার আগে সর্বপ্রথম তিনি উইলের কথা আমাকে জানান।

তার আগে কখনও উইলের প্রশ্ন ওঠেনি ?

না। সেই প্রথম উইলের কথা আমাকে বলেন এবং কি ভাবে উইল হবে মুখে সেটা বলে আমাকে একটা ড্রাফট্ তৈরী করে রাখতে বলেন, মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে সেটা পাকাপাকি করবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো সব ভেস্তে গেল। মাদ্রাজ থেকে যে দিন ফিরলেন সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করলেন।

আত্মহত্যা তো তিনি করেননি মিঃ চ্যাটার্জী! গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী এবার বলে।

সে কি, আত্মহত্যা করেননি ?

না। স্থিরকণ্ঠে কিরীটী পুনরায় প্রতিবাদ জানাল।

কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম—

ভুল শুনেছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কিরীটী আবার বলে।

হত্যা করা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

বাট হাউ !

হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক কারেণ্ট তাঁর দেহে পাস করিয়ে তাঁকে সে রাত্রে হত্যা করা হয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী।

এতক্ষণে প্রশান্ত সাহা কথা বললে, সত্যি বলছেন কিরীটীবাবু, কাকাকে হত্যা করা হয়েছে ?

হ্যাঁ প্রশান্তবাবু। তাঁকে সত্যিই হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু কে—কেতাঁকে হত্যা করবে ?

যার স্বার্থ ছিল সে-ই। যাক সেকথা প্রশান্তবাবু, আপনাকে আমার সেজন্য প্রয়োজন এবং যেজন্য ডেকেছিলাম—অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একবার ওপরে যাবেন কি ?

ওপরে ? কেন বলুন তো ?

এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেব।

এক্সপার্ট ওপিনিয়ন কি ব্যাপারে ?

আপনি তো একজন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক, ইলেকট্রিকের ব্যাপারেই আপনার

ওপিনিয়ন আমার চাই। চলুন।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে, এমন সময় সাধন আর রেবেকাকে সেখানে প্রবেশ করতে দেখা গেল।

রেবেকা আর সাধন মিত্র যেন হঠাৎ ওই সময় ওদের ওখানে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

কিরীটী কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে, যাক, আপনারা দুজনও এসে গিয়েছেন ভালই হল। বাকী রইলেন শুধু সুশান্তবাবু।

এরপর কিরীটী সুখময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ মল্লিক!

বলুন?

আপনি সুশান্তবাবুকে আসবার জন্য খবর পাঠাননি?

হ্যাঁ, লোক পাঠিয়েছি তো। যাকে পাঠিয়েছি তাকে বলেও দিয়েছি সুশান্তবাবুকে তাঁর ফ্ল্যাটে না পাওয়া গেলে, হংকং হোটেলে পাওয়া যাবে। প্রয়োজন হলে সেখানেও যেতে।

তবে তিনিও হয়তো এসে পড়বেন। চলুন ওপরে যাওয়া যাক। চলুন প্রশান্তবাবু, সাধনবাবু! মিস মণ্ডল, আপনিও।

সকলে এসে উপরে ব্রজদুলাল সাহার ঘরের তালা খুলে প্রবেশ করল।

ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্রজদুলালের হত্যার পরদিন সকালে যেমন ছিল যেখানে যেটি, সাতদিন পরে ঠিক তেমনিই আজও সব আছে।

কিরীটী একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল।

তারপর সুখময়ের দিকে চেয়ে বললে, মিঃ মল্লিক, ভৃত্য জীবন আর দারোয়ান মিশিরকে একবার এ ঘরে ডেকে আনুন।

সুখময় মল্লিক ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী ঘরের দক্ষিণ দিককার জানলাটা খুলে দিয়ে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে বাকী সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন থমথম করতে থাকে।

মিনিট কয়েক বাদেই সুখময় মল্লিক ভৃত্য জীবন ও দারোয়ান মিশিরকে নিয়ে ফিরে এলেন।

ভৃত্য জীবনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই কিরীটী ঘুরে দাঁড়াল, জীবন!

আজ্ঞে?

প্রশান্তকে দেখিয়ে বলে, এই বাবুকে চেনো ?

কেন চিনব না আজ্ঞে, উনি তো বাবুর বড় ভাইপো ?

এ বাড়িতে উনি এর আগে কখনও এসেছেন ?

আজ্ঞে না।

এবারে দারোয়ান মিশিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিরীটী, মিশিরজী !

জী ?

ওই বাবুকো তুম্ পয়ছান্তে ?

জী নেহি।

কভি দেখা নেই ?

নেহি জী।

বাইরে ওই সময় জুতোর শব্দ শোনা গেল।

মিঃ মল্লিক, দেখুন তো আপনার সুশান্তবাবু বোধ হয় এলেন। কিরীটী সুখময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

সুখময় মল্লিককে আর এগিয়ে দেখতে হল না।

সত্যি সুশান্ত সাহা ও একজন প্লেন-ড্রেস সি. আই. ডি. অফিসার ঘরে এসে ঢোকেন।

সুশান্তর দাঁড়াবার ভঙ্গিটা যেন কেমন একটু শিথিল।

কোনমতেই যেন সে সোজা হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না।

আজও তার পরিধানে দামী সুট ছিল।

সুশান্ত ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলে, কোথায় সুখময় মল্লিক, কেন সে আমাকে এখানে এভাবে ধরে নিয়ে এল আমি জানতে চাই! কোথায় সে ?

কণ্ঠস্বর জড়িত। বোঝা যায় অতিরিক্ত মদ্যপানে সুশান্ত সাহা নেশাগ্রস্ত, ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়।

কিরীটীই এগিয়ে এল, সুশান্তবাবু, বসুন, সোফাটায়।

সুশান্ত বলে ওঠে, ড্যাম ইট, বসতে আমি আসিনি—কথাটা সুশান্তর শেষ হয় না, ঘরের মধ্যে অন্যান্য দণ্ডায়মান সকলের দিকে একে একে তার নজর পড়ে এবং সর্বশেষে প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, এই যে বড় সাহেব, তুমিও তাহলে উপস্থিত হয়েছ! ভাল, ভাল!

কিরীটী আবার গম্ভীর এবং গলায় নির্দেশের সুর এনে বলে, বসুন সুশান্তবাবু!

বসব ?

হ্যাঁ, বসুন।

আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে থাকবেন—আর শুধু আমি বসব মিঃ রায় ?

হ্যাঁ, আপনি বসুন।

ও-কে বস! তবে বসলাম।

ধপ করে সুশান্ত সোফার উপরে বসে পড়ল।

কিরীটী এবারে সাধন মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললে, আজ এই সময় এমন যে একটা াগাযোগ হবে, সত্যিই বলছি, ভাবতেও পারিনি সাধনবাবু। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভগবানের চ্ছায় যখন যোগাযোগটা হলই, তখন যে কথাটা আপনাদের প্রত্যেককেই আমার বলবার ল সেটা আজই বলব।

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে লাগল, গত ২৩শে জুলাই রাত্রে এই কক্ষের মধ্যে শংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের কথাই বলব। কেমন করে সে রাত্রে জদুলালবাবু নিহত হয়েছিলেন আপনারা হয়ত এখনও সকলে তা ঠিকমত জানেন না।

ষোল

বাই রুদ্ধ নিশ্বাসে যেন কিরীটীর কথা শুনতে থাকে।

কিরীটী বলে, আপনারা হয়ত সবাই জানেন গত ২৩শে জুলাই এই অঞ্চলে রাত দশটা য়তাল্লিশ থেকে সোয়া এগারোটা পর্যন্ত ইলেকট্রিক কারেন্ট বন্ধ থাকায় এই অঞ্চলটা ঐ াধ ঘণ্টা সময় অন্ধকার হয়ে ছিল। সেই সময়ের মধ্যেই হত্যাকারী এই ঘরের মধ্যে কৌশলে ব্রজদুলালবাবুর মৃত্যু-ফাঁদ পাতে—যে ফাঁদে ব্রজদুলালবাবু অবধারিত ভাবে পা দেন নিজের অজ্ঞাতেই।

মৃত্যুফাঁদ! মৃদুকণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে সাধন মিত্র।

হ্যাঁ, মৃত্যুফাঁদ। ডেথ-ট্র্যাপ। এবং মৃত্যুফাঁদটা কি ছিল জানেন—একটা টেবিল-ল্যাম্প!

টেবিল-ল্যাম্প? কথাটা বলে যেন হাঁ করে তাকায় সাধন মিত্র কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ মিঃ মিত্র, একটা টেবিল-ল্যাম্প। যে টেবিল-ল্যাম্পটা ঐ ত্রিপয়ের উপরে বরাবর থাকত এবং যেটা সে-রাত্রে ব্রজদুলালকে হত্যা করবার পর হত্যাকারী সেই রাত্রেই সরিয়ে ফেলে ঐ নতুন টেবিল-ল্যাম্প ঐখানে রেখে দেয়।

ঐ টেবিল-ল্যাম্পটা—

একটা নতুন ল্যাম্প। এবং অরিজিন্যাল ল্যাম্পটা সরিয়ে ঐ নতুন ল্যাম্পটা রেখেই হত্যাকারী সে রাত্রের তার হত্যার নিদর্শন রেখে গিয়েছে তার নিজের অজ্ঞাতে। এমনিই হয়, ভগবানের বিচারে পাপের ছাপ এমনি করেই হত্যাকারী তার অজ্ঞাতে রেখে যায়। আর ঐ ল্যাম্পটাই আমাকে সত্যের সন্ধান দিয়েছে।

সুখময় মল্লিক বলেন, ব্যাপারটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ রায়!

কেন বুঝতে পারছেন না সুখময়বাবু? ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে আমরা জেনেছি সেখানে হাই ভোলটেজের ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাস করবার জন্যই ব্রজদুলালবাবুর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল, কেমন কিনা?

হ্যাঁ।

সেই কারেণ্ট পাস করানো হয়েছিল, যে টেবিল-ল্যাম্পটার কথা বলছি সেটারই ভিতর দিয়ে।

কিন্তু সেই অরিজিন্যাল টেবিল-ল্যাম্পটি গেল কোথায়? প্রশ্ন করেন সুখময় মল্লিক।

মিস রেবেকা মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করুন, উনিই হয়ত বলতে পারবেন কোথায় সে ল্যাম্পটা।

কিরীটীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি যেন একসঙ্গে গিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মানা রেবেকার উপরে।

রেবেকা প্রথমটায় বোধ হয় একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, হোয়াট ডু ইউ মিন! এ কথার আপনার অর্থ কি মিঃ রায়, আমি জানতে চাই। ইট ইজ নট ওনলি ইনসালটিং—ড্যামেজিং টু।

কিরীটী মৃদু হেসে একবার রেবেকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, অবশ্যই ড্যামেজিং মিস মণ্ডল এবং ড্যামেজিং যে হতে পারে সেটা অন্ততঃ আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে পূর্বেই বোঝা উচিত ছিল।

What do you mean? কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই ল্যাম্পটা আপনারই ঘরে আলমারির টানার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

What? কি বললেন?

যা বললাম তা তো আপনার অজানা নয় মিস মণ্ডল!

সাজানো -মিথ্যা একটা ষড়যন্ত্র!

কোর্টে তাই বলবেন—বলেই জীবনের দিকে তাকিয়ে কিরীটী শুধায়, ল্যাম্পটা কোথায় তুমি পেয়েছিলে জীবন?

আজ্ঞে সেক্রেটারী মেমসাহেবের ঘরে—

চিৎকার করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রেবেকা, জীবন, ইউ লায়ার—

লায়ার ও নয় মিস মণ্ডল—ল্যাম্পটা সত্যিই ও আপনার ঘরে পেয়েছিল। ওকে আমি বাড়ির সর্বত্র ল্যাম্পটা খুঁজে দেখতে বলেছিলাম। ও আপনার ঘরে আলমারির ড্রয়ারের মধ্যেই সেটা খুঁজে পেয়ে আমাকে পৌঁছে দেয়।

সুশান্ত জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে, তাহলে মেমসাহেব, তুমিই—

না সুশান্তবাবু—ঠিক উনি নন—যদিও উনি সাহায্যকারিণী ছিলেন সে-রাত্রের ব্যাপারে।

কিরীটী বলে ওঠে।

সাধন মিত্র এতক্ষণ একপাশে চুপ করে যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়েছিল।

সমস্ত মুখখানা তখন তার ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

তার দিকে তাকিয়ে এবার কিরীটী বললে, সাধনবাবু, নারীর মন বড় বিচিত্র বস্তু! তা হলেও এটা আপনার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্ততঃ বোঝা উচিত ছিল। যে নারী একজনের সঙ্গে স্বার্থের জন্য প্রেমের খেলা খেলতে পারে, সে আর একজনের সঙ্গেও পারে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, ইউ হ্যাভ বিন ডিসিভ্‌ড্‌! আপনিও প্রতারিত হয়েছেন!

সাধন মাথা নীচু করে।

কিরীটী বলে, তবে আপনার দুঃখের কোন কারণ নেই। ঐ রেবেকা মণ্ডল যেমন আপনাকে প্রেমের ব্যাপারে প্রতারণা করেছে—তেমনি নিজেও প্রতারিত হয়েছে। ও জানে না এখনও যে, ও নিজে যেমন আপনার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলেছে, তেমনি প্রশান্ত সাহাও ওর সঙ্গে নিতান্তই স্বার্থের খাতিরেই প্রেমের খেলা খেলেছে এতদিন।

সহসা যেন রেবেকা পাগলের মতই চিৎকার করে ওঠে, না—না—এ অসম্ভব—

কিরীটী ওই সময় বলে ওঠে, না প্রশান্তবাবু, এ ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করবেন না—

প্রশান্ত সবার অজ্ঞাতে দরজার দিকে এগুচ্ছিল পায়ে পায়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

কিরীটী সুখময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ মল্লিক, পুট হিম আণ্ডার অ্যারেস্ট!

সুখময় মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে প্রশান্তর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন।

সতেরো

সেই রাত্রেই।

কিরীটী বলছিল, ব্রজদুলাল সাহার পৈশাচিক হত্যার পশ্চাতে ছিল বিচিত্র একটা নাটক। যার পাত্রপাত্রী ছিল ব্রজদুলাল সাহা স্বয়ং, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রশান্ত সাহা, তাঁর পি. এ. সাধন মিত্তির এবং তাঁর সেক্রেটারী মিস রেবেকা মণ্ডল।

বলাই বাহুল্য, বিপত্নীক ব্রজদুলালের দুর্বলতা জন্মেছিল রেবেকার উপরে। শুধু ব্রজদুলালের কেন—সাধন মিত্রেরও দুর্বলতা জন্মেছিল রেবেকার উপরে।

কিন্তু ওদের দুজনের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে রেবেকা ভালবেসেছিল প্রশান্ত সাহাকে। আবার রেবেকাও তেমনি জানতে পারেন ঘুণাক্ষরে, প্রশান্তর তার প্রতি সবটাই ছিল নিছক একটা অভিনয়। নারীর চাইতে সে কাঞ্চনকেই জীবনে বেশী প্রাধান্য দিয়েছে।

এরপর আসা যাক ঘটনায়।

ব্রজদুলাল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের আদৌ দেখতে পারতেন না। অবিশ্যি দেখতে না পারলেও প্রশান্ত ও সুশান্তবাবুদের ধারণা ছিল ব্রজদুলাল তাদের একেবারে বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রশান্ত সাহা জানতে পারল ব্রজদুলালবাবু রেবেকাকে বিবাহ করবেন স্থির করেছেন—রেবেকারই মারফৎ সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রজদুলালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হল। কিন্তু একা অত বড় দায়িত্বটা নেওয়া সম্ভব নয় তাই সে রেবেকার সাহায্য চাইল। রেবেকাও সম্মত হল, যেহেতু প্রশান্তকে সে মনে মনে ভালবাসত।

মিঃ মল্লিক শুধালেন, রেবেকাকে ব্রজদুলাল বিবাহ করবেন স্থির করেছিলেন, কথাটা জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কথাপ্রসঙ্গে ভৃত্য জীবনই আমাকে কথাটা পরশু রাত্রে বলে ফেলেছিল। এবং কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজদুলালের হত্যারহস্যটা আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কেবল একটা কিন্তু থেকে যায়—

কিন্তু!

হ্যাঁ, বুঝতে পারছিলাম না রেবেকা যখন ব্রজদুলালকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিল তখন এত বড় নৃশংস ব্যাপারটা কী করে ঘটতে পারে! কারণ রেবেকার অজ্ঞাতে তো এত বড় ব্যাপারটা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে না আদৌ। কিন্তু সে প্রশ্নের মীমাংসাটাও একটু আগে আজ সন্ধ্যায় অকস্মাৎই যেন হয়ে গেল পান্থশালায়।

মিঃ মল্লিক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে, পান্থশালায়।

হ্যাঁ, পান্থশালায় সাধনবাবু আর রেবেকাকে দেখে ও তাদের কথাবার্তা শুনে। পান্থশালায় বসেই বুঝতে পারলাম, রেবেকা সাধন মিত্রের সঙ্গেও যখন প্রেমের খেলা খেলছে, তখন হতভাগ্য প্রৌঢ় ব্রজদুলালও তার অন্যতম ভিকটিম হয়েছিল স্বার্থজনিত প্রেমের খেলায় নিঃসন্দেহে!

যাক যা বলছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটু থেমে আবার সুখময় মল্লিকের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, আজ যখন সুখময়বাবু আপনাকে ফোনে সকলকে ডেকে এখানে জড়ো করার জন্য বলি তখনও জানতাম না—বুঝতেও পারিনি ঘটনার পরিস্থিতি সহসা এমন হয়ে দাঁড়াবে। আমাকে যেন কোন চেষ্টাই করতে হল না, আপনা হতেই যেন সব জটগুলো খুলে গিয়ে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

সুখময় মল্লিক ওই সময় প্রশ্ন করেন, কিন্তু ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা মিঃ রায়? আর কেনই বা প্রশান্ত সাহা তার কাকাকে এমনি করে হত্যা করল, এবং প্রশান্তর ওপরেই বা আপনার সন্দেহ পড়ল কী করে?

কিরীটী বলে, প্রশান্ত সাহার উপরে সন্দেহ পড়েছিল আমার তিনটি কারণে।

তিনটি কারণে?

হ্যাঁ, প্রথমতঃ ব্রজদুলাল সাহার ইলেকট্রিক কারেণ্টে মৃত্যু হওয়ায় এবং প্রশান্তর নিজের স্বীকৃতিতে জানতে পারা যায় যে, সে একজন ইলেকট্রিক মেকানিক, ওর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি, সে এক নম্বরের একজন অর্থলোলুপ। তৃতীয়তঃ ব্রজদুলালকে ও অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। সব কিছু মিলিয়ে ওর উপরে আমার সন্দেহটা দৃঢ়বদ্ধ হয়। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চারের মত মিলিয়ে নিতে আর আমার কষ্ট হয়নি।

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে লাগল, প্রশান্ত সাহা লোকটা অতীব ধূর্ত সন্দেহ নেই। সে জানত, রেবেকার প্রতি সাধনবাবুর দুর্বলতা আছে আর রেবেকা তাকে ভালবাসে। দুদিককার এই ভালবাসার ছুরি দিয়েই সে তার পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল। ঐদিন দ্বিপ্রহরে সাহেবের ছদ্মবেশে এসে রেবেকার সাহায্যে প্রশান্ত ব্রজদুলালের শয়নকক্ষের ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা এ বাড়ির ৪৪০ ভোল্টের সঙ্গে ডিরেক্ট কানেকশন করে রেখে গিয়েছিল। সে জানত—ব্রজদুলাল রাত্রে শয়নের পূর্বে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়েন ড্রিঙ্ক করতে করতে।

সেরাত্রেও শয়নের পূর্বে সোফায় বসে যথারীতি খবরের কাগজ পড়বার জন্য সামনের টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয় হাই কারেণ্টের ইলেকট্রিসিটিতে। ইতিমধ্যে নিষ্প্রদীপ হয় ওই অঞ্চল। এবং ওই নিষ্প্রদীপের মধ্যেই কোন এক সময় অন্ধকারে ওই ঘরে সবার অলক্ষ্যে পাশের লাইব্রেরী ঘরের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে প্রশান্ত আসল ল্যাম্পটা সরিয়ে দ্বিতীয় ল্যাম্প যথাস্থানে রেখে যায়। কিন্তু এত করেও সে তিনটি মারাত্মক ভুল করেছিল।

তিনটি মারাত্মক ভুল!

হ্যাঁ মিঃ মল্লিক। প্রথম ভুল, রেবেকার সাহায্যে সাধনবাবুকে দিয়ে মাদ্রাজ থেকে ব্রজদুলালকে ট্রাঙ্ক কল করে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এসে। দ্বিতীয় ভুল করেছিল, আসল ল্যাম্পটা বদলে—দ্বিতীয় একটা নতুন ল্যাম্প সেখানে বদলে রেখে। এবং তৃতীয় মারাত্মক ভুল করেছিল, ঘরের দরজাটা খুলে রেখে দিয়ে।

হত্যা সে করেছিল নিশ্চয়ই ব্রজদুলালের সম্পত্তির লোভে? সুখময় মল্লিক বলেন।

ঠিক তাই। উইলের ড্রাফ্‌ট হয়ে গিয়েছে শুনে উইল পাকাপোক্ত হবার আগেই সে ই ট্রাঙ্ক কল করে মাদ্রাজ থেকে এনে ব্রজদুলালকে হত্যা করেছিল। কারণ উইলে কোন ম কিছু না থাকলে সম্পত্তি পেতে তো কোন অসুবিধাই হত না। কিন্তু আর না মিঃ ক—রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, এবারে আমি বিদায় নেব।

০

কিরীটী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বাইরে পুলিসের কালো ভ্যানও এসে গিয়েছিল।

হত্যাকারী প্রশান্ত সাহা ও রেবেকা মণ্ডলকে নিয়ে মি: মল্লিক হাজতে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ॥